বিভূতি বীথিকা

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যম্ ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

উপন্যাস :

অশনি-সংকেত ৩—১৩১

ছোট গল্প :

ফকির ১৩৫

সুলোচনা ১৪৯

ছায়াছবি ১৭০

অভিনন্দন-সভা ১৭৮

রোমান্স ১৮৮

স্বপ্ন-বাসুদেব ২০৫

টান ২২৯

প্রবন্ধ-আলোচনা :

আমার লেখা ২৩৯

প্রথম দর্শন ২৪৭

সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প ২৫০

ধলকোবাদের চিঠি ২৫৮

অভিভাষণ-চিঠিপত্র :

রবীন্দ্রনাথ ২৬৩

রবি-প্রশস্তি ২৬৬

সাহিত্য বাস্তবতা ২৭৩

সাহিত্য ও সমাজ ২৭৯

চিঠি-পত্র ২৮৯

শিশু-সাহিত্য :

মৌচাকের স্মৃতি ৩১৫

রাজপুত্র ৩১৭

চ্যালারাম ৩২১

বামা ৩২৭

গঙ্গাধরের বিপদ ৩৩৪

চিত্র :

বিভূতিভূষণের প্রতিকৃতি ও তাঁর শেষ জীবনে লেখা ডায়েরীর এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি।

অপরাজেয় কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস, কয়েকটি সু-নির্বাচিত ছোটগল্প, প্রবন্ধ-আলোচনা-অভিভাষণ ও কিছু ব্যক্তিগত চিঠিপত্র নিয়ে এই সংগ্রহটি প্রকাশ করা হলো। পরিশেষে অপরাজেয় কথাশিল্পীর ছোটদের জন্য লেখা কয়েকটি গল্পও থাকলো। একটি বই থেকেই যাতে তাঁর সর্বরকমের লেখার স্বাদ পাওয়া যায়, সেই জন্যই এই 'বিভূতি-বীথিকা'র প্রচেষ্টা।

ভূমিকা

কবিশেখর কালিদাস রায়

স্নেহাস্পদ শ্রীমান বিশ্বনাথ দে সংকলিত, 'সাহিত্যম্' প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারগণ আমার অনুজ প্রতিম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মতিথিতে তাঁহার বিভিন্ন প্রকার সহিত্যকৃতির একটি নিদর্শন চয়ন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন জানিয়া বিশেষ আনন্দ বোধ করিলাম। বিভূতিভূষণকে সংক্ষেপে জানিবার এবং একটি সংকলন গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁহার বহুমুখী সাহিত্য সৃষ্টির রসস্বাদন করিবার এই সুযোগ পাঠকদের অশেষ কৃতজ্ঞতার কারণ হইবে।

'বিভূতি-বীথিকা'য় বিভূতিভূষণের একটি উপন্যাস 'অশনি সংকেত' কয়েকটি বিভিন্ন রসবৈচিত্র্যসম্পন্ন ছোট-গল্প, কয়েকটি গাহ´স্থ্য চিঠি, অভিভাষণ, প্রবন্ধ ও আলোচনা, একটি কবিতা ও কিশোরদের উপযোগী কয়েকটি গল্প সংকলিত হইয়াছে। বিভূতিভূষণের গল্প, উপন্যাস ও শিশু সাহিত্যেব সংকলন হযতো আরও আছে, কিন্তু তাঁহার কবিতা ও প্রবন্ধ-আলোচনার এটি একটি দুর্লভ সম্পাদনা।

বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সুদীর্ঘদিনের, তাঁহার সমগ্র সাহিত্য জীবনের সঙ্গে আমার গভীর সংযোগ ছিল। আমাকে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব মতোই শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহার সর্বশেষ গ্রন্থটি 'কুশল পাহাড়ী' আমার নামে তিনি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাদর আমন্ত্রণে ঘাটশিলায় গিয়া তাঁহার গৃহে দীর্ঘদিন অতিথি হইয়াছিলাম, বিভূতি তাঁহার বনবাসের কাছেই আমার জন্য কুটিরের স্থান পর্যন্ত নির্বাচন করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বিভূতি-হীন ঘাটশিলায় আর আমি যাই নাই।

'বিভূতি-বীথিকা'র ভূমিকা লিখিতে বসিয়া বার বার তাঁহার সঙ্গে সেই শেষ সাক্ষাতের দিনটির কথা মনে পড়িতেছে—আমার 'সন্ধ্যার কুলায়' থেকে ট্রামরাস্তা পর্যন্ত এক সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে তাঁহাকে আগাইয়া দিতে গিয়া দুটি ঘণ্টা রাস্তার মোড়ে কাটাইয়া আসিয়াছিলাম।

বিভূতিভূষণের সমস্ত গল্পের মধ্যেই পল্লীজীবন মুল উপজীব্য, এই গ্রন্থে তাঁহার বিভিন্ন পটভূমিকার কাহিনী থাকিলেও পল্লীচিত্রই সমস্ত কিছুর উপর প্রাধান্য পাইয়াছে। আর এই পল্লীচিত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে

'পথের পাঁচালী'তে। স্বতই বিভূতিভূষণের প্রসঙ্গে তাই 'পথের পাঁচালী'র সম্পর্ক আসিয়া পড়ে।

বিভূতিভূষণের জন্মতিথি ৩০শে ভাদ্র, শরৎচন্দ্রের জন্ম তিথি ৩১শে ভাদ্র। বাংলাদেশের এই দুই সাহিত্যরথীর জন্ম হয় বৎসরের একই সময়ে, একদিনের তফাৎ। সাহিত্যেক্ষেত্রে দুইজনের প্রতিভার ব্যবধানও ছিল সামান্যই। আমরা ১লা আশ্বিন শরতের সূত্রপাত ধরি। সে হিসাবে শরতের জন্ম তারিখটি যথাযথই বটে।

বিভূতিভূষণ শরৎ ঋতুর নির্মলতা, শুচিতা ও প্রফুল্লতা লাভ করিয়াছিলেন—বর্ষাঋতুর অবসানে তাঁহার আবির্ভাবকে আমরা যথাযথই মনে করি।

বিভূতিভূষণ যে অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—তাহাতে বাংলা দেশের লোক তাঁহাকে কখনও ভুলিবেন না। তাহা হইল স্রষ্টা বিভূতিভূষণের কথা। মানুষ বিভূতিভূষণকে সকলে চিনিত না। আমরা মানুষ বিভূতিভূষণকে বুকের নিকটেই পাইয়াছিলাম। আমাদের মানুষ বিভূতিভূষণকে ভুলিলে চলিবে না।

আজ মনে পড়ে বৎসর বৎসর ঢাকুরিয়ায় বিভূতির জন্মদিবস আমরা পালন করিতাম—সারাদিন একসঙ্গে কাটাইতাম। অনুজ বিভূতি ধর্মপোদেশকের ভূমিকা গ্রহণ করিত—অগ্রজ আমি ভাবিতাম—বিভূতি কি সত্যসত্যই আধ্যাত্মিক পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে—না এসব তাঁহার পুঁথি পড়া বুলি। কিন্তু বিভূতি মহাপ্রয়াণকালে আমার দ্বিধা-সংশয় দূর করিয়া প্রমাণ করিয়া গেলেন সত্যই তিনি পরম ধনের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে একজন বাউল পুরুষ একতারাতে কি সুর যে ভাঁজিত তাহা কোনদিন কান দিয়া শুনি নাই।

তাঁহার জন্মদিনে কোথাও কোন সভার অনুষ্ঠান হইবে কিনা জানিনা। বিভূতিভূষণ একজন শিক্ষক ছিলেন, শিক্ষকদেরও তাঁহার জন্মদিবস পালন করা উচিত। কিন্তু তাঁহাদের কাছে সে সহৃদয়তা প্রত্যাশা করা ভুল। বিভূতির মৃত্যুর পর নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি একটা শোকসভাও করে নাই। জানিনা বিভূতির চেয়ে কোন অসামান্য ব্যক্তি তাঁহাদের সমগ্র সমাজকে আজ পর্যন্ত অলঙ্কৃত করিতে পারিয়াছেন কি না! তাঁহার জন্মতিথিটি স্মরণ করিয়া, তাঁহার চিত্রিত অপুর মধ্যে তাঁহার বাল্য জীবনটি কি ভাবে প্রচ্ছন্ন আছে সে সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান ও পিতৃভূমি যশোহর জেলার বারাকপুর গ্রামের একটি পল্লীতে। এই পল্লীতেই তাঁহার বাল্যজীবন

কাটিয়াছিল। বিভূতির পিতা ছিলেন একজন কথকতা ব্যবসায়ী। কথকতার উদ্দেশ্যে অনেক সময়ে তাঁহাকে প্রবাসে কাটাইতে হইত।

'পথের পাঁচালী'তে বর্ণিত গ্রামখানি লেখকের নিজেরই গ্রাম। ইহারই পরিবেশ, 'পথের পাঁচালী'তে বর্ণিত হইয়াছে। 'পথের পাঁচালী'তে যে ইছামতী নদীর কথা আছে তাহা এই গ্রামের নিকট দিয়াই প্রবাহিত। হরিহরের বৃত্তি, আর্থিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার সঙ্গে বিভূতিভূষণের পিতার বৃত্তি ও জীবন যাত্রার অনেকটা মিল আছে।

অপুর বাল্যজীবন দারুণ দারিদ্রের মধ্য দিয়াই কাটিয়াছিল—বিভূতির জীবন ও তাহাই। বিভূতির রচনায় দারিদ্রের চিত্র জলন্ত ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী জীবনে বিভূতির আর্থিক অবস্থা ভালোই হইয়াছিল, কিন্তু বিভূতি তাঁহার বাল্যসঙ্গী দারিদ্র্যকে ত্যাগ করেন নাই। তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত দরিদ্রের মতই জীবনযাপন করিয়াছিলেন।

বিভূতি পরবর্তী জীবনে ভোজনলালসার অভিনয় করিতেন, ইহা যেন 'পথের পাঁচালী'র অপুর বাল্যজীবনের ভোজনরস রসিকতারই রূপান্তর।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপুকে এমনই মুগ্ধ করিত যে তাহাতে মনে হয়—অপু অসামান্য সৌন্দর্যদৃষ্টি লইয়াই জন্মিয়াছিল। এইরূপ সৌন্দর্য রস-রসিকতা সেই শ্রেণীর শিশুতে থাকে যে শ্রেণীর শিশু উত্তরজীবনে খুব বড় সাহিত্যিক বা শিল্পী হয়। উত্তরজীবনে দেখা গিয়াছে বিভূতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্ভোগে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতেন বিশেষ করিয়া বৃক্ষলতাগুল্মের শ্যামল সৌন্দর্য তাহার চিত্তচঞ্চল করিয়া তুলিত। ইহা হইতে মনে হয় 'পথের পাঁচালী'র অপু বিভূতিভূষণ ছাড়া অন্য কেহই নয়।

অপুর শিশুমনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এমন যথাযথ যে কোন শিশুকে দেখিয়া এইরূপ বিশ্লেষণ চলিতে পারে না। লেখক নিজের স্মৃতিপুটে সংরক্ষিত নিজেরই শিশুজীবনের চিন্তা, কল্পনা ও অনুভূতিগুলিকে রূপ দিয়াছেন।

বিভূতি একস্থলে বলিয়াছেন—এই অল্প বয়সেই অপুর মনে সংসার, মাঠ, নদী, নির্জন বনপ্রান্তরের ও জ্যোৎস্না রাত্রির যে মায়ারূপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার উত্তরকালের শিল্পীজীবনের কল্পনামুহূর্তগুলি মাধুর্যে ও প্রেরণায় ভরিয়া তুলিবার তাহাই ছিল শ্রেষ্ঠ উপাদান। লেখক নিজের কথাই অপুর মারফতে বলিয়াছেন। বিভূতিভূষণের অধিকাংশ সৃষ্টি বাল্য জীবনের স্বচ্ছ মানসমুকুরে প্রতিফলিত চিত্রগুলির সাহায্যে পরিকল্পিত।

বিভূতিভূষণ তাঁহার 'অপুর পাঠশালা' সম্বন্ধে আমাকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার অনুলিপি :

"পথের পাঁচালীর পল্লীচিত্রগুলি সবই আমার স্বগ্রাম বারাকপুরের। জেলা যশোহর। গ্রামের নিচেই ইছামতী নদী।

আমি নিজে ছেলেবেলায় যে গুরুমশায়ের পাঠশালাতে পড়েছিলাম, তাঁর নাম প্রসন্ন গুরুমহাশয়, তাঁর বাড়ি ছিল হুগলির দুইমাইল দূরে কেওটা নামক গ্রামে। বাল্যে আমি কেওটাতে মামার বাড়ি মাঝে মাঝে থাকতাম—বাবাও সেখানে বাসা করে কিছুদিন ছিলেন। প্রসন্ন গুরুমশাই-এর মুদীর দোকান এবং পাঠশালা ছিল। ঐ গ্রাম থেকে চলে এসে আমি স্বগ্রাম বারাকপুরে হরিপোড়া বা হরি রায় নামক এক গুরুমশায়ের পাঠশালায় ভর্তি হই। অপুর পাঠশালার পটভূমি এই হরি রায়ের পাঠশালার অনুরূপ। অমনি বনভূমির মধ্যে পাঠশালাটি ছিল—স্বগ্রামে আমার পৈতৃক ভিটার পাশেই। হরি রায় শ্রুতিলিখন দিয়েছিলেন—প্রসন্ন গুরুমশাই নন। আমি বাল্যের অভিজ্ঞতায় এই দুই পাঠশালাকে জড়িয়েছে।

দীনু পালিত, রাজু রায় আমার দেখা বিভিন্ন গ্রাম্যমানুষের ছবি। তবে বড্ড জড়িয়ে গিয়েছে। ও-নামের কোন মানুষ আমাদের গ্রামে ছিল না—তবে ঐ ধরনের কথা বলতো অনেকে, ছেলেবেলায় শুনেছি! ভাগলপুরে বসে 'পথের পাঁচালী' লেখা। তখন অনেকদিন দেশছাড়া, এমন কি, কখনো আবার ফিরে যাবো সে আশাও ছিল না। সুদূর প্রবাসে বাল্যের দিনগুলির সুখস্মৃতি মনে যে ভাবলোক সৃষ্টি করত—তারই ফলে আমার পল্লীচিত্রগুলির সৃষ্টি। অবশ্য অনেক কিছু কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে বই কি!"

উদ্ধৃত পত্রাংশে বিভূতিভূষণ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে—'পথের পাঁচালী ও তাঁহার অন্যান্য পল্লীচিত্রগুলি তাঁহার নিজের গ্রামেরই। পাঠশালার গুরু-মহাশয়ের নামটি ঠিকই আছে, তাঁহার মুদির দোকানও ছিল। তবে তাঁহার পাঠশালাটি ছিল হুগলী জেলার কেওটা গ্রামের। পাঠশালার পরিবেশটি অপুর নিজের গ্রামেরই। শুধু 'পথের পাঁচালী' কেন—তাঁহার সকল পল্লীচিত্রের পরিবেশ ঠিক একই প্রকার।

দুর্গা একেবারে কাল্পনিক নয়। লেখকের একটি ভগিনী ছিল। অবশ্য সে ভগিনী অত অল্প বয়সে মারা যায় নাই।

অজয়, পটু, সবু, রাণুদিদি, অমলা ইত্যাদি বাল্য সখা-সখীদের কথা একেবারে কাল্পনিক নয়। তবে নামগুলি লেখকেরই দেওয়া। অজয় তো যাত্রা-দলের ছেলেটির নাম নয়—যে যাত্রার নায়ক অজয় সাজিয়াছিল বলিয়া লেখক অজয় নামেই তাহাকে অভিহিত করিয়াছেন। ইন্দির ঠাকরুণও সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত নয়, তবে নামটা লেখকের দেওয়া।

বিভূতি নিজেই বলিয়াছেন—"সুদূর প্রবাসে (ভাগলপুরে) বাল্যের দিনগুলির সুখস্মৃতি মনে যে ভাবলোকের সৃষ্টি করত—তারই ফলে এই সব গল্পের সৃষ্টি।"

গ্রাম্যজীবনের গণ্ডী পার হওয়ার পর অপু ও বিভূতির মধ্যে পার্থক্য ঘটিয়া গেল। যতদিন অপু নিশ্চিন্তিপুরে ছিল ততদিন অপুর মানসজীবন ও বিভূতির মানসজীবন অভিন্ন—বাহ্য জীবনও প্রায় অভিন্ন।

বিভূতিভূষণের সাহিত্য-সংকলনের ভূমিকা লিখিতে বসিয়া আমি হয়তো 'পথের পাঁচালী'র কথাই বেশী বলিয়া ফেলিলাম। পাঠক তাহার কারণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন—অপুর কাহিনী বিভূতিভূষণেরই আত্মকাহিনী, অপুকে বাদ দিয়া বিভূতিভূষণ তাই অসম্পূর্ণ।

'বিভূতি-বীথিকা'র এই বিচিত্র কাহিনী সংকলনে পাঠক বিভূতিভূষণের সেই স্বপ্নদৃষ্টি, সেই কুশলী নিসর্গচিত্র অঙ্কন, সেই সাধক আত্মভোলা রূপের পরিচয় পাইবেন—এই আশা জানাইয়া ভূমিকা শেষ করিতেছি।

নদীর ঘাটে তালগাছের গুঁড়ি দিয়ে ধাপ তৈরী করা হয়েছে। দুটি স্ত্রীলোক স্নানরতা। একটি স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী। ত্রিশের সামান্য কিছু নিচে হয়তো হবে। অপরটি প্রৌঢা।

প্রৌঢা বললে—ও বামুন-দিদি, ওঠো—কুমীর এয়েচে নদীতে—

অপরা বধূটির উঠবার ইচ্ছে নেই জল থেকে এত তাড়াতাড়ি। সে কোনো জবাব না দিয়ে গলাজলে দাঁড়িয়ে রইল।

—বামুন দিদিকে নিয়ে আর কক্ষনো যদি নাইতে আসি!

—রাগ কোরো না পুঁটির মা—সত্যি বলচি জলে নামলে আমার আর ইচ্ছে করে না যে উঠি—

—কেন বামুন-দিদি?

—যে গাঁয়ে আগে ছিলাম সেখানে কি জলকষ্ট। সে যদি তুমি দেখতে! একটা বিল ছিল, তার জল যেতো শুকিয়ে। জষ্টি মাসে এক বাসতি জলে নাওয়া, অথচ তার নাম ছিল—পদ্মবিল—

বধূটি হি হি করে হেসে ঘাড় দুলিয়ে বললে—পদ্মবিল! দ্যাখো তো কি মজা পুঁটির মা? চত্তির মাসে জল যায় শুকিয়ে। নাম পদ্মবিল—

এই সময় একটি কিশোরী জলের ঘাটে নামতে নামতে বললে—অনঙ্গ-দিদি, তোমার বাড়ীতে কলু তেল দিতে এসে দাঁড়িয়ে আছে—শীগ্‌গির যাও, আমায় বলছিল, আমি বললাম, ঘাটে যাচ্চি—ডেকে দেবো এখন—

অনঙ্গ-বৌয়ের হাসি তখনও থামেনি। সে বললে—তোর বৌদিদির কাছে গল্প করছি পদ্মবিলের—জল থাকে না চত্তির মাসে—নাম পদ্মবিল—

মেয়েটি বললে—সে কোথায় অনঙ্গ-দি?

—সেই যেখানে আগে ছিলাম—সেই গাঁয়ে—

—সে কোথায়?

—ভাতছালা বলে গাঁ। অম্বিকপুরের কাছে—

—তোমার শ্বশুরবাড়ী বুঝি?

—না। আমার শ্বশুরবাড়ী হরিহরপুর, নদে জেলা। সেখানে বড্ড চলাচলতির কষ্ট দেখে সেখান থেকে বেরুলাম তো এলাম ওই পদ্মবিলের গাঁয়ে—

—তারপর ?

—তারপর সেখান থেকে এখানে।

অনঙ্গ জল থেকে উঠে বাড়ী চলে গেল।

গ্রামখানিতে এরাই একমাত্র ব্রাহ্মণ-পরিবার, আর সবাই কাপালী ও গোয়ালা। নদীর ধারে এ-গ্রাম বেশি দিনের নয়। বসিরহাট অঞ্চলের চাষী, জমি নোনা লেগে নষ্ট হওয়াতে সেখান থেকে আজ বারো-তেরো বছর আগে কাপালীরা উঠে এসে নদীতীরের এই অনাবাদী পতিত জমি সস্তায় বন্দোবস্ত করে নিয়ে গ্রামখানা বসিয়েছিল। তাই এখনও এর নাম নতুন গাঁ, কেউ কেউ বলে চর পোলতার নতুন পাড়া।

অনঙ্গদের বাড়ী গোয়ালাপাড়ার প্রান্তে, দু'খানা মেটে ঘর। খড়ের ছাউনি, একখানা দোচালা রান্নাঘর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উঠানের ধারে ধারে পেপে ও মানকচু গাছ। চালে দিশি কুমড়োর লতা দেওয়া হয়েচে কঞ্চি দিয়ে, রান্নাঘরের পাশে গোটাকতক বেগুন গাছ, ঢেঁড়স গাছ।

অনঙ্গ এসে দেখলে বিশ্বনাথ কলু বড় একটা ভাঁড়ে প্রায় আড়াই সের খাঁটি সর্ষের তেল এনেচে। তেল মাপা হয়ে গেলে বিশ্বনাথ বললে—মা ঠাকরুণ, আজ আর সর্ষে দেবেন নাকি ?

—উনি বাড়ী এলে পাঠিয়ে দেবো। এখন এই তেলে একমাস চলে যাবে—

—আর পয়সা ছ'টা ?

—কেন খোল তো নিয়েচ, আবার পয়সা কেন ?

—ছ'টা পয়সা দিতে হবে সর্ষে ভাঙানির মজুরি। খোলের আর কত দাম মা-ঠাকরুণ। তাতে আমাদের পেট চলে ?

—আচ্ছা উনি বাড়ী এলে পাঠিয়ে দেবো।

অনঙ্গ-বৌয়ের দুটি ছেলে। বড়টির বয়েস এগারো বছর, তার ডাকনাম পটল। ছোটটি আট বছরের। তাকে এখনও খোকা বলেই ডাকা হয়। পটল খুব সংসারী ছেলে—এ সব তরিতরকারীর ক্ষেত সে-ই করেচে বাড়ীতে। এখন সে উঠানের একপাশে বসে বেড়া বাঁধবার জন্য বাঁশের বাখারি চাঁচছিল। ওর মা বললে—পটলা, ও সব রাখ্, এত বেলা হলো, দুধ দেয় নি কেন দেখে আয় তো ?

পটল বাখারি চাঁচতে চাঁচতেই বললে—আমি পারবো না।

—পারবি নে তো কে যাবে ? আমি যাবো দুধ আনতে সেই কেষ্টদাসের বাড়ী ?

—আহা, ভারি তো বেলা হয়েচে, এখন বেড়াটা বেঁধে নিই একটু পরে দুধ এনে দেবো—

—না এখুনি যা।

—তোমার পায়ে পড়ি মা। বাবা বাড়ী এলে আর বেড়া বাঁধতে পারবো না। এই ছ্যাখো ছাগল এসে আজ বেগুন গাছ খেয়ে গিয়েচে।

খোকা এসে বললে—মা, আমি দুধ আনবো? দাদা বেড়া বাঁধুক—

অনঙ্গ সে কথা গায়ে না মেখে বললে—খোকা, গাছ থেকে দুটো কাঁচা ঝাল তোল্, তোদের মুড়ি মেখে দি—

খোকা জেদের সুরে বললে—আমি দুধ আনবো না মা?

—না।

—কেন আমি পারি নে!

—তোকে বিশ্বাস নেই—ফেলে দিলেই গেল।

—তুমি দিয়ে ছ্যাখো। না পারি কাল থেকে আর দিও না।

—কাল থেকে তো দেবো না। আজকের দু'সের দুধ তো বালির চড়ায় গড়াগড়ি খাক। তোর সরদারি করবার দরকার কি বাপু? দুটো কাঁচা ঝাল তুলতে বললাম, তাই তোল্।

এমন সময়ে পটলের বাবা গঙ্গাচরণ চক্কত্তি বাড়ী ঢুকে বললে—কোথায় গেলে—এই মাছটা ধরো, দীনু তীওর দিলে, বললে সাত-আটটা মাছ পেয়েচি—এটা ব্রাহ্মণের সেবায় লাগুক। বেশ বড় মাছটা—না? এই পটলা পড়া গেল, শুনো গেল, ওকি হচ্চে সকাল বেলা!

পটল মৃদু প্রতিবাদের নাকিসুরে বললে—সকাল বেলা বুঝি? এখন তো দুপুর হয়ে এল—

—না, তা হোক ব্রাহ্মণের ছেলে, বাঁশ-কঞ্চি নিয়ে থাকে না রাতদিন।

ছাগলে যে বেগুন গাছ খেয়ে যাচ্ছে?

—যাক গে খেয়ে। উঠে আয় ওখান থেকে। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে কি কাপালীর ছেলের মত দা-কুড়ুল হাতে থাকবি দিনরাত?

অনঙ্গ বললে—কেন ছেলেটার পেছনে অমন করে লাগছ গা? বেড়া বাঁধছে বাঁধুক না? ছুটির দিন তো।

গঙ্গাচরণ চক্কত্তি বললে—না, ওসব শিক্ষে ভাল না। ব্রাহ্মণের ছেলে ও রকম কি ভালো?

পটল নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বেড়া বাঁধা রেখে উঠে এল।

অনঙ্গ স্বামীকে বললে—ওগো, একবার হরিহরের হাটে যাও না?

—কেন?

—একবার দেখে এসো নতুন গুড় উঠলো কিনা।

—সে তুমি ভেবো না, আমার গুড় কিনতে হবে না। এখান থেকেই পাওয়া যাবে। সবাই ভক্তি করে।

বাইরে থেকে কে ডাকলে—চক্কত্তি মশায়, বাড়ী আছেন?

গঙ্গাচরণ বললে—কে? রামলাল? দাঁড়াও—

আগন্তুক ম্যালেরিয়া রোগী, তার চেহারা দেখেই তা বোঝা যায়। গঙ্গাচরণ বাড়ীর বাইরে আসতেই সে নিজের ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—একবার হাতখানা দেখুন তো?

গঙ্গাচরণ ধীরভাবে বললে—অমন করে হাত দেখে না। বসো ঠাণ্ডা হও। হেঁটে এসেচ, নাড়ী চঞ্চল হবে যে। বাপু এ কোদাল কোপানো নয়। এসব ডাক্তার বদ্দির কাজ, বড্ড ঠাণ্ডা মাথায় করতে হয়। কাল কেমন ছিলে?

—রাত্তিরে জ্বর-জ্বর ভাব, শরীর যেন ভারি পাথর—

—কি খেয়েছিলে?

—দুটো ভাত খেয়েছিলাম চক্কত্তি মশাই, আর কি খাবো বলুন, তা ভাত মুখে ভালো লাগলো না।

—যা ভেবেচি তাই। ভাত খেলে কি বলে? জ্বর সারবে কি করে?

—আর খাবো না।

—সে তো বুঝলাম—যা খেয়ে ফেলেচ, তার ঠ্যালা এখন সামলাবে কে? বসো, দুটো বড়ি নিয়ে যাও—শিউলি পাতার রস আর মধু দিয়ে খেও, ছাখো কেমন থাকো—

ওষুধ নিয়ে রামলাল চলে যাচ্ছিল, গঙ্গাচরণ ডেকে বললে—ওহে রামলাল, ভালো কথা, এবার নতুন সর্ষে হয়েছে ক্ষেতে? দু'কাঠা পাঠিয়ে দিও তো। আমি বাজারের তেল খাইনে বাপু, সর্ষে দিয়ে কলুবাড়ী থেকে ভাঙিয়ে নিই।

যে আজ্ঞে। আমার ছেলে ওবেলা দিয়ে যাবে'খন। তেমন সর্ষে এবার হয় নি চক্কত্তি মশাই। বিষ্টি হওয়াতে সর্ষে গাছে পোকা ধরে গেল কার্তিক মাসে।

রামলালকে বিদায় দিয়ে গঙ্গাচরণ সগর্বে স্ত্রীর কাছে বললে—ফলল তো? যাকে যা বলবো, না বলুক দিকি কেউ? সে যো নেই কারো।

স্বামীগর্বে অনঙ্গ-বৌয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে আদরের সুরে বললে—এখন নেয়ে নাও দিকি? বেলা তেতপ্পর হয়েচে। সেই কখন বেরিয়েচ—দুটো ছোলা-গুড মুখে দিয়ে নাও—এখুনি তোমার ছাত্তরের দল আসতে শুরু করবে। তেল দিই—

নদীতে স্নান সেরে এসে জলখাবার অর্থাৎ ছোলা ভিজে ও এক টুকরো আখের পাটালি খেতে খেতে গঙ্গাচরণের মুখ তৃপ্তিতে ভরে উঠলো। অনঙ্গ জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ, গা, পাঠশালা খোলার কথা কিছু হলো বিশ্বাস মশায়ের সঙ্গে?

—সব হয়ে যাবে। ওঁরা নিজেরা ঘর বেঁধে দেবেন বললেন—

—ছেলে হবে কি রকম?

—দুটো গাঁয়ের ছেলেমেয়ে পাচ্চি—তা'ছাড়া প্রাইবিট পড়ার ছাত্তর তো আছেই হাতে। এ দিগরে লেখাপড়া জানা লোক কোথায় পাবে ওরা? সকলের এখন চেষ্টা দাঁড়িয়েছে যাতে আমি থাকি।

—সে তো ভালই। উড়ে উড়ে বেড়িয়ে কি করবে—এখানেই থাকা যাক্। আমার বড্ড পছন্দ হয়েচে। কোন জিনিসের অভাব নেই। মুখের কথা খসতে যা দেরি—

—রও, সব দিক থেকে বেঁধে ফেলতে হবে ব্যাটাদের। চাষা গাঁ, জিনিস বলো, পত্তর বলো, ডাল বলো, মুলো বেগুন বলো—কোনো জিনিসের অভাব হবে না। এ গাঁয়ে পুরুত নেই, ওরা বলেচে, চক্কত্তি মশাই আমাদের লক্ষ্মীপুজো, মনসা পুজোটাও কেন আপনি করুন না?

—সে বাপু আমার মত নেই।

—কেন—কেন?

—কাপালীদের পুরুতগিরি করবে? শুদ্দুর-যাজক বামুন হ'লে লোকে বলবে কি?

—কে টের পাচ্ছে বলো? এ অজ পাড়াগাঁয়ে কে দেখতে আসচে?

—তুমিও যেমন?

—কিন্তু ঠাকুরপুজো জানো? না জেনে পুজো-আচ্চা করা—ওসব কাঁচাখেকো দেবতা, বড্ড ভয় হয়। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করা—

—অত ভয় করলে সংসার করা চলে না। পাঁজিতে আজকাল ষষ্ঠী পুজো মহাকালপুজো সব লেখা থাকে—দেখে নিলেই হয়।

—তুমি যা বোঝো—

—কোনো ভয় নেই বৌ—তুমি দেখে নিও এ ব্যাটাদের সব দিক থেকে বেঁধে ফেললে ভাবনা হবে না আমাদের সংসারে।

অনঙ্গও তা জানে। স্বামীর ক্ষমতা সম্বন্ধে তার অসীম বিশ্বাস। কিন্তু কথা তা নয়—এক জায়গায় টিকে থাকতে পারলে সব হতে পারে, কিন্তু স্বামীর মন উড়ু, উড়ু, কোনো গাঁয়ে এক বছরের বেশি তো টিকে থাকতে দেখা গেল না। বাসুদেবপুরেই বা মন্দ ছিল কি? একটু সুবিধে হয়ে উঠতে না উঠতে উনি অমনি বললেন—চলো বৌ, এখানে আর মন টিকচে না।

অমন করে উড়ে উড়ে বেড়ালে কি কখনো সংসারে উন্নতি হয়? তবে একথা ঠিক বাসুদেবপুরে শুধু পাঠশালায় ছেলে-পড়ানোতে মাসে আট দশ টাকা আয় হতো।—আর এখানে জিনিসপত্র পাওয়া যায় কত? উন্নতি হয় তো এখান থেকেই হবে। উনি যদি মন বসিয়ে থাকেন তবে সবই হতে পারে সে জানে।

একটু পরে চার-পাঁচটি ছোট ছোট ছেলে শ্লেট বই নিয়ে দড়িবাঁধা দোয়াত ঝুলিয়ে গঙ্গাচরণের কাছে পড়তে এল।

গঙ্গাচরণ বললে, আমি এই খেয়ে উঠলাম, একটু শুয়ে নিই—তোরা পুরোনো পড়া ত্যাখ ততক্ষণ। ওরে নসু, তোমাদের বাড়ীতে বেগুন হয়েছে?

একটি ছেলে বললে—হ্যাঁ গুরুমহাশয়—

গঙ্গাচরণ ধমক দিয়ে বললে—গুরুমশায় কি রে? সার্ বলবি। শিখিয়ে দিইচি না? বল্—

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বললে—হ্যাঁ সার্—

—যা গিয়ে বসে লিখগে—বেগুন নিয়ে আসবি কাল, বুঝলি?

—আন্‌বো সার্।

ছেলে ক'টি দাওয়ায় বসে এমন চীৎকার জুড়ে দিলে যে তাদের ত্রি-সীমানায় কারো নিদ্রা বা বিশ্রাম সম্পূর্ণ অসম্ভব। অনঙ্গ স্বামীকে বললে—ওগো তোমার ছাত্তরেরা যে কানের পোকা বের করে দিলে। ওদের একটু থামিয়ে দাও—

গঙ্গাচরণ হেঁকে বললেন—এই! পড়া থাক এখন, সবাই শটকে কড়াংকে লিখে রাখ শেলেটে। আমি ঘুমিয়ে উঠে দেখবো।

তারপর স্ত্রীকে খুশির সুরে বললে—ছটা হয়েচে আরও সাত-আটটা কাল আসছে পুব পাড়া থেকে। ভীম ঘোষ বলছিল, বাবা ঠাকুর, আমাদের পাড়ার সব ছেলে আপনার কাছে পাঠাবো। নেতা কাপালীর কাছে পড়লে যদি ছেলে

মানুষ হতো, তা হলে আর ভাবনা ছিল না। ব্রাহ্মণ হলো সমাজের সব কাজের গুরুমশায়। কথায় বলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

গঙ্গাচরণ মন দিয়ে ছেলে পড়ায় বটে। ঘুম থেকে উঠে সে ছেলেদের নিয়ে অনেকক্ষণ ব্যস্ত রইল—কাউকে নামতা পড়ায়, কাউকে ইংরেজী ফার্স্ট বুক পড়ায়—ফাঁকিবাজ গুরুমশায় কেউ তাকে বলতে পারবে না। বেলা বেশ পড়ে গেলে সে ছাত্রদের ছুটি দিয়ে লাঠি নিয়ে বাইরে বেরুবার উদ্যোগ করতে অনঙ্গ এসে বললে—ওগো, কিছু খেয়ে যাবে না—আজ দু'বাড়ী থেকে দুধ দিয়েছিল, একটু ক্ষীর করেচি—

বৈকালিক জলযোগ অনেকদিন অদৃষ্টে ঘটে নি।

নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যে আজ তিনটি বছর কাটচে স্বামী-স্ত্রীর। সুতরাং স্ত্রীর কথা গঙ্গাচরণের কানে একটু নতুন শোনালো।

স্ত্রীকে বললে—ছেলেদের দিয়েচ?

—সে ভাবনা তো তোমার করতে হবে না, তুমি খেয়ে নাও—

খেতে খেতে পরম তৃপ্তির সঙ্গে সে স্ত্রীকে বললে—এখানে আছি ভালই, কি বল?

অনঙ্গ-বৌয়ের মুখে সমর্থনসূচক মৃদু হাসি দেখা দিল, সে কোনো উত্তর করলে না। লক্ষ্মীর কৃপা যদি হয়ই, মুখে তা নিয়ে বড়াই করতে নেই। তাতে লক্ষ্মী রাগ করেন।

গঙ্গাচরণ খানিকটা ক্ষীরসুদ্ধ বাটিটা স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললে—এই নাও—

—ও কি! না-না—সবটা খেয়ে ফেল—

—তুমি এটুকু—

—আমার জন্যে আছে গো আছে, সে ভাবনা তোমায় করতে হবে না—

—তা হোক। আর খাবো না—এবার বিশ্বেস মশায়ের বাড়ী যাই। পাকাপাকি করে আসি।

—বেশি দেরি কোরো না—এখানে নাকি বুনো শুওর বেরোয় সন্দের পর। আমার বড্ড ভয় করে বাপু—

গঙ্গাচরণ ছায়া-ভরা বিকেলে মাঠের রাস্তা বেয়ে গন্তব্যস্থানে যেতে যেতে কল্পনাচক্ষে তার ভবিষ্যৎ গৃহস্থালীর ছবি আঁকছিল। বেশ লাগে ভাবতে। এই সব মাঠে ভাল চাষের জমি পাওয়া যায়, যদি কিছু জমি তাড়ংগাড়ার বাঁড়ুয্যে

জমিদারদের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেওয়ার যোগাযোগ ঘটে, যদি বিশ্বেস মশায়কে বলে কয়ে একখানা লাঙল করা যায় তবে ভাত-কাপড়ের ভাবনা দূর হবে সংসারের।

অনেকদিন থেকে সে জিনিসের ভাবনাটা চলে আসচে।

হয়তো ভগবান ঠিক জায়গাতেই নিয়ে এসে ফেলেচেন এতদিনে।

বিশ্বাস মশায়ও যথেষ্ট আগ্রহ দেখালেন গঙ্গাচরণকে এ-গ্রামে বসাবার জন্যে। বললেন—আপনারা আমাদের মাথার মণি—আমি আপনাকে সব বন্দোবস্ত করে দিচ্চি।

—একটা পাঠশালার বন্দোবস্ত আপনি করে দিন—

—সব হয়ে যাবে—আপাতত যাতে আপনার চলে তার ব্যবস্থা করতে হবে তো? বাড়িতে খেতে ক'জন?

—আমার স্ত্রী ও দুটি ছেলে—

বিশ্বাস মশায় মনে মনে হিসাব করে বললেন—ধরুন মাসে দশ আড়ি ধান—পনেরো কাঠা চাল হলে আপনার মাস চলে যাবে—কি বলেন?

—হ্যাঁ, তাই ধরুন—

—আর সংসারের ডাল-ডুল, তেল-নুন—ও হয়ে যাবে—পুরুতগিরিটাও ধরুন—

—সে তো ঠিক করেই রেখেচি—সংস্কৃত জিনিসটা কষ্ট করে শিখতে হয়েছে—ও বড় শক্ত জিনিস, সকলের মুখ দিয়ে কি বেরোয়? এই শুনুন তবে—ধ্যায়ন্নিত্যং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং—ইয়ে—পরশুমৃগবরা ভীতিহস্তা—ইয়ে রত্নকল্পজ্জ্বলাং—

—বাঃ, বাঃ—

—এটা কি বলুন তো?

—কি করে জানবো বলুন—আমরা হচ্ছি চাষাভুসী গেরস্ত, আংক আঙ্ক পর্যন্ত আমাদের বিদ্যে। আর শিশুবোধক। পড়েচেন শিশুবোধক?

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল—

দেখুন কতদিন আগে পড়েচি, ভুলিনি। সব মনে আছে।

গঙ্গাচরণ উৎসাহের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললে—বেশ—বেশ—

বিশ্বাস মশায় হৃষ্ট মনে বললেন—বাবা মারা গেলেন অল্প বয়সে। সংসারে

দুটি নাবালক ভাই—জমি-জমা যা ছিল এক জ্ঞাতি খুড়ো সব নিজের বলে লিখিয়ে নিলে জরিপের সময়—

—সে কোথায়?

—চিত্রাঙ্গপুর, ভাবতলীর কাছে। ভাবতলীর গরুর হাট ও দিগড়ে নামকরা। অতবড় গরুর হাট এ জেলায় নেই।

—সেখান থেকে বুঝি এখানে এলেন?

—হ্যাঁ, দেখলাম, ও গাঁয়ে আর সুবিধে হবে না। মনে মনে বললাম, মন পৈতৃক ভিটের মায়া ছাড়। এখানে কি না খেয়ে মরবে? আমি আর বিষ্টু সা। বিষ্টু সা আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। আমার সঙ্গে গাঁ ছেড়ে যেতে রাজী হলো। তখন খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে। এ বলে ওখানে জমি সস্তা ও বলে ওখানে জমি সস্তা। কিন্তু মশায় জমি পাওয়াই যায় না। সস্তা তো কোথায় দেখলাম না। পঞ্চাশ টাকার কমে কোথাও জমি নেই—

—ধানের জমি—

বিশ্বাসমশায়ের অন্দরমহলে এই সময় শাঁকে ফুঁ পড়লো, গঙ্গাচরণ ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে বললে—ওঃ, সন্ধে হয়ে গেল—আমি এবার যাই—এবার সন্দে-আহ্নিক করতে হবে কিনা?

আসল কথা, স্ত্রীর বুনো শুওর সংক্রান্ত সতর্কবাণী তার মনে পড়েছে। নতুন গাঁয়ের আশেপাশে এখনও যথেষ্ট বনজঙ্গল, অন্ধকারে চলাফেরা না করাই ভালো। সাবধানের মার নেই।

বিশ্বাস মশায় বললেন—তা বিলক্ষণ! এখানে আমার এই বাহিরের ঘরেই সন্দে-আহ্নিকের জায়গা করে দিই। গঙ্গাজল আছে বাড়ীতে। আমরা জেতে কাপালী বটে, কিন্তু আমাদের বাড়ীর মেয়েরা স্নান না করে মুখে জলটুকু দেয় না—সব মাজাঘষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ব্রাহ্মণের সন্দে-আহ্নিক হলে এ বাড়ীতে, বাড়ী আমার পবিত্র হয়ে যাবে। তারপর একটু জল মুখে দিন—

না না, সে সবে এখন আর দরকার নেই—যখন এখানে আছি, তখন সবই হবে—উঠি এখন—গঙ্গাচরণ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

বিশ্বাস মশায় বললেন—আমার গল্পটা শুনে যান। তারপর তো—

আচ্ছা ও আর একদিন শুনবো এখন! সন্দে-আহ্নিকের সময় হয়ে গেলে আমার আর কোনোদিকে মন থাকে না। ব্রাহ্মণের ছেলে, সংস্কৃত পড়েছি—নিত্যকর্মগুলো তো ছাড়তে পারবো না—

গঙ্গাচরণের কণ্ঠস্বর ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠলো।

গঙ্গাচরণের পাঠশালা বেশ জমে উঠেছে।

আজ সকালে সাত-আটটি নতুন ছাত্র দড়ি-বাঁধা মাটির দোয়াত হাতে ঝুলিয়ে এসে উপস্থিত। গঙ্গাচরণ তাদের নিয়ে বেলা দুপুর পর্যন্ত ব্যস্ত রইল। ছাত্রদের মধ্যে সকলেই স্থূলবুদ্ধি, এদের বাপ-ঠাকুরদাদা কখনও নিজের নাম লিখতে শেখে নি, জমি চষে কলা বেগুন করে জীবিকানির্বাহ করে এসেচে, লেখাপড়া শেখাটা এদের বংশে একেবারে অভিনব পদার্থ।

গঙ্গাচরণ বলে, সকাল থেকে চেষ্টা করে ক'য়ের আঁকুড়ি দিতে শিখলি নে? তা শিখবি কোথা থেকে? এখন ও সব আঙুল সোজা হতে ছ'মাস কেটে যাবে। লাঙলের মুঠি ধরে ধরে আড়ষ্ট হয়ে আছে যে। এই ভূতো, যা একটু তামাক সেজে নিয়ে আয় দিকি? রান্নাঘরে তোর কাকীমার কাছ থেকে আগুন নিয়ে আয়—

দু'টি ছাত্র ছুটলো তখুনি আগুন আনতে।

গঙ্গাচরণ হেঁকে বললে—এই! যাবার দরকার কি তোমার? ভূতো একাই পারবে।

অন্য একটি ছেলের দিকে চেয়ে বললে—তোর বাবা বাড়ী আছে?

ছেলেটি বললে—হ্যাঁ স্যার্—

—কাল যেন আমায় এসে কামিয়ে দিয়ে যায় বলে দিস—

—স্যার্, বাবা কাল ভিন্‌গাঁয়ে কামাতে গিয়েচে।

—এলে বলে দিস এখানে যেন আসে।

অনঙ্গ-বৌ ডেকে পাঠালো বাড়ীর মধ্যে থেকে।

গঙ্গাচরণ গিয়ে বললে—ডাকছিলে কেন?

অনঙ্গ বললে—শুধু ছেলেদের নিয়ে বসে থাকলে চলবে? কাঠ ফুরিয়েচে তার ব্যবস্থা ছাখো—

গঙ্গাচরণ আশ্চর্য হবার সুরে বললে—সে কি? এই যে সেদিন কাঠ কাটিয়ে দিলাম এক-গাড়ী। সব পুড়িয়ে ফেললে এর মধ্যে?

অনঙ্গ রাগ করে বললে—কাঠ কি খাবার জিনিস যে খেয়ে ফেলেচি? রোজ এক হাঁড়ি ধান সেদ্ধ হবে, চিঁড়ে কোটা হলো দশ-বারো কাঠা—এতে কাঠ খরচ হয় না?

অনঙ্গ কথাটা একটু গর্ব ও আনন্দের সুরেই বললে, কারণ সে যে দরিদ্র ঘর থেকে এসেচে সেখানে একদিনে এত ধানের চিঁড়ে-কোটারূপ সচ্ছলতা স্বপ্নের বিষয় ছিল—যে-দারিদ্রের মধ্যে এসে পড়েছিল প্রথম শ্বশুরবাড়ী এসে, এখন সে-কথা ভাবতেও যেন পারা যায় না।

বাসুদেবপুর এসে আগের চেয়ে অবিশ্যি অবস্থা ভালই হয়েছিল। তবে সে গ্রামে শুধু পাঠশালার ছেলে পড়ানোর আয় ছিল সম্বল, জিনিসপত্র কেউ দিত না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এখনও বাসুদেবপুর নিয়ে কথা ওঠে।

সেদিনই দুপুরের পর আহারান্তে গঙ্গাচরণ একটু বিশ্রাম করছিল,অনঙ্গ এসে বললে—বাসুদেবপুর আবার যাবার ইচ্ছে আছে ?

—গঙ্গাচরণ বিস্ময়ের সঙ্গে বললে—কেন বল দিকি ?

না তাই বলচি। সেখানকার ঘরখানা তো এখনও রেখেই দিয়েচ, বিক্রি, করেও তো এলে না।

—তখন কি জানি এখানে বেশ জমে উঠবে ?

ভাতছালার জন্যে কিন্তু মন কেমন করে। সেখানকার পদ্মবিলের কথা মনে আছে ?

—পদ্মবিল তো ভালই ছিল। বেশ জল।

—চত্তির মাসে জল থাকতো না বটে, কিন্তু না থাকুক বাপু, গাঁখানার লোকগুলো ছিল বড্ড ভাল। তিনদিকে মাঠ, একদিকে অতবড় বিল, সুন্দর দেখতে ছিল।

—তুমি তো বলেছিলে পদ্মবিলের ধারে ঘর বাঁধবে।

—ভেবেছিলাম নতুন খড় উঠলেই পদ্মবিলের ধারে ঘর তৈরি করবো। লোকজনকে বলেও রেখেছিলাম। সস্তায় খড় দিত।

অনঙ্গ আপন মনে হিসেব করবার ভঙ্গিতে বললে আঙুল গুণে গুণে—হরিহরপুরে বিয়ে হলো। সেখান থেকে ভাতছালা, তারপর বাসুদেবপুর, তারপর এখানে। অনেক দেশ বেড়ানো হলো আমাদের—কি বলো ?

গঙ্গাচরণ গর্বের সুরে বললে—বলি হরিহরপুর গাঁয়ের ক'জন এত দেশ দেখে বেড়িয়েচে ?

অনঙ্গ বললে—শুধু দেখে বেড়ানো কি বলো গো ! বাসও করা হয়েচে।

—নিশ্চয়ই।

—কিন্তু একটা কথা বাপু···

—এ গাঁ ছেড়ে অন্য কোথাও আর যেও না।

—যদ্দিন চলা-চলতির সুবিধে থাকে, থাকবো বৈকি। এখন তো বেশই হচ্চে—বিশ্বাস মশায় এ গাঁয়ের মোড়ল। সে যখন ভরসা দিয়েচে, তখন আর ভয় করি নে—

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু তোমার যে মন টেঁকে না কোথাও বেশি দিন।

—হাতে পয়সা এলেই মন টিকবে। তা ছাড়া দিব্যি নদী—

—আমার কিন্তু ইচ্ছে করে একবার ভাতছালা দেখতে।

—তা একবার গেলেই হয়। গরুর গাড়ীতে এক দিনের রাস্তা। বিশ্বেস মশায়ের কাছে বললেই গরুর গাড়ী দিতে পারে।

অনঙ্গ আগ্রহের সঙ্গে বললে—হ্যাঁ গা তা বলো না। বলবে একবার বিশ্বেস মশায়কে?

গঙ্গাচরণ হেসে বললে—কেন? ভাতছালা যাবার খুব ইচ্ছে?

—খু-উ ব।

—তুমি তাহলে পটল আর খোকাকে নিয়ে ঘুরে এসো একদিন।

—কেন তুমি?

—আমার পাঠশালার ছুটি কই? আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে।

—কতকাল যাই নি ভাতছালা। চার বছর কি পাঁচ বছর। ভাতছালার বিনিদাপতিনিকে মনে আছে? আহা, কি ভালই বাসতো। আমার দেখা হলে সেও কত খুশি হয়! সেই আমবাগানের ধারে আমাদের ঘরখানা!—আচ্ছা কত জায়গায় ঘর বাঁধলে বলো তো?

গল্পগুজবে শীতের বেলা পড়ে এল। গঙ্গাচরণ উঠে বললে—যাই। একবার পাশের গাঁয়ে যাবো। পাঠশালার জন্যে আরও ছাত্র যোগাড় করে আনি। ছাত্র যত বেশি হবে ততই সুবিধে।

—একটু কিছু জল খেয়ে যাও।

গঙ্গাচরণ আহ্লাদে হেসে বললে—অভ্যেস খারাপ করে দিও না বলচি। এ সময় জলখাবার খেয়েচি কবে?

অনঙ্গ হাসিমুখে বললে—মা-লক্ষ্মী যখন জুটিয়ে দিয়েছেন, তখন খাও। দাঁড়াও আমি আনি—

একটা পাথরের বাটিতে কয়েক টুকরো পেঁপে কাটা ও আখের টিকলি এবং অন্য একটা কাঁসার বাটিতে খানিকটা সর নিয়ে অনঙ্গ-বৌ স্বামীর

সামনে রাখলে। গঙ্গাচরণ খেতে খেতে বললে—আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না?

—কি?

—আচ্ছা, একটু চায়ের ব্যবস্থা করলে হয় না?

অনঙ্গ ঠোঁট উল্টে বললে—ওঃ! তোমার যদি হলো তো সব চাই। চা!

—কেন?

—ওসব বড়মানুষে খায়। গরীব ঘরে কি পোষায়?

গঙ্গাচরণ হেসে বললে—আসলে তুমি চা তৈরি করতে জান না তাই বলো।

অনঙ্গ মুখভঙ্গি করে বললে—আহা-হা!

—পারো চা করতে? কোথায় করলে তুমি?

অনঙ্গ এক ধরনের হাসলে, যার মানে হচ্ছে আর ভান করে কি করবো?

গঙ্গাচরণ বললে—কেমন ধরে ফেলিচি কিনা?

অনঙ্গ প্রত্যুত্তরে আর একবার হেসে বললে—না করি, করতে দেখেচি তো। বাসুদেবপুরে চক্কত্তি-বাড়ী চা খেতো সবাই। আমি গিন্নীর কাছে বসে বসে দেখতাম না বুঝি?

গঙ্গাচরণ পাশের গ্রামে যখন মাঠের পথ দিয়ে বেরিয়ে গেল তখন বেলা বেশ পড়ে এসেচে। সারাদিনের তাজা খর রোদে উলু ও কাশবনে কেমন সুন্দর একটা সোঁদা গন্ধ। শীতও আজ পড়েচে মন্দ নয়।

একটা লোক খেজুর গাছে মাটির ভাঁড় নিয়ে উঠচে দেখে গঙ্গাচরণ ডেকে বললে—বলি ও ছিদাম, একদিন খেজুর-রস খাওয়াও বাবা।

লোকটা গাছের ওপর থেকেই বললে—গুরুমশায়? কাল সকালে পেটিয়ে দেবেন একটা ছেলে। এক ভাঁড় যেন নিয়ে যায়—

গঙ্গাচরণের মনে যথেষ্ট আনন্দ ও সন্তোষ এই ভেবে, যে কেউ তার কথা এখানে ঠেলতে পারে না। সবাই মানে, যার কাছে যে জিনিস চাওয়া যায়, কেউ দিতে অস্বীকার করে না। বাসুদেবপুরে এমন ছিল না, ভাতছালাতেও না।

পাশের গ্রামের কোনো নাম নেই—'পশ্চিমপাড়া' বলে সবাই। এর একটা কারণ—এসব গ্রাম আজ কয়েক বৎসর হলো বসেচে। আগে এসব পতিত মাঠ

বা অনাবাদী চর ছিল, এদেশের চাষাদের জমির অভাব ছিল না, তাদের মধ্যে কেউ এসে এই সব জঙ্গল ও নলখাগড়া ভরা পতিত জমিতে চাষ করতে রাজী নয়। অন্য জেলা থেকে কাপালী জাতীয় চাষীরা এসে এই অনাবাদী চরে সোনা ফলিয়েচে, এরাই নতুন গ্রামগুলো বসিয়েচে—গ্রামের নামকরণ এখনও হয় নি।

পশ্চিমপাড়াতে ঢুকেই গ্রামের মণ্ডপ ঘর। বিকেলে দু-পাঁচজন লোক এখানে বসে তামাক পোড়াচ্চে।

একজন গঙ্গাচরণকে দেখে বললে—কি মনে করে দাদাঠাকুর? পেরনাম হই। আসুন—

গঙ্গাচরণ ভড়ং দেখাবার জন্যে ফতুয়ার নিচে থেকে পৈতেটা বার করে আঙুলে জড়িয়ে হাতে তুলে বললে—জয়স্ত।

তারপর বসে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে—এটা বেশ ঘরখানা করেচ তো? পুজো হয়?

দলের মধ্যে একজন গঙ্গাচরণকে তামাক খাওয়ার জন্যে কলাপাত আনতে ছুটলো। একজন বললে—পুজো হয় নি দাদাঠাকুর। সামনের বারে করবার ইচ্ছে আছে—আচ্ছা, আপনি পারবেন দাদাঠাকুর?

গঙ্গাচরণ অবজ্ঞাসূচক হাসি হেসে চুপ করে রইল, উত্তর দিলে না। এতে পসার থাকে না।

ওদের মধ্যে আর একজন পূর্বের লোকটিকে ধমক দিয়ে বললে—জানিস নে শুনিস নে কথা বলতে যাস—এই তো তোর দোষ। উনি জানেন না পুজো কত্তি, তো কে করবে? উনি নেকাপড়া জানা পণ্ডিত মানুষ।

গঙ্গাচরণ ধীর ভাবে বললে—থাক থাক, ও ছেলেমানুষ···বলেচে বলেচে—

ইতিমধ্যে কলার পাত এল, একজন হুঁকো থেকে কল্কে খুলে গঙ্গাচরণের হাতে দিতে যেতেই গঙ্গাচরণ বিস্মিত ভাবে বললে—কি?

—তামাক ইচ্ছে করুন—

—তোমাদের উচ্ছিষ্ট কলকেতে আমি তামাক খাবো?

দলের যে লোকটি কল্কে এগিয়ে হাতে দিতে গিয়েছিল, সে দস্তুরমত অপ্রতিভ হলো।

তখন ওদের মধ্যে সেই বিজ্ঞ লোকটি আবার ধমক দিয়ে বললে—একি পাঁচু-ঠাকুরকে পেয়েছিস তোরা, কাকে কি বলিস্ তার ঠিক নেই। দাঁড়ান, দাদাঠাকুর, আমার বাড়ীতে নতুন কলকে আড়ায় টাঙানো আছে, নিয়ে আসি।

গঙ্গাচরণ গম্ভীরভাবে বললে—হাত ধুয়ে এনো—

উপস্থিত লোকগুলো ভক্তিতে গদগদ হয়ে পড়লো। হাত ধুয়ে নতুন কল্কেতে তামাক সাজতে হয় যার জন্যে, এমন ব্রাহ্মণ সত্যি কথা বলতে গেলে তারা কখনো দেখে নি।

নতুন কল্কে আনীত হলো, নতুন কলাপাতাও। গঙ্গাচরণের হাতে ভক্তি-ভাবে টাটকা-সাজা তামাক এগিয়ে দেওয়া হলো।

গঙ্গাচরণ বললে—কথাবার্তা বলতে হয় বুঝে-সুজে বাপু। আমি পূজো করতে জানি না-জানি তোমরা যে জিজ্ঞেস করলে—তোমরা এর কিছু বুঝবে?

বিজ্ঞ লোকটি তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—হুঁঃ, একদম অর্গ মুখ্যু!

—এই কথা বলে নিজের বিজ্ঞতা প্রমাণ করে সে গঙ্গাচরণের দিকে চেয়ে বললে—বাদ দিন ওদের কথা। ওরা কাকে কি বলতে হয় জানে?

গঙ্গাচরণ বললে—সে কথা যাক গে। এখন তোমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কি জানো?

দলের অন্য লোকেরা কথা বলতে সাহস না করতে শুধু বিজ্ঞ লোকটিই এর উত্তরে বললে—কি বলুন দাদাঠাকুর?

—আমি একটা পাঠশালা খুলেচি নতুন গ্রামে। তোমাদের গ্রামের ছেলে-গুলি সেখানে পাঠাতে হবে।

—বেশ কথা দাদাঠাকুর। এ তো খুব ভাল—আমাদের ছেলেপিলেদের একটা হিল্লে হয় তা হলে—

—খুব ভালো। সেজন্যে তো আমি এলাম তোমাদের কাছে। তুমি একবার সবাইকে বলো—

লোকটি দলের দিকে চেয়ে বললে—শুনলে তো সবাই দাদাঠাকুর যা বললেন? আপনি বসুন, আমি ওদের ডেকে নিয়ে একটু পরামর্শ করি—

একটা কাঁটালতলায় সকলে মিলে জোট পাকিয়ে কি বলা-কওয়া করলে, তারপর বিজ্ঞ লোকটি আবার ফিরে এসে গঙ্গাচরণের কাছে বসলো। বললে —সব ঠিক হয়ে গেল দাদাঠাকুর—

—কি?

—সবাই ছেলে পেটিয়ে দেবে কাল থেকে। ওনারা আর একটা কথা বলচেন—

—কি কথা?

—আমাদের এখানে যদি পাঠশালা খোলেন তবে কেমন হয়?

—দুজায়গায় হয় না। ও গ্রামে বাস করি, এ গ্রামে পাঠশালা—তাও হয় না।

—কত দিতে হবে আমাদের, একটা ঠিক করে দ্যান্—

—আমার বাপু জোরজবরদস্তি নেই, বিদ্যাদানং মহাপুণ্যং, বিদ্যাদান করলে কোটি অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। তবে আমারও তো চলা-চলতির ব্যবস্থা একটা চাই, এই বুঝে তোমরা যা দাও। নিজেরাই ঠিক করো। আমার মুখে বলাটা ভালো হবে না।

গঙ্গাচরণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এভাবে অগ্রসর হলে ফল ভাল হয় সে জানে। কাজেই বাড়ীতে ফিরে অনঙ্গ যখন বললে—তা ওদের ওপর ফেলে দিলে কেন? তোমার নিজের বলা উচিত ছিল—তখন গঙ্গাচরণ হেসে বললে—আবে না জেনে কি আর আমি তাড ঘাঁটতে গিয়েচি। আমি নিজের মুখে হয় তো বলতাম চার আনা—ওরা দেবে আট আনা—দেখে নিও তুমি।

পরদিন সকালে খোদ বিশ্বাস মহাশয়কে নিজের বাড়ীতে আসতে দেখে গঙ্গাচরণ বিস্মিত হলো। ছেলেকে ডেকে বললে—পটলা, ডেক্‌সোটা নিয়ে আয় চট করে—

ডেক্‌সো মানে একটা কেরোসিন কাঠের পুরানো প্যাকিং বাক্স। এর নাম 'ডেক্‌সো' কেন হয়েচে তার ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করা দুষ্কর।

বিশ্বাস মশায় বললেন—থাক থাক—আমার জন্যে কেন—

—সে কি হয়? বসুন বসুন—তারপর কি মনে করে সকালবেলা?

—একটা কথা ছিল। আমার বাড়ীতে কাল আপনি সমস্কৃতো বলেচেন, বাড়ীর মেয়েরা সব শুনেচে। আমায় একটা গাইগরুব আজ মাসাবধি হলো দড়ি গলায় আটকে অপমিত্যু ঘটেচে। সবারই মন সেজন্যে খারাপ। আমার নাতির অসুখ সেই থেকে সারচে না—জ্বর আর সর্দি লেগেই আছে—বুঝলেন?

গঙ্গাচরণ গম্ভীর ও চিন্তাকুল ভাবে ঘাড় নাড়তে লাগলো। ভাবটা এই রকম যে, "ও তো না হয়েই যায় না"—

বিশ্বাস মশায় বললেন—এখন কি করা যায়? কাল রাত্তিরে আমার পরিবার বললে—ওনার কাছে যাও, উনি পণ্ডিত লোক, একটা হিল্লে হবে।

গঙ্গাচরণ পূর্ববৎ চিন্তাকুল। সংক্ষেপে শুধু বললে—হুঁ—

ওর হাবভাব দেখে বিশ্বাস মশায় ভয় পেয়ে গেলেন। খুব গুরুতর কিছু

ঘটবার সূত্রপাত নাকি সংসারে ? শাস্ত্র জানা ব্রাহ্মণ, কি বুঝেচে কি জানি ? আর কিছু বলতে তাঁর সাহস যোগাল না।

গঙ্গাচরণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—কিছু খরচ করতে হবে। বিপদে ফেলেচে।

বিশ্বাস মশায় উদ্বেগের সুরে বললেন—কি রকম ? কি রকম ?

—গোবধ মহাপাপ। এত বড় মহাপাপ যে—

বিশ্বাস মশায় বাধা দিয়ে বললেন—কিন্তু এ তো আমরা ইচ্ছে করে করি নি ? মাঠে বাঁধা ছিল, দড়ি গলায় কি করে আটকে—

—ওই একই কথা। গোবধ ওকেই বলে—মহাপাপ।

—এখন কি করা যায় তা হলে ?

—স্বস্ত্যয়ন করতে হবে, সামনের আমাবস্থের দিন যোগাড় করতে হবে সব। টাকা পনেরো-কুড়ি খরচ হবে।

বিশ্বাস মশায় উদ্বিগ্ন সুরে বললেন—কি কি লাগবে একটা ফর্দ করে দিন ঠাকুর মশাই।

গঙ্গাচরণ গম্ভীরভাবে বললে—দেখে শুনে ফর্দ করতে হবে। একটা গুরুতর ব্যাপার, আপনার নাতির অসুখ সারা না-সারা এর ওপর নির্ভর করচে। যা তা করে দিলেই তো হবে না ? দাঁড়ান একটু, আসচি—

গঙ্গাচরণ বাড়ীর মধ্যে ঢুকতেই দেখলে অনঙ্গ-বৌ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা সব আড়াল থেকে শুনচে।

স্বামীকে দেখে বললে—ও কে গা ?—কি হয়েচে ?

গঙ্গাচরণ স্ত্রীকে হাতছানি দিয়ে ভেতরের উঠোনে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—বড় খদ্দের। উনি হোলেন বিশ্বেস মশায়। তোমার কাপড় আছে কখানা ?

—আমার ?

—আঃ, তাড়াতাড়ি বল না ? তোমার নয়তো কি আমার ?

—আমার আটপৌরে শাড়ী আছে দুখানা, আর একখানা, তিনখানা। তোরঙ্গের মধ্যে তোলা ভালো শাড়ী আছে দুখানা।

—কি নেবে বলো। ভালো শাড়ী না আটপৌরে ?

—ভালো শাড়ী একখানা হলে বড্ড ভালো হয়, কস্তাপেড়ে, এই—এই রকম জলচুড়ি দেওয়া, বাসুদেবপুরে চক্কত্তি-গিন্নীর পরনে দেখে সেই পর্যন্ত বড্ড মনটার ইচ্ছে—হ্যাঁ গা কে দেবে গা ?

—আঃ, একটু আস্তে কথা বলতে পার না ছাই! দাঁড়িয়ে রয়েচে বাইরে। আর শোনো, গাওয়া ঘি আছে ঘরে?

অনঙ্গ ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিলের সুরে বললে—গাওয়া ঘি! বলে ভাত পায় না, মুড়কি জলপান—

গঙ্গাচরণ বাইরে এসে বললে—এই যে বিশ্বাস মশায়, বসিয়ে রাখলাম। কিন্তু এসব কাজ ভেবে চিন্তে করে দিতে হয়। শুনে নিন—ভালো লালপাড় শাড়ী একখানা, গাওয়া ঘি আধ সের—ওটা—তিন পোয়াই ধরুন। চিনি পাঁচপোয়া, পাকাকলা একছড়া, সন্দেশ পাঁচপোয়া, গামছা দুখানা, পেতলের থালা একখানা, ঘটি একটা, ধুনো একপোয়া—ওঃ ভুলে গিয়েচি মধুপর্কের বাটি একটা, আসন একটা—বিশ্বাস মশায় মন দিয়ে ফর্দ শুনে বললেন—আর সব নতুন দেবো, কিন্তু ঐ থালাঘটি কি নতুনই দিতে হবে? আপনার বাড়ী থেকে না হয় দিন, কিছু দাম ধরে দিলে হয় না?

—তা হয়। তবে খুঁৎ না রাখাই ভালো। আপনি নতুনই দেবেন।

—দিন ঠিক করে দিন—

—সামনের আমাবস্যায় হবে, ওর আর দিন ঠিক কি। বলেছি তো দক্ষিণে লাগবে দুটাকা।

বিশ্বাস মশায় অনুরোধের সুরে বললেন—টাকা খরচের জন্যে আপত্তি নেই—যাতে নাতিটি আমার—ঠাকুর মশাই—যাতে সেরে ওঠে—

প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠলেন উনি।

গঙ্গাচরণ আশ্বাসের ভঙ্গিতে বললেন—হুঁঃ, গোবধ! বলে কত কত শক্ত কাণ্ডের জন্যে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে এলাম! কোনো ভয় নেই, যান আপনি।

অনঙ্গ স্বামীর কৃতিত্বে খুশি না হয়ে পারলো না যেদিন গঙ্গাচরণ বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী থেকে একরাশি জিনিসপত্র বহন করে বাড়ী নিয়ে এল। একগাল হেসে বললে—দেখি শাড়ীখানা? বাঃ, চমৎকার কস্তাপেড়ে—গাওয়া ঘি? কতটা?

—তা আছে পাকি তিনপোয়া। বাড়ী তৈরি খাঁটি ঘি।

—এইবার একবার ভাতছালা বেড়িয়ে আসি, কি বলো?

—বিশ্বেস মশায়কে বলেও এসেছি। গরুর গাড়ী দেবে বলেচে—

—তুমি যাবে না?

—আমার কি সময় আছে যে যাবো? ছেলে পড়াতে হবে না? তুমি যাও

ছেলেদের নিয়ে। এসময়ে টাকাও পেয়েছি দুটো। একটা থাক্, একটা খরচ করে এসো।

কিন্তু যাই যাই করে শীত কেটে গিয়ে ফাল্গুন মাস পড়ে গেল। তখন অনঙ্গ একদিন বিশ্বাস মশায়ের গরুর গাড়ীতে ছেলেদের নিয়ে ভাতছালা রওনা হলো। দুক্রোশ পথ গিয়ে কাঁটালিয়া নদী পার হতে হলো জোড়াখেয়া নৌকোতে গরুর গাড়ীসুদ্ধ। অনঙ্গ-বৌয়ের বেশ মজা লাগলো এমনভাবে নদী পার হতে। ওপারে উঁচু ডাঙায় নদীতীরে প্রথম বসন্তে বিস্তর ঘেঁটুফুল ফুটে আছে, বাতাসে ভুর ভুর করচে আমের বউলের মিষ্ট সুবাস, আঁকাবাঁকা শিমুলগাছে রাঙাফুল ফুটে আছে।

অনঙ্গ ছেলেদের বললে—এখানে এই ছায়ায় বসে দুটো মুড়ি খেয়ে নে—কখন ভাতছালা পৌঁছবি তার ঠিক নেই।

বড়ছেলেটা বললে—ওঃ কি আমের বোল হয়েছে ছাখো সব গাছে। এবার বড্ড আম হবে, না মা?

—খেয়ে নে মুড়ি। আমের বোল দেখবার সময় নেই এখন।

ছেলে দুটি ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলো নদীর পাড়ে গাছ-পালার ছায়ায় ফড়িং ধরবার জন্যে। অনঙ্গ ওদের বকেঝকে আবার গাড়ীতে ওঠালে।

নিস্তব্ধ ফাগুন-দুপুরে মেঠোপথে আমবন, জাম, বট, বাঁশ, শিমূলগাছের ছায়ায় ছায়ায় গরুর গাড়ীর ছইয়ের মধ্যে বসে অনঙ্গ-বৌয়ের ঝিমুনি ধরলো। বড়ছেলে বললে—মা, তুমি ঢুলে পড়ে যাচ্চ যে, উঠে বোসো।

অনঙ্গ অপ্রতিভ হয়ে বললে—চোখে একটু জল দিলে হতো। ঘুম আসচে।

ভাতছালা পৌঁছুতে বেলা পড়ে গেল। গাড়োয়ান বললে—তবু সকালে সকালে এসে গ্যালাম মা-ঠাকরোণ। ন কোশ রাস্তা আমাদের গাঁ থে। গরুদুটোর সুধার বয়েস তাই আসতে পারলে।

ভাতছালাতে অনঙ্গ-বৌদের ঘর ছিল গ্রামের বাগ্দি পাড়া থেকে অল্পদূরে খুব বড় একটা বিলের কাছে। একখানা খড়ের ঘর, সঙ্গে ছোট একখানা রান্নাঘর, অনেকদিন কেউ না থাকাতে চালার খড় কিছু কিছু উড়ে পড়েচে, মাটির দাওয়াতে ছাগল গরু উঠে খুঁড়ে ফেলেচে। উঠোনের চারিধারে বাঁশের বেড়া

দেওয়া ছিল, ফাঁকে ফাঁকে রাংচিতার গাছ। বেড়ার শুকনো বাঁশ লোকে ভেঙে নিয়েচে অনেক।

মতি বাগ্‌দিনী ছুটে এল ওদের গরুর গাড়ী দেখে। মহাখুশির সঙ্গে বললে—বামুন-দিদি আলেন নাকি? ওমা, আমাদের কি ভাগ্যি—

অনঙ্গ-বৌ বললে—আয় আয় ও মতি, ভাল আছিস?

—দাঁড়ান, আগে একটু গড় করে নিই। পায়ের ধূলো দ্যান এট্টু—খোকারা বেশ বড় হয়েচে দেখচি। বাঃ—

—ভাল ছিলি?

—আপনাদের ছিচরণের আশীর্ব্বাদে। এখন আছেন কোথায়?

—ওই নতুনগাঁ, কাপালীপাড়ায়। ন কোশ রাস্তা এখান থেকে।

—এখানে এখন থাকবেন তো?

—বেশিদিন কি থাকতে পারি? সেখানে উনি ইস্কুল খুলেচেন মস্তবড়। একঘর ছাত্তর। দুদিন থাকবো তাই তাঁকে রেঁধে খেতে হবে।

—খাওয়াদাওয়ার যোগাড় করবো?

—আমাদের সঙ্গে চালডাল আছে পুঁটুলিতে। তুই দুটো শুকনো কাঠ কুড়িয়ে দিয়ে যা।

পদ্মবিলের থেকে কিছুদূরে মুচিপাড়া। প্রায় একশো ঘর মুচির বাস। পদ্মবিলে মাছ ধরে আশপাশের গ্রামে বেচে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। পোয়াটাক পথ দূরে গ্রামের অন্য অন্য জাত বাস করে। ব্রাহ্মণের বাস এ গ্রামেও নেই—এর একটা প্রধান কারণ, গঙ্গাচরণ এমন গ্রামে বাস করে নি যেখানে ব্রাহ্মণের বাস আছে।. কারণ সে গ্রামে তার পসার থাকবে না। তার বদলে অন্য ব্রাহ্মণ যেখানে ডাকবার সুবিধে আছে, এমন গ্রামে সে ঘর বাঁধতে যাবে কি জন্যে? তাতে আদর হয় না।

অনঙ্গ-বৌয়ের আগমনের সংবাদে গোয়ালাপাড়া থেকে বৌ-ঝিয়েরা দেখা করতে এল। কেউ নিয়ে এল একটি ঘটিতে সেরখানেক দুধ, কেউ নিয়ে এল খানিকটা খেজুর-গুড়ের পাটালি, কেউ একছড়া পাকা মর্তমান কলা। অনেক রাত পর্যন্ত ঝি-বৌয়েরা দাওয়ায় বসে গল্প করলে। সকলেই মহাখুশি অনঙ্গ-বৌ আসাতে। সকলেই অনুরোধ জানালে এখানে কিছুদিন থাকতে। এখানে আবার উঠে এলে কেমন হয়? তার সব সুবিধা করে দেবে বসবাসের। কোনো অভাব-অভিযোগ থাকতে দেবে না। আসুন না বামুনদিদি তাঁদের গাঁয়ে আবার?

ওরা নিজেরাই ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে দিলে। মাটির প্রদীপে তেল সলতে দিয়ে আলো জ্বেলে দিলে।

মতি মুচিনী বললে—রাত্তিরে আমি এসে শোবো ঘরের দাওয়ায়। দুটো খেয়ে আসি—

অনঙ্গ-বৌ তাকে বাড়ী গিয়ে খেতে দিলে না। যা রান্না হয়, এখানেই দুটো ডাল ভাত খেয়ে নিলেই হবে। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানও তো খাবে।

সন্ধ্যার পরে বেশ জ্যোৎস্না উঠলো। একটু ঠাণ্ডা পড়েচে জোর দক্ষিণ বাতাসে। বৌ-ঝিয়েরা একে একে চলে গেল। মতি মুচিনী কলার পাত কেটে এনে বিলের ধারে ঘাসের উপর ভাত খেতে বসলো। গাড়োয়ান বললে তার শরীর খারাপ হয়েচে সে কিছু খাবে না রাত্রে।

অনঙ্গ মাদুর পেতে গল্প করতে বসলো বিলের দিকের জ্যোৎস্নালোকিত দাওয়ায়। শ্যামাচরণ ঘোষের বিধবা মেয়ে একটা কেরোসিনের টেমি ধরিয়ে এসে হাজির হলো অনেক রাত্রে। সেও রাত্রে এখানে শোবে। অনঙ্গ-বৌকে সেও বড় ভালবাসে। এ মেয়েটির বিবাহ হয়েছিল পাশের গ্রাম কুমুরে। এগারো বছর বয়সে বিধবা হয়েচে, এখন প্রায় সাতাস-আটাশ বছর বয়েস, দেখতে এখনও সুন্দরী, টকটকে ফর্সা রং, মুখশ্রীও ভাল।

অনঙ্গ হেসে বললে—আয় কালী, চাঁদনী রাতে আবার একটা টেমি কেন?

কালী আঁচল দিয়ে টেমিটা বাঁচিয়ে আনচে পদ্মবিলের জোর দক্ষিণ-হাওয়া থেকে। বললে—সে জন্যে নয় দিদি, ওই মুচিপাড়ার বাঁশবাগান দিয়ে আসতে গা ছম ছম করে এত রাত্তিরে।

—কেন রে? ভূতে তোর ঘাড় মটকাবে?

কালী হেসে বললে—ওসব নাম কোরো না রাত্তির বেলা। তুমি ডাকাত মেয়েমানুষ বাবা—

—দূর পোড়ারমুখী, ব্রাহ্মণের আবার ভয় কি রে?

—ভূতে বামুন-বোষ্টম মানে না বৌদি, সত্যি কথা বলচি। সেবার হলো কি—

মতি মুচিনা ভয় পেয়ে বললে—বাদ দেও, ওসব, গল্প এখন করে না। ওই খেজুরের চটখানা পেতে শুয়ে পড় বামুন-দিদির পাশে।

অনঙ্গ-বৌয়ের মনে আজ খুব আনন্দ। অনেকদিন পরে সে তার পুরোনো

ঘরে ফিরে এসেচে। আবার পুরানো সঙ্গিনীদের সঙ্গে দেখা হয়েচে। পদ্মবিলের ওপর এমন জ্যোৎস্নারাত্রি কতকাল সে দেখে নি। অথচ এখানে যখন ছিল, তখন কোনোদিন খাওয়া জুটতো, কোনোদিন জুটতো না। এই মতি মুচিনী কত পাকা আম কুড়িয়ে এনে দিয়েচে, লোকের গাছের পাকা কাঁঠাল চুরি করে পর্যন্ত এনে খাইয়েচে। এই কালী গোয়ালিনী বাড়ী থেকে ভাইবৌকে লুকিয়ে নতুন ধানের চিঁড়ে এনে দিয়েচে।

অনঙ্গ-বৌ বিলের জলের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে বললে—মনে আছে কালী সেই একদিন লক্ষ্মীপূজোর রাতের কথা?

কালী মৃদু হেসে চুপ করে রইল। বামুনের মেয়েকে খাবার যোগাড় ক'রে দিয়েচে একদিন, তা কি সে এখন মুখে বলবে?

—মনে নেই?

—ও কথা ছেড়ে দাও বৌদিদি।

—তুই সেদিন চিঁড়ে না আনলে উপোস দিতে হতো।

—আবার ও কথা? ছি:—

অনঙ্গ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ওই পদ্মবিলের ওখানটাতে একটা শোল মাছ ধরেছিলাম মনে আছে মতি?

মতি বললে—গামছা দিয়ে। ওমা, সেদিনের কথা যে! খুব মনে আছে। তুমি আর আমি নাইতি গিয়েছিলাম—

—মস্ত বড় মাছটা ছিল। না রে?

—ভাল কথা মনে হলো। কাল মনে করে দিয়ো দিকিনি। দেওর মাছ ধরবে কাল, একটা বাণ মাছ কাল খাওয়াবো বামুনদিদিকে! বড্ড সোয়াদ বিলির মাছের—

—সে যেন তুই আমায় নতুন শেখাচ্চিস মতি?

কালী বলে উঠলো—ওই শোনো মতির কথা! মুচি তা আর কত বুদ্ধি হবে? বৌদিদি যেন আর এ গাঁয়ের মানুষ না? দুদিনের জন্যে চলে গিয়েচে তাই কি? আবার ফিরে আসবে। আসবে না বৌদি?

—কেন আসবো না? আমার সাধ ছিল পদ্মবিলের একেবারে ধারে একখানা ঘর বাঁধবো।

—তোমার এ ঘরও তো বিলের ধারে বৌদি? কত দূর আর? ওই তো কাছেই।

—তা না রে, বিলের একবারে ধারে ওই যে বাঁশঝাড়টা ওরই পাশে ঘর বাঁধবার ইচ্ছে ছিল। বেশ ভালো হতো না?

—এখন বাঁধো। আমি বাঁশ, খড় সব জুটিয়ে দেবো বাবাকে বলে।

অনঙ্গ-বৌয়ের ঘুম এল না অনেক রাত পর্যন্ত।

সে ভাবছিল তার জীবনের গত দিনগুলির কথা। ছুতোরখালি গ্রামে তার বাপের বাড়ী। বাবা ছিলেন সামান্য অবস্থার গৃহস্থ, জমিজমার সামান্য আয়ে সংসার চালাতেন। হরিহরপুরে কি একটা কাজে গিয়ে গঙ্গাচরণের বাবার সঙ্গে আলাপ হয়—সেই সূত্রে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করেন গঙ্গাচরণের সঙ্গে। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পূর্বেই হঠাৎ তিনি মারা যান। মামাদের চেষ্টায় ও গঙ্গাচরণের বাবার দয়ায় হরিহরপুরেই বিবাহ হয়। একখানা মাত্র লালপাড় শাড়ী ও মায়ের হাতের সোনা-বাঁধানো শাঁখা এর বেশি কিছু জোটে নি অনঙ্গ-বৌয়ের ভাগ্যে বিয়ের সময়ে।

এদিকে বিয়ের কিছুদিন পরে গঙ্গাচরণের বাবাও মারা গেলেন। গঙ্গাচরণের জ্ঞাতিরা নানারকম শত্রুতা করতে লাগলো। হরিহরপুরে একখানা পুরোনো কোঠাবাড়ী ও একটা আমবাগান ছাড়া অন্য কিছু আয়কর সম্পত্তি ছিল না, জ্ঞাতিদের শত্রুতায় অবস্থা শেষে এমন দাঁড়ালো যে আমবাগানের একটি আমও ঘরে আসে না। কোনো আয় ছিল না সংসারের, উঠানের মানকচু তুলে কামারগাঁতির হাটে নিজে মাথায় করে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে গঙ্গাচরণকে চাল কিনে আনতে হয়েছে, তবে স্বামী-স্ত্রীর সংসার চলেচে।

একদিন খুব বর্ষার দিন। ফুটো ছাদ দিয়ে জল পড়ে ঘর ভেসে যাচ্চে, অনঙ্গ-বৌ স্বামীকে বললে—হ্যাঁ গা, বাড়ীঘর না সারালে এখানে তো আর থাকা যায় না?

গঙ্গাচরণ বললে—কি করি বৌ, বসন্ত মিস্ত্রিকে জিজ্ঞেস করি নি ভাব্‌চো। আমি বসে নেই। দুশোটি টাকার এক পয়সার কমে ও ছাদ উঠবে না।

—কোথায় পাবে দুশো টাকা। দু-টাকার সম্বল আছে তোমার? আমার পরামর্শ শোনো, এ-দেশ ছেড়ে চলো অন্য জায়গায় যাই।

—কোথায় যাই বলো দেশ ছেড়ে, কে জায়গা দেবে?

—সে কথা আমি জানি ? পুরুষমানুষ—সে তুমি বোঝো। আর জ্ঞাতি-শত্তুরের সঙ্গে বিবাদ করে এখানে টিঁকে থাকতে পারবেও না তুমি।

সেই হলো ওদের দেশত্যাগের সূত্রপাত। তারপর আশ্বিন মাসে পূজোর পরই ওরা প্রথমে এল এই ভাতছালা। এখানে প্রথম প্রথম ভালই চলেছিল, পরে একটু অসুবিধে হয়ে গেল। তার প্রধান কারণ, ভাতছালায় এরা এসেছিল স্থানীয় গোয়ালারা ধানের জমি করে দেবে আশা দিয়েছিল বলে। কিন্তু দুবছর হয়ে গেল, ধানের জমির কোনো বন্দোবস্তই আর হয়ে উঠলো না। এক বেলা খাওয়া হয় ওদের তো অন্য বেলা হয় না। সেই সময় এই কালী গোয়ালিনী যথেষ্ট সাহায্য করেছিল ওদের। বিরক্ত হয়ে ওরা এখান থেকে উঠে যায় বাসুদেবপুরে। সেখানে অন্য সুবিধে মন্দ ছিল না, কিন্তু ম্যালেরিয়াতে অনঙ্গ-বৌ মরে যাওয়ার যোগাড় হলো। তখন নতুন গাঁয়ের কাপালীদের সঙ্গে বাসুদেবপুরের হাটেই আলাপ হয় গঙ্গাচরণের, কাপালীরা পাঠশালার মাস্টার চাইচে শুনে গঙ্গাচরণ যেতে রাজী হয়। ওরাও খুব আগ্রহ করে নিয়ে যেতে চায়। সেই থেকেই নতুন গাঁয়ে বাস।

অনঙ্গ বলে—কালী ঘুমূলে নাকি ? বাবাঃ কি ঘুম তোদের ?

মতি ঘুম জড়িত স্বরে বলে—বামুন-দিদি, ঘুমোও নি এখনো ? রাত যে পুইয়ে এল ! ঘুমিয়ে পড়ুন। পূবে ফর্সা হলো—

তোর মুণ্ড হলো পোড়ারমুখী—

অনঙ্গ-বৌ ভাবছিল তার জীবনে কত জায়গায় যাওয়া হলো, কত কি দেখা হলো ! তার বয়সী ক'টা মেয়ে এমন নানা জায়গায় বেড়িয়েচে ? ওই তো তারই সমবয়সী হৈম রয়েচে হরিহরপুরে, তার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে ! কোথাও যায় নি, কোনো দেশ দেখে নি।

সে ভাবলে—ভালো কাপড় পরতে পারি নে, খেতে পাই নি তাই কি ? আমার মত এত জায়গা বেড়িয়েচে হৈম ? কত জায়গা। ধর হরিহরপুর, সেখান থেকে ভাতছালা, ভাতছালা থেকে বাসুদেবপুর—তার পর এখন নতুনগাঁ। উঃ—কথাটা কালীকে বলবার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। ডাক দিলে—ও কালী কালী, একটা কথা শোন্ না ?

মতি ঘুমজড়িত স্বরে বললে—বামুন-দিদি, তুমি জ্বালালে দেখচি, ঘুমুতি দেবা না রাত্তিরে ? কালী ঘুমিয়ে গিয়েচে অনেকক্ষণ, ওকে আর ডাকাডাকি কোরো না। রাত পুইয়ে গেল যে।

অনঙ্গ-বৌ হেসে তার গায়ে একটা কাটি ছুঁড়ে মেরে বললে—দূর পোড়ারমুখী—

যে দুদিন অনঙ্গ এখানে রইল, এমন নিছক আনন্দের দুটি দিন ওর জীবনে কতকাল আসে নি। চলে আসবার দিন মতি মুচিনী কেঁদে আকুল হলো। সে এ গাঁয়ে আর থাকতে চায় না, অনঙ্গ-বৌয়ের সঙ্গে চলে যাবে। কালী গোয়ালিনী আধ সের ভাল গাওয়া ঘি ও দুটো বড় মানকচু নিয়ে এসে দিলে। মতি খেজুর গুড়ের পাটালি নিয়ে এল খেজুর গাছের বাকলায় বেঁধে।

গঙ্গাচরণ জিনিসপত্র দেখে বললে—বাঃ, অনেক সওদা করে এনেছ দেখচি—

অনঙ্গ হাসি হাসি মুখে বললে—দাম দিতে হবে আমাকে কিন্তু।

—ভাল কথাই তো। কেমন দেখলে?

—অতি চমৎকার। আমার যে কি ভালো লেগেচে। মতি এল, কালী এল, গাঁয়ের কত ঝি বৌ দেখতে এল—

—ওরা এখনো ভোলে নি আমাদের?

—ভুলে যাবে? সবাই বলে এখানে এসে আবার বাস করুন বামুন-দিদি। হ্যাঁ গা, পদ্মবিলের ধারে একখানা ঘর বাঁধো না কেন? আমার বড্ড সাধ কিন্তু।

—আবার ভাতছালা ফিরে যাবে? সে হয় না। পাঠশালা জমে উঠেচে। এখন কি নড়া যায়, গেলেই লোকসান।

—তুমি যা ভালো বোঝো। আমার কিন্তু বাপু ওখানে একখানা ঘর বাঁধবার বড্ড ইচ্ছে।

গঙ্গাচরণ সেদিন পাঠশালা জমিয়ে বসেচে, সামনের পথ দিয়ে একজন পথ-চলতি লোক যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পাঠশালার মধ্যে ঢুকে বললে—এটা পাঠশালা?

—হ্যাঁ।

মশাই দেখচি ব্রাহ্মণ, একটু তামাক খাওয়াতে পারেন? আমিও ব্রাহ্মণ। নমস্কার।

—বসুন বসুন, নমস্কার—ওরে—

আগন্তুক লোকটির পায়ে পুরোনো ও তালি দেওয়া কেম্বিসের জুতো, গায়ে মলিন পিরান, হাতে একগাছি তৈলপক্ক সরু বাঁশের ছড়ি। পায়ে জুতো থাকা সত্ত্বেও সাদা ধূলো হাঁটু পর্যন্ত উঠেছে। লোকটি একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপর ক্লান্তভাবে বসে পড়লো।

গঙ্গাচরণ বললে—মশায়ের নাম?

—আজ্ঞে দুর্গা বাঁড়ুয্যে। নিবাস, কুমুরে নাগরখালি, আড়ংঘাটার সন্নিকট। আমিও আপনার মত ইস্কুল মাস্টার।—অম্বিকপুর চেনেন? এখান থেকে পাঁচ কোশ পথ। অম্বিকপুরে সোয়ার প্রাইমারী ইস্কুলে সেকেন্ পণ্ডিত।

বেশ, বেশ। তামাক ইচ্ছে করুন—

—আগে আমায় একটু জল খাওয়াতে পারেন?

—ডাব খাবেন? ওরে পাঁচু, যাও বাবা, হরি কাপালীর চারাগাছ থেকে আমার নাম করে দুটো ডাব চট্ করে পেড়ে নিয়ে এসো তো।

আগন্তুক লোকটি প্রশংসমান দৃষ্টিতে গঙ্গাচরণের দিকে চেয়ে বললে—বাঃ, আপনার দেখচি এখানে বেশ পসার।

গঙ্গাচরণ মৃদু হেসে চুপ করে রইল। বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের পসার-প্রতিপত্তির কথা নিজের মুখে বলে না।

ইতিমধ্যে ডাব এসে পড়লো। ডাবের জল খেয়ে দুর্গাপদ বাঁড়ুয্যে আরামে নিঃশ্বাস ফেলে হুঁকো হাতে নিয়ে সজোরে ধূমপান করতে লাগলো। আপন মনেই বললে—বেশ আছেন আপনি—বেশ আছেন—

গঙ্গাচরণ বিনীতভাবে বললে—আপনাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে এক রকম চলে যাচ্চে—

—না, না বেশ আছেন। দেখে আনন্দ হয়, আমার মতই ইস্কুল মাস্টার একজন, ভালো ভাবে থাকতে দেখলেই আনন্দ হয়।

—আপনি ওখানে কি রকম পান?

—মাইনে পাই তিন টাকা ইস্কুল থেকে। গভর্ণমেণ্টের এড্ পাই দেড় টাকা। ইউনিয়ন বোর্ডের এড্ পাই ন'-সিকে মাসে। ধরুন সর্বসাকুল্যে পৌনে সাত টাকা। তা এক রকম চলে যায়—

গঙ্গাচরণ বললে—মাসে মাসে পান তো?

দুর্গাপদ বাঁড়ুয্যে গর্বের সুরে বললে—নিশ্চয়ই, এ হলো গভর্ণমেণ্টের

কারবার। এতে কোনো গোলমাল হবার যো-টি নেই। তবে মোটে সাত টাকায় সংসার ভালো চলে না।

—মশায়ের ছেলেপিলে কি?

—একটি মাত্র মেয়ে, আর আমার পরিবার। তবে আমার বিধবা ভগ্নী আমার সংসারেই থাকে। সাত টাকায় এতগুলি লোকের—

—আর কিছু আয় নেই?

—আজ্ঞে না। আমি বিদেশী লোক, ওখানে আর কি আয় থাকবে?

—ও গ্রামে কি ব্রাহ্মণের বাস বেশি? নাকি অন্য অন্য জাতও আছে? আপনি সঙ্গে সঙ্গে দশকর্ম ধরুন না কেন? এই ধরুন লক্ষ্মীপূজো, মনসাপূজো, ষষ্ঠী পূজোটুজো—

—ও-সব চলবে না। সেখানে পুরুত আছে গ্রামে। ব্রাহ্মণের গ্রাম—

—ওখানেই আপনি ভুল করেচেন—এই! গোলমাল করবি তো একেবারে পিঠের ছাল তুলবো সব। ব্রাহ্মণের গ্রামে বসতে নেই কক্ষনো। ওতে পসার হয় না মশাই—

—কথাটা ঠিকই বলেচেন। আপনি বেশ আছেন, ডাব আনতে বললেন অমনি ডাব এসে হাজির। এমন না হলে বাসের সুখ? আমার আর কোনো আয় নেই ওই পৌনে সাত টাকা ছাড়া। তবে ধরুন কলাটা, বেগুনটা মধ্যে মধ্যে ছাত্রেরা আনে।

দুর্গাপদ বাঁড়ুয্যে কথাবার্তার ফাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবতে লাগলো। পুনরায় তামাক সেজে যখন হুঁকো তার হাতে দেওয়া হলো, তখন বললে—একটা কথা ভাবাচ—

—কি বলুন?

—দুজনে মিলে একটা আপার প্রাইমারি ইস্কুল গড়ে তুলি না কেন? আপনি কি গুরুট্রেনিং পাস?

দুর্গাপদ চিন্তাকুল ভাবে বললে—তাই ত। গুরুট্রেনিং পাস না থাকলে হেড মাস্টার হতে পারবেন না যে! বাইরে থেকে আবার কাউকে আনলে তাকে ভাগ দিতে হবে কিনা? সে নিজের কোলে সব ঝোল টেনে নেবে। তাতে সুবিধে হবে না—আমার ওখানে আর ভালো লাগচে না। সঙ্গী নেই, দুটো কথা কইবার মানুষ নেই—ব্রাহ্মণ যা আছে, সব অশিক্ষিত, চাষবাসই নিয়ে আছে।

সংসার অনিত্য, আমি মশাই আবার একটু ধর্ম্মকথা, একটু সৎ আলোচনা বড্ড পছন্দ করি।

গঙ্গাচরণ মনে মনে বললে—এই রে, খেয়েচে!—মুখে বললে—সে তো খুব ভালো কথা।

—আপনি আর আমি সমব্যবসায়ী। তাই আপনার কাছে এত কথা খুলে বললাম। কিছু মনে করবেন না যেন। আচ্ছা আজ উঠি। অনেকদূর যেতে হবে।

—আবার যখন এদিকে আসবেন, দেখা দেবেন দয়া করে।

—সে আর বলতে মশাই? একদিন আমার পরিবারকে নিয়ে এসে আপনাদের বাড়ীতে আলাপ করিয়ে দেবো। আচ্ছা আসি, নমস্কার—

গ্রামের বিশ্বাস মশায়ের নাতিটি কাকতালীয় ভাবে সুস্থ হয়ে উঠলো গঙ্গাচরণের শান্তি-স্বস্ত্যয়নের পরে। এতে গঙ্গাচরণের পসার আরও বেড়ে গেল গ্রামের লোকদের কাছে। একদিন একজন লোক এসে গঙ্গাচরণকে বললে—আমাদের গাঁয়ে একবার যেতে হচ্ছে পণ্ডিত মশায়—

—এসো, বসো। কোথায় বাড়ী?

—কামদেবপুর, এখান থেকে তিন কোশ। আপনার নাম শুনে আসচি। সবাই বললে, পণ্ডিত মশায় বড় গুণী লোক। আমাদের গাঁয়ের আশপাশে বড় ওলাউঠোর ব্যায়রাম চলচে। আপনাকে যেয়ে আমাদের গাঁ বন্ধ করতে হবে।

গঙ্গাচরণ 'গাঁ বন্ধ করা' কথাটা প্রথম শুনলো। তবুও আন্দাজ করে নিল লোকটা কি চাইচে। তাদের গ্রামে যাতে ওলাউঠার অসুখ না ঢোকে, এজন্যে মন্ত্র পড়ে গ্রামের চারিদিকে গণ্ডি টেনে দিয়ে মহামারীর আগমন বন্ধ করতে হবে, এই ব্যাপার।

কাঁচা লোকের মত গঙ্গাচরণ তখনই বলে উঠলো না, 'হ্যাঁ, এখুনি করে দেবো, তাতে আর কি ইত্যাদি।' সে গম্ভীর ভাবে তামাক টেনে যেতে লাগলো, উত্তরে 'হ্যাঁ' কি 'না' কিছুই বললে না।

লোকটি উদ্বিগ্নস্বরে বললে—ঠাকুর মশায়, হবে তো আমাদের ওপর দয়া?

গঙ্গাচরণ স্থির ভাবে বললে—তাই ভাবচি।

—কেন পণ্ডিত মশাই? এ আপনাকে হাতে নিতেই হবে—

—বড্ড শক্ত কাজ। বড্ড শক্ত—

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। পরে লোকটা পুনরায় আকুল ভাবে বললে—তবে কি হবে না?

গঙ্গাচরণ নীরব। দুমিনিট।

—পণ্ডিত মশায়?

—বাপু হে, অমন বক্ বক্ কোরো না। মাথা ধরিয়ে দিলে যে বকে। দাঁড়াও, ভাবতে দাও—

লোকটা ধমক খেয়ে চুপ করে রইল, যদিও সে বুঝতে পারলে না এতক্ষণ সে এমন কি বকছিল, যাতে পণ্ডিত মহাশয়ের মাথা ধরতে পারে। নিজে থেকে সে কোনো কথা বলতে আর সাহস করলে না। গঙ্গাচরণ নিজেই খানিকটা চিন্তার পর বললে—কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ করতে হবে, বড্ড শক্ত কথা। পয়সা খরচ করতে হবে। পারবে?

লোকটা এবার উৎসাহ পেয়ে বললে—আপনি যা বলেন পণ্ডিত মশাই। আমাদের গাঁয়ে আমরা যাট-সত্তর ঘর বাস করি। হিঁদু-মোছলমানে মিলে চাঁদা তুলে খরচ যোগাবো। প্রাণ নিয়ে কথা, আশপাশের গাঁ মরে উজোড় হয়ে যাচ্চে, যদি পয়সা খরচ কল্লি আমাদের প্রাণগুলো বাঁচে—

—নদীর জল খাও?

—আজ্ঞে হাঁ, আমাদের গাঁয়ের নিচেই বাঁওড়—বাঁওড়ের জল খাই।

—গাঁ বন্ধ করলে বাঁওড়ের জল আর খেতে পাবে না কেউ। পাতকুয়োর জল খেতে হবে।

—সে আপনি যেমন আজ্ঞে করবেন— কত খরচ হবে বলুন।

গঙ্গাচরণ মনে মনে হিসেব করবার ভঙ্গি করে কিছুক্ষণ পরে বললে—সর্বসাকুল্যে প্রায় ত্রিশ টাকা খরচ হবে—ফর্দ করে দিচ্চি নিয়ে যাও।

লোকটা যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। এত গম্ভীর ভূমিকার পরে মাত্র ত্রিশটি টাকা খরচের প্রস্তাব সে আশা করেনি। কিন্তু গঙ্গাচরণের উচ্চাশার সীমা পৌছে গিয়েচে, ভাতছালাতেও যাকে স্ত্রীপুত্রসহ অনেক সময় দিনে রাতে একবার মাত্র অন্নাহার করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েচে, সে এর বেশী চাইতে পারে কি করে?

গঙ্গাচরণ বাড়ীর মধ্যে ঢুকে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলে। সংসারের কি কি দরকার? অনঙ্গ-বৌ বেশি আদায় করতে জানে না। স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করে একটা ফর্দ খাড়া করলে, তেমন ব্যয়সাধ্য ফর্দ নয়।

অনঙ্গ-বৌ বললে—তুমি গাঁ বন্ধ করতে পারবে তো? এতগুলো লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা—

গঙ্গাচরণ হেসে বললে—আমি পাঠশালায় ছেলেদের 'স্বাস্থ্য প্রবেশিকা' বই পড়াই। তাতে লেখা আছে মহামারীর সময় কি কি করা উচিত অনুচিত। আসলে তাতেই গাঁ বন্ধ হবে। মন্ত্র পড়ে গাঁ বন্ধ করতে হবে না।

বাইরে এসে বললে—ফর্দ লিখে নাও—আলোচাল দশ সের, পাকা কলা দশ ছড়া, গাওয়া ঘি আড়াই সের, সন্দেশ আড়াই সের—কাপড় চাই তিনখানা শাড়ী, কস্তাপেড়ে, তিন ভৈরবীর, আর প্রমাণ ধুতিচাদর ভৈরবের—আরও ধরো—হোমের তাম্রকুণ্ড।

লোকটা ফর্দ নিয়ে চলে গেল।

কামদেবপুর গ্রামে যেদিন গঙ্গাচরণ যায় সেইদিনই সেখানে একজন বললে—পণ্ডিত মশাই, চাল বড্ড আক্রা হবে, কিছু চাল এ সময় কিনে রাখলে ভাল হয়।

—কত আক্রা হবে?

—তা ধরুন মণে দু টাকা চড়া আশ্চর্য নয়।

কথাটা উপস্থিত কেউই বিশ্বাস করলে না। শান্তিস্বস্ত্যয়ন এবং গাঁ বন্ধ করার প্রক্রিয়া দেখবার জন্যে আশপাশ থেকে অনেক লোক জড় হয়েছিল। গ্রামের চাষীরা বললে—মণে দু টাকা! তাহলি আর ভাবনা ছেল না। কে বলেচে এ সব কথা?

আগেকার বক্তা নিতান্ত বাজে লোক নয়—ধান চালের চালানি কাজ করেচে, এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে হয়। সে জোর গলায় বললে—তোমরা কিছু বোঝো না হে—আমার মনে হচ্চে গতিক দেখে, চালের দর ঠিক বাড়বে। আমি এ কারবার অনেকদিন ধরে করে আসচি, আমি বুঝতে পারি।

কথাটা কেউই গায়ে মাখলে না। তখন গাঁ বন্ধ করার ব্যাপার নিয়ে সকলে গঙ্গাচরণকে সাহায্য করতে ব্যস্ত। হোম শেষ ক'রে পূজো আরম্ভ করতে গঙ্গাচরণ পুরো তিনটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিলে। এসব অজ পাড়াগাঁ, এখানকার হাল-চাল ভালই জানা আছে তার। পয়সা কি অমনি অমনি রোজগার হয়? তিনটি মাটির কলসী সিঁদুর দিয়ে চিত্রিত করতে হয়েচে, তালপাতার তীর বানিয়ে চারকোণে পুঁতে পৈতের সুতো দিয়ে সেগুলো পরস্পর বাঁধতে হয়েচে,

গাবকাঠের পুতুল তৈরি করতে হয়েচে গ্রাম্য ছুতোর দিয়ে, তেল সিঁদুর লেপে সেটাকে তেমাথা রাস্তায় পুঁততে হয়েচে—হাঙ্গামা কি কম? সে যত বিদঘুটে ফরমাশ করে, গ্রামের লোকের তত শ্রদ্ধা বেড়ে যায় তার ওপরে।

ওর কানে গেল লোকে বলাবলি করচে—বলি, একি তুই যা তা পেলি রে? ওঁর পেটে এলেম কত? যাকে বলে পণ্ডিত! একি তুই বাগান গাঁর দীনু ভটচায পেয়েচিস?

গঙ্গাচরণ হেঁকে বললে—নিষ্কালি সরা দু'খানা আর শ্বেত আকন্দের ডাল দুটো—

ঠিক দুপুর বেলা, এখন এ সব জিনিস কোথা থেকে যোগাড় হয়, আর কেই বা আনে! সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

একজন বিনীত ভাবে বললে—আজ্ঞে, এ গাঁয়ে তো কুমোর নেই, নিষ্কালী সরা এখন কোথায় পাই?

গঙ্গাচরণ রাগের সুরে বললে—তবে থাকলো পড়ে, ফাঁকি-জুকির কাজ আমায় দিয়ে হবে না। গাঁ বন্ধ করতে নিষ্কালি সরা লাগে এ কথা কে না জানে? আগে থেকে যোগাড় ক'রে রেখে দিতে পারো নি?

গ্রামের লোকে নিজেদের অজ্ঞতায় নিজেরাই লজ্জিত হয়ে উঠলো। বলাবলি করলে—এ খাঁটি লোক বাবা। এর কাছে কোন কাজের ফাঁকি নেই। যেভাবে হোক সরা এনে দিতেই হবে।

নানা অপরিচিত অনুষ্ঠানের মধ্যে নিয়ে বেলা দু'টোর সময়ে প্রক্রিয়া শেষ হ'লো।

গঙ্গাচরণ বললে—সবাই এসে শান্তিজল নিয়ে যাও—

খুব ঘটা ক'রে শান্তিজল ছিটিয়ে দিয়ে গঙ্গাচরণ গম্ভীর মুখে বললে—এবার আসল কাজটি বাকি—

উপস্থিত সকলে এ ওর মুখের দিকে চায়। সকাল থেকে ফাইফরমাশের চোটে প্রত্যেকে হিম্‌সিম্ খেয়ে গিয়েচে, শান্তিজল পর্যন্ত ছিটানো হয়ে গেল, তবুও এখনও আসল কাজটি হোলো না। বেলা তিনটে বাজে এদিকে।

গ্রামের মাতব্বর লোক এক-আধজন এগিয়ে বললে—আজ্ঞে, কি কাজের কথা বলচেন পণ্ডিত মশাই?

—ঈশান কোণে নিমগাছ আছে এ গাঁয়ে?

—আজ্ঞে কোথায় বললেন?

—ঈশান কোণে।

তারা মাথা চুলকে বললে—আজ্ঞে—সে কোথায়?

—ঈশান কোণ জানো না? উত্তর-পশ্চিম কোণ—এই দিক—

আঙুল দিয়ে গঙ্গাচরণ ঈশান কোণ দেখিয়ে দেয়। গ্রামে ঢুকবার পথই সেদিক দিয়ে, আসবার সময় সেদিকে একটা বড় নিমগাছ সে লক্ষ্য করে এসেচে আজই সকাল বেলা।

একজন বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে বটে একটা।

—আছে? থাকতেই হবে। ঈশানে যোগিনী যে—

—আজ্ঞে, কি করতে হবে?

—ওখানে ধ্বজা বাঁধতে হবে। চলো আমার সঙ্গে—

দু'জন জোয়ান ছোকরা গঙ্গাচরণের আদেশে নিমগাছের মগডালে ধ্বজা বাঁধতে উঠলো। বেলা চারটে বাজে।

গঙ্গাচরণ হাঁপ ফেলে নিশ্চিন্ত হবার ভঙ্গিতে বললে—যাক্, এবার ব্যাপার মিটে গেল। বাবাঃ, পয়সা খরচ করে ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করলে তোমরা, এর মধ্যে খুঁত থাকতে দেবো কেন? এবার তোমরাও নিশ্চিন্দি। গাঁ বন্ধ বললেই গাঁ বন্ধ হয়! খাটুনি আছে।

সকলে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠলো। এমন না হোলে পণ্ডিত?

গ্রামের সবাই মিলে অনুরোধ ক'রে এক গোয়ালা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে গঙ্গাচরণের জলযোগের ব্যবস্থা করলে। গঙ্গাচরণ বললে—ডাবের জল ছাড়া আমি অন্য জল খাবো না। তোমরাও নদীর জল ব্যবহার বন্ধ কর একেবারে। এক মাস কাল নদীর জল কেউ খেতে পাবে না। বাসি বা পচা জিনিস খাবে না। মাছি বসলে সে খাবার তখুনি ফেলে দেবে। মনে থাকবে? সবাইকে বলে দাও—

মাতব্বর লোকেরা সকলকে কথাটা বলে বুঝিয়ে দিলে।

সন্ধ্যার আগে গরুর গাড়ী করে ফিরচে, পথে গ্রাম্য পুরোহিত দীনু ভট্চায এসে বললে—নমস্কার, চললেন—

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমার একটা কথা আছে, গাড়ী থেকে নেমে একটু শুনুন—

গঙ্গাচরণ গাড়ী থেকে নেমে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে দীনু ভট্চাযের সঙ্গে কথা বললে। দীনু ওর হাত দু'টি ধরে বললে—আমার একটা অনুরোধ—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—বলুন—

—আমায় কিছু দিয়ে যান আজ যা পেলেন—

—কেন ?

—আমি না খেয়ে মরচি। ঘরে এক দানা চাল নেই। চালের দাম হু হু করে বাড়চে। ছিল সাড়ে চার, হলো ছ'টাকা। পাঁচ ছ'টি পুষ্যি নিয়ে এখন চালাই কি ক'রে বলুন ? আমি নিজে এই বুড়ো বয়সে রোজকার না করলে সংসার চলে না। অথচ বুড়ো হয়ে পড়েচি বলে এখন আর কেউ ডাকেও না, চোকি আর তেমন ভালো দেখি নে।

গঙ্গাচরণ চুপ করে থেকে বললে—তাই তো—বড় মুশকিল দেখ্‌চি। আপনার বয়েস কত ?

—উনসত্তর যাচ্চে। মেয়েরা বড়, ছেলে বড় হোলে ভালো ছিল। এ বুড়ো বয়সে রোজকার করবার কেউ নেই আমি ছাড়া।

—চালের দাম কত চড়েচে ?

—আরও নাকি চড়বে শুনচি। এখনই খেতে পাচ্চি নে—আরও বাড়লে কি কিনে খেতে পারবো ! এই যুদ্ধুর দরুণ নাকি অমনটা হচ্চে—

গঙ্গাচরণ মাঝে মিশালে শোনে বটে যুদ্ধের কথা। মাঝে মাঝে দু-একখানা এরোপ্লেন মাথার ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে দেখেচে। তবে এ অজ চাষাগাঁয়ে কেউ খবরের কাগজ নেয় না, শহরও সাত-আট মাইল দূরে। গঙ্গাচরণ নিজের ধান্দায় ব্যস্ত থাকে, ওসব চর্চা করবার সময়ও তার নেই। তবুও কথাটা তাকে ভাবিয়ে তুললে। সে বুড়ো ভট্চাযকে বললে—যা চাল পেয়েছি, তা থেকে কিছু আপনি নিয়ে যান—আর কিছু ডাল আর গাওয়া ঘি—

দীনু ভট্চায বললে—না, গাওয়া ঘি আমার দরকার নেই। বলে, ভাত জোটে না, গাওয়া ঘি! আচ্ছা, আমি এই কাপড়ের মুড়োতেই চাল, ডাল বেঁধে নিই। আপনি আমায় বাঁচালেন। ভগবান আপনার ভালো করুন।

কথাটা ভাবতে ভাবতে গঙ্গাচরণ বাড়ী এসে পৌছুল। অনঙ্গ-বৌ জিনিসপত্র দেখে খুব খুশি হলো। বললে—চাল এত কম কেন ?

—এক বুড়ো বামুন ভট্চাযিকে কিছু দিয়ে এসেচি পথে।

—যাক গে, ভালই করেচ। দিলে তাতে কমে না, বরং বেড়ে যায়।

—শুনচি নাকি চালের দাম বাড়বে, সবাই বলচে।

—ছ'টাকা থেকে আরও বাড়বে ! বল কি গো ?

—সবাই তো বলচে। যুদ্ধুর দরুণ নাকি এমন হচ্চে—

—কার সঙ্গে যুদ্ধু বেধেচে গো ?

—সে সব তুমি বুঝতে পারবে না। আমাদের রাজার সঙ্গে জার্মানি আর জাপানের—সব জিনিস নাকি আক্রা হয়ে উঠবে।

—হোক গে, আমাদের তো অর্ধেক জিনিস কিনে খেতে হয় না। তবে চালটা যদি বেড়ে যায়—

—সেই কথাই তো ভাবচি—

সেদিন বিকেলে বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী বসে এই সব কথার আলোচনা হচ্ছিল। বিশ্বাস মশায় বললেন—আমাদের ভাবনা কি ? ঘরে আমার দু'গোলা ধান বোঝাই। দেখা যাবে এর পরে।

বৃদ্ধ নবদ্বীপ ঘোষাল বললে—এ সব হ্যাংনামা কতদিনে মিটবে ঠাকুর মশাই ? শুনচি নাকি কি একটা পুর জারমান নিয়ে নিয়েচে ?

বিশ্বাস মশায় বললে—সিঙ্গাপুর—

নবদ্বীপ বললে—সে কোন্ জেলা ? আমাদের এই যশোর, না খুলনে ? মামুদপুরের কাছে ?

বিশ্বাস মশায় হেসে বললেন—যশোরও না, খুলনেও না। সে হলো সমুদ্রের ধারে। বোধ হয় পুরীর কাছে, মেদিনীপুর জেলা। তাই না পণ্ডিত মশাই ?

গঙ্গাচরণ ভালো জানে না, কিন্তু এদের সামনে অজ্ঞতাটা দেখানো যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং সে বললে—হঁ্যা। একটু দূরে—পশ্চিম দিকে। ঠিক কাছে নয়।

নবদ্বীপ বললে—পুরীর কাছে ? আমার মা একবার পুরী গিয়েছিলেন। পুরী, সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর। সে বুঝি মেদিনীপুর জেলা ?

বিশ্বাস মশায় বললেন—হঁ্যা।

ভৌগোলিক আলোচনা শেষ হলে যে যার বাড়ীর দিকে চলে গেল।

গঙ্গাচরণ পাঠশালায় বসে পরদিন ছেলেদের জিজ্ঞেস করলে—এই সিঙ্গাপুর কোথায় জানিস ?

কেউ বলতে পারলে না, কেউ নামই শোনে নি।

গঙ্গাচরণ নিজের ছেলের দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে বললে—হাবু, সিঙ্গাপুর কোথায়?

হাবু দাঁড়িয়ে উঠে সগর্বে বললে—পুরীর কাছে, মেদিনীপুর জেলায়।

পাঠশালার অন্যান্য ছেলেরা ঈর্ষামিশ্রিত প্রশংসার দৃষ্টিতে হাবুর দিকে চেয়ে রইল।

বৈশাখের মাঝামাঝি থেকে কতকগুলি আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলে গঙ্গাচরণ বাজারের জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে। প্রত্যেক জিনিসের দাম ক্রমশঃ চ'ড়ে যাচ্চে। কিন্তু তা যাক গে, সেদিন হাটে একটা ঘটনা দেখে শুধু গঙ্গাচরণ নয়, হাটের সব লোকই অবাক হয়ে গেল।

ঘটনাটা অতি সামান্য। ইয়াসিন বিশ্বাসের বড় গোলদারি দোকান। তাতে কেরোসিন তেল আনতে গিয়ে অনেকে শুধু হাতে ফিরে গেল। তেল নাকি নেই।

গঙ্গাচরণের বিশ্বাস হলো না কথাটা। সে নিজেও তেল নেবে। তেলের বোতল হাতে দোকানে গিয়ে দাঁড়াতেই ইয়াসিনের দাদা ইয়াকুব বললে—তেল নেই পণ্ডিত মশাই—

—নেই?

—আজ্ঞে না।

—তেল আনো নি?

—আজ্ঞে পাওয়া যাচ্চে না।

—সে কি কথা? ক্রাসিন পাওয়া যাচ্চে না?

—আমাদের চালান আসে নি এবার একদম। শুনলাম নাকি মহকুমা হাকিমের কাছে দরখাস্ত করতে হবে চালান পাঠাবার আগে।

—কবে আসতে পারে?

—আজ্ঞে কিছু ঠিক নেই—

গঙ্গাচরণ বোতল হাতে বেরিয়ে আসচে, ইয়াকুব স্বর নিচু করে বললে—বাবু, এই বেলা কিছু নুন আর কিছু চাল কিনে রাখুন—ও দু'টো জিনিস যদি ঘরে থাকে, তাহা হলেও কষ্টস্রেষ্ট করে আধপেটা খেয়েও চলবে!

—কেন, ও দুটো জিনিসও কি পাওয়া যাবে না নাকি?

—পণ্ডিত মশাই, সাবধানের মার নেই, আমরা হোলাম ব্যবসাদার মানুষ, সব দিকে নজর রেখে চলতি হয় কিনা? কে জানে কি হয় মশাই!

গঙ্গাচরণ ভাবতে ভাবতে বাড়ী চলে এসে স্ত্রীকে বললে—আজ একটি আশ্চর্যি কাণ্ড দেখলাম—

—কি গা ?

—পয়সা হোলেও জিনিস মেলে না এই প্রথম দেখলাম। কোনো দোকানেই নেই—আরও একটি কথা বললে দোকানদার। চালও কিনে রাখতে হবে নাকি।

অনঙ্গ-বৌ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—দূর ? রেখে দাও ওদের সব গাঁজাখুরি কথা। চাল পাওয়া যাবে না, নুন পাওয়া যাবে না, তবে দুনিয়া পৃথিমে লোকে বাঁচতে পারে ককৃখনো ? কি খাবে এখন ?

—যা দেবে ?

অনঙ্গ টাটকা-ভাজা মুড়ি গাওয়া ঘিতে মেখে নিয়ে এসে দিলে—তার সঙ্গে শসা কুচোনো। বললে—একটু চিনি দেবো, ওর সঙ্গে মেখে খাবে ?

—নাঃ, চিনি আমার ভালো লাগে না। হাবু কোথায় ?

—বাড়ী নেই। বিশ্বেস মশায়ের নাতির সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়েচে কিনা ? ডেকে নিয়ে গেল এসে। বড় মানুষের নাতির সঙ্গে ভাব থাকা ভালো। সময়ে অসময়ে দু'টো জিনিস চাইলেও পাওয়া যাবে। সেজন্যে আমিও যেতে বারণ করি নি।

—এসো দু'টো মুড়ি খাও আমার সঙ্গে।

অনঙ্গ-বৌ সলজ্জ হেসে বললে—আহা রস যে উথলে উঠ্‌চে। আজ বাদে কাল যে ছেলের বৌ ঘরে আনতে হবে খেয়াল আছে ?

বলেই এসে স্বামীর পাশে বসে বাটি থেকে এক মুঠো ঘি-মাখা মুড়ি তুলে নিয়ে মুখে ফেলে দিল। স্বামীর দিকে বিলোল কটাক্ষে চেয়ে বললে—মনে পড়ে, সেই ভাতছালায় বিলের ধারে একদিন তুমি আর আমি একবাটি থেকে চিঁড়ের ফলার খেয়েছিলাম ? হাবু তখন ছোট।

অনঙ্গ-বৌয়ের হাসি ও চোখের বিলোল দৃষ্টি প্রমাণ করিয়ে দিলে সে বিগতযৌবনা নয়, পুরুষের মন এখনও হরণ করার শক্তি সে হারায় নি।

গঙ্গাচরণ স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইল মুগ্ধ দৃষ্টিতে।

ফাল্গুন মাসের শেষে গঙ্গাচরণ একদিন পাঠশালার ছুটি দিয়ে চলে আসছে, কামদেবপুরের দুর্গা পণ্ডিত পথে ওকে ধরে বললে—ভালো আছেন ? সেদিন গিয়েছিলেন, কামদেবপুর, আমি ছিলাম না, নমস্কার।

—নমস্কার। ভালো আছেন?

—একরকম চলে যাচ্ছে। আপনার সঙ্গেই দেখা করতে আসা।

—কেন বলুন?

—আমার তো আর ওখানে চলে না। পৌনে সাত টাকা মাইনেতে একেবারে অচল হলো। চালের মণ হয়েচে দশ টাকা।

গঙ্গাচরণের বুকটার মধ্যে ধ্বক্ করে উঠলো। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দুর্গা পণ্ডিতের দিকে চেয়ে সে বললে—কোথায় শুনলেন?

—আপনি জেনে আসুন রাধিকাপুরের বাজারে।

—সেদিন ছিল চার টাকা, হলো ছ'টাকা, এখন দশ টাকা।

—মিথ্যে কথা বলি নি। খোঁজ নিয়ে দেখুন।

—মণে চার টাকা চড়ে গেল! বলেন কি?

—তার চেয়েও একটি কথা যা শোনলাম, তা আরও ভয়ানক। চাল নাকি এইবার না কিনলে এরপরে বাজারে আর মিলবে না। শুনে তো পেটের মধ্যি হাত পা ঢুকে গেল মশাই।

গঙ্গাচরণের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা পণ্ডিত ওর বাড়ী পর্যন্ত এল। গঙ্গাচরণের বাইরের ঘর নেই, উঠোনের ঘাসের ওপরে মাদুর পেতে দুর্গা পণ্ডিতের বসবার জায়গা করে দিলে। তামাক সেজে হাতে দিলে। বললে—ডাব কেটে দেবো? খাবেন?

—হ্যাঁ, সে তো আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে। বেশ আছেন।

—আর কিছু খাবেন?

—না না, থাক। বসুন আপনি।

একথা ওকথা হয়, দুর্গা পণ্ডিত কিন্তু ওঠবার নাম করে না।

গঙ্গাচরণ ভাবলে, কামদেবপুর এতটা পথ—যাবে কি করে? সন্দে তো হয়ে গেল।

আরও বেশ কিছুক্ষণ কাটলো। গঙ্গাচরণ কিছু বুঝতে পারচে না।

এখনও যায় না কেন? শীতের বেলা, কোন্ কালে সূর্য অস্তে গিয়েচে।

হঠাৎ দুর্গা পণ্ডিত বললে—হ্যাঁ, ভালো কথা—এবেলা আমি দু'টো খাবো কিন্তু এখানে।

—খাবেন? তাহোলে বাড়ীর মধ্যে বলে আসি।

অনঙ্গ-বৌ রান্নাঘরে চাল ভাজছিল, স্বামীকে দেখে বললে—ওগো, তোমার

সেই পণ্ডিত মশায়ের জন্যে দুটো চাল ভাজচি যে। তেল নুন মেখে তোমরা দু'জনেই খাওগে—

—শোনো, পণ্ডিত মশাই রাত্তিরে এখানে খাবেন।

—তুমি বললে বুঝি?

—না, উনিই বলচেন। আমি কিছু বলি নি।

—অন্য কিছু নয়, কি দিয়ে ভাত দিই পাতে? একটু দুধ যা ছিল, ওবেলা তুমি আর হাবু খেয়েচ।

দুর্গা পণ্ডিতের কথাবার্তা শুনে গঙ্গাচরণের মনে হলো সে খুব ভয় পেয়েচে। এমন একটা অবস্থা আসবে সে কখনো কল্পনাও করতে পারে নি। ওর ভয়ের ছোঁয়াচ এসে গঙ্গাচরণের মনেও পৌঁছায়। বাইরে ঘোড়ানিম গাছটার তলায় অন্ধকার রাত্রে বসবার জন্যে হাবু একটা বাঁশের মাচা করেছিল। দুই পণ্ডিতে সেই মাচার ওপর একটি মাদুর বিছিয়ে দিব্যি ফুরফুরে ফাগুনে হাওয়ায় বসে তামাক ধরিয়ে কথাবার্তা বলছিল। হাবু এসে বললে—বাবা, নিয়ে এসো ওঁকে, খাওয়ার জায়গা হয়েচে—

মুগের ডাল, আলুভাতে, পেঁপের ডালনা ও বড়াভাজা। অনঙ্গবৌ রাঁধতে পারে খুব ভালো। দুর্গা পণ্ডিতের মনে হলো এমন সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন অনেক দিন খায় নি। হাবু বললে—মা জিজ্ঞেস করচে আপনাকে কি আর দু'খানা বড়াভাজা দেবে?

গঙ্গাচরণও ওই সঙ্গে খেতে বসেচে। বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ নিয়ে আয় না? জিজ্ঞেস করাকরি কি?

অনঙ্গ-বৌ আড়ালে থেকে হাবুর হাতে পাঠিয়ে দিলে একটা রেকাবিতে কিছু পেঁপের ডালনা, ক'খানা বড়াভাজা।

গঙ্গাচরণ বললে—ওগো, তুমি ওর সামনে বেরোও, উনি তোমার ধনপতি কাকার বয়েসী। আপনার বয়েস আমার চেয়ে বেশি হবে, কি বলেন?

দুর্গা পণ্ডিত বললে—অনেক বেশি। বৌমাকে আসতে বলুন না? একটা কাঁচা ঝাল নিয়ে আসুন।

একটু পরে অনঙ্গ-বৌ লজ্জা-কুণ্ঠিত জড়িত সুঠাম সুগৌর কাঁচের চুড়ি-পরা হাতে গোটা দুই কাঁচা লঙ্কা এনে দুর্গা পণ্ডিতের পাতে ফেলে দিতেই দুর্গা পণ্ডিত ওর দিকে মুখ তুলে চেয়ে বললে—মা যে আমার লক্ষ্মী পিরতিমে।

আমার এক ভাইঝির বয়েসী বটে। কোনো লজ্জা নেই আমার সামনে বৌমা—একটু সর্ষের তেল আছে? দাও তো মা—

হাবু বললে—মা বলচে, দুধ নেই। একটু তেঁতুল গুড় মেখে ভাত ক'টা খাবেন?

—হাঁ হাঁ, খুব। দুধ কোথায় পাবো? বাড়ীতেই কি রোজ দুধ খাই নাকি?

দুর্গা পণ্ডিত এই বয়সেও কিন্তু বেশ খেতে পারে। মোটা আউশ চালের রাঙা রাঙা ভাত শুধু তেঁতুল গুড় মেখেই যা খেলে, গঙ্গাচরণের তা দু'বেলার আহার। অনঙ্গ-বৌ কিন্তু খুব খুশি হলো দুর্গা পণ্ডিতের খাওয়া দেখে। যে মানুষ খেতে পারে তাকে নাকি খাইয়ে সুখ। নিজের জন্যে রাখা বড়াভাজাগুলো সে সব দিয়ে দিলে অতিথির পাতে।

গঙ্গাচরণ মনে মনে ভাবলে পৌনে সাত টাকায় বেচারী নিশ্চয়ই আধ পেটা খেয়ে থাকে—

রাত দশটার বেশী নয়। একটু ঠাণ্ডা রাতটা। আবার এসে দু'জনে বসলো নিমগাছের তলায় বাঁশের মাচায়। হাবু তামাক সেজে এনে দিলে।

দুর্গা পণ্ডিত বললে—এখন কি করি আমায় একটা পরামর্শ দাও তো ভায়া। যে রকম শুনচি।

গঙ্গাচরণ চিন্তিত স্বরে বললে—তাই তো! আমারও তো কেমন কেমন মনে হচ্চে। কেরাসিন তেল বাজারে আর পাওয়া যাচ্ছে না, আবার কাল থেকে শুনচি দেশলাইও নাকি নেই।

—সে মরুক গে, যাক কেরাসিন তেল। অন্ধকারে থাকবো। কিন্তু খাবো কি? চাল নাকি মোটেই মিলবে না। দামও চড়বে।

—দাম আরও চড়বে? দশ টাকা হয়েচে আরও?

—একজন ভালো লোক বলছিল সেদিন। এই বেলা কিছু কিনে রাখতি পারলে ভালো হতো, কিন্তু পৌনে সাত টাকা মাইনেতে রোজকার চাল কেনাই কঠিন হয়ে পড়েচে, আমাদের স্কুলের সেক্রেটারি হোল ও গাঁয়ের রতিকান্ত ঘোষ। গোলাপালা আছে বাড়ীতে। ধানচাল মজুদ আছে। সেদিন বললাম আমায় একমণ চাল দিন, মাইনে থেকে কেটে নেবেন। তা আধমণ দিতে রাজি হয়েচে।

—আপনার কত চাল লাগে রোজ?

—তা সকাল বেলা উঠলি একপালি করে চালির খরচ। খেতে দু'বেলায় আট-ন'টি প্রাণী। কি করে চালাই বলো তো ভায়া? ও আধমণ চালে আমার ক'দিন?

গঙ্গাচরণ মনে মনে বললে—তার ওপর খাওয়ার যা বহর। অমন যদি সকলের হয় বাড়ীতে, তবে রতিকান্ত ঘোষের বাবাও চাল যুগিয়ে পারবে না—

দুর্গা পণ্ডিত কিছুতেই ঘুমুতে যায় না। মাঝে পড়ে গঙ্গাচরণেরও ঘুম হয় না। অতিথিকে ফেলে রেখে সে একা শুতে যায় কি করে? তার নিজেরও যে ভয় একেবারে না হয়েচে তা নয়।

দুর্গা পণ্ডিত বললে—একটা বিহিত পরামর্শ দাও তো ভায়া। ওখানে একা একা থাকি, যত সব অজ্ঞ মুখ্যুদের মধ্যিখানে। আমরা কি পারি? আমরা চাই একটু সৎসঙ্গ, বিদ্যে পেটে আছে এমন লোকের সঙ্গ। নয়তো প্রাণ যে হাঁপিয়ে ওঠে। না কি বল?

—ঠিক ঠিক।

—তাই ভাবলাম যদি পরামর্শ করতে হয় তবে ভায়ার ওখানে যাই। বাজে লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে কি হবে? তুমি যা বুদ্ধি দিতে পারবে, চাষাভূষো লোকের কাছ থেকে সে পরামর্শ পাবো না। যুদ্ধের খবর কি?

—জাপানীরা সিঙ্গাপুর নিয়ে নিয়েচে।

—শুধু সিঙ্গাপুর কেন? ব্রহ্মদেশও নিয়ে নিয়েচে। জানো না সে খবর?

—না—ইয়ে—শুনি নি তো? ব্রহ্মদেশ? সে তো—

—যেখান থেকে রেঙ্গুন চাল আসে রে ভায়া। ওই যে সস্তা মোটা মোটা আলো চাল। সিদ্ধও আছে, তবে আমি আতপ চালটাই খাই।

এ আবার এক নতুন খবর বটে। কাল বিশ্বাস মশায়ের চণ্ডীমণ্ডপে বসে গল্প করবার একটা জিনিস পাওয়া গেল বটে। উঃ, এ খবরটা সে এত দিন জানে না? কেউ তো বলেও নি। জানেই বা কে এ অজ্ঞ চাষা-গাঁয়ে? তবে গঙ্গাচরণের কাছে সবটাই ধোঁয়া ধোঁয়া। রেঙ্গুন বা ব্রহ্মদেশ যে ঠিক কোন্ দিকে তা সে জানে না। পুব বা দক্ষিণ দিকে কোন্ জায়গায়? অনেক দূর।

পর দিন দুপুর বেলাতেও দুর্গা পণ্ডিত এখানেই আহার করলে। অনঙ্গ-বৌ তার জন্য দু'তিন রকমের তরকারি রান্না করলে। খেতে ভালোবাসে, ব্রাহ্মণ অতিথি। তাদের চেয়ে অনেক গরীব।

অনঙ্গ-বৌ হাবুকে সকালে উঠেই বলেচে—একটা মোচা নিয়ে আর তো তোর সয়াদের বাগান থেকে।

স্ত্রীকে মোচা কুটতে দেখে গঙ্গাচরণ বললে—আজ যে অতিথি সৎকারের খুব বহর দেখচি—

—ভারি তো। একটু মোচার ঘণ্ট রাঁধবো, আর একটু সুক্তুনি—

—বেশ বেশ। অতিথিদের দোহাই দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ গা, পণ্ডিত মশাই বড় গরীব, না? দেখে বড় কষ্ট হয়! কি রকম কাপড় পরে এয়েচে, পায়ে জুতো নেই।

—তা অবস্থা ভালো হলে কি সাত টাকা মাইনেতে পড়ে থাকে পাঠশালায়। আজ ওকে একটু ভালো করে খাওয়াও।

—একটু দুধ যোগাড় করে দেবে?

—দেখি যদি নিবারণ ঘোষের বাড়ীতে মেলে। ওটা কাঁচকলার মোচা নয় তো', তা'হলে কিন্তু এত তেতো হবে যে মুখে দেওয়া যাবে না তরকারি।

—না গো, এ কাঁটালি কলার মোচা। আমাকে তুমি আমার কাজ শেখাতে এসো না বলচি।

দুপুর বেলা দুর্গা পণ্ডিত খেতে এসে সপ্রশংস বিস্ময়ের দৃষ্টিতে পাতের দিকে চেয়ে বললে—এ যে রীতিমত ভোজের আয়োজন করেচেন দেখচি? আহা, বৌমা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! এত সব রেঁধেচেন বসে বসে? ওমা, কোথায় গেলে গো মা?

অনঙ্গ-বৌ ঘরে ঢুকে সকুন্ঠিত সলজ্জভাবে মুখ নিচু করে রইল।

দুর্গা পণ্ডিত ভালো করে মোচার ঘণ্ট দিয়ে অনেকগুলো ভাত মেখে গোগ্রাসে খেতে খেতে বললে—সত্যি, এমন তৃপ্তির সঙ্গে কত কাল খাই নি।

গঙ্গাচরণের মনে হলো দুর্গা পণ্ডিত কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলচে না। ওর স্বরে কপট ভদ্রতা নেই। সত্যি কথাই বলচে ও, এমন কি অনেক দিন পরে ও যেন আজ পেট ভরে দু'টি ভাত খেতে পেলে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—ও হাবু, বল আর কি দেবো? মোচার ঘণ্ট আর একটু আনি?

পরিশেষে ঘন জাল দেওয়া এক বাটি দুধ আর নতুন আখের গুড়। দুর্গা পণ্ডিত সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়েচে, খাওয়ার সময় ওর চোখ দু'টো যেন

কেমন ধরণের চক্‌চক্‌ করচে। শীর্ণ চেহারা শুধু বোধ হয় না খেয়ে খেয়ে। অনঙ্গ-বৌয়ের মনে মমতা জন্মালো। তাদের যদি অবস্থা থাকতো দেবার, ইচ্ছে হয় রোজ ওই অনাহারশীর্ণ দরিদ্র পণ্ডিত মশাইয়ের পাতে এমনিতর নানা ব্যঞ্জন সাজিয়ে খেতে দেয়।

—আসি বৌমা, আপনাদের কথা ভোলবো না কখনো। বাড়ী গিয়ে মনে রাখবো।

অনঙ্গ-বৌয়ের চোখ দু'টি অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

—যদি কখনো না খেয়ে বিপদে পড়ি, তুমি একটু ঠাঁই দিও মা অন্নপূর্ণা। বড্ড গরীব আমি।

দুর্গা পণ্ডিতের অপস্রিয়মাণ ক্ষীণদেহ আমশিমুলের বনের ছায়ায় ছায়ায় দূর থেকে দূরান্তরে গিয়ে পড়লো অনঙ্গ-বৌয়ের স্নেহ-দৃষ্টির সম্মুখে।

সেদিন এক বিপদ।

রাধিকানগরের বাজারে পরদিন বহুলোকের সামনে পাঁচু কুণ্ডুর চালের দোকান লুঠ হলো। দিনমানে এমন ধরনের ব্যাপার এ সব অঞ্চলে কখনো ঘটে নি। গঙ্গাচরণও সেখানে দাঁড়িয়ে। একটা বটতলায় বড় আটচালাওয়ালা দোকানটা। প্রথমে লোকে সবাই এলো চাল কিনতে, তারপর কিসে যে কি হলো গঙ্গাচরণ জানে না, হঠাৎ দেখা গেল দোকানের চারিপাশে একটা হৈচৈ গোলমাল। মেলা লোক দোকানে ঢুকচে আর বেরুচ্চে। ধামা ও থলে হাতে বহুলোক মাঠ ভেঙে বাঁওড়ের ধারে ধারের পথে পড়ে ছুটচে। সন্ধ্যার দেরি নেই বেশি, সূর্যদেব পাটে বসে-বসে। গাছের মগডালে রাঙা রোদ।

একজন কে বললে—উঃ, দোকানটা কি করেই লুঠ হচ্চে।

গঙ্গাচরণও গিয়েছিল চাল কিনতে। হাতে তার চটের থলে। কিন্তু দোকানে দোকানে ঘুরে সে দেখলে চালের বাজার সাড়ে বারো টাকা। গত হাটবারেও ছিল দশ টাকা চার আনা, একটা হাটের মধ্যে মণে একেবারে ন'সিকে চড়ে যাবে এ তো স্বপ্নের অগোচর। চাল কিনবে কি না-কিনবে ভাবচে, এমন সময় এই বিষম হৈচৈ।

লোকের ভিড় ক্রমশঃ পাতলা হয়ে আসচে, সবাই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটচে। কেউ চাল নিয়ে ছুটচে, কেউ শুধু হাতে। গঙ্গাচরণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে ভাবচে তখনও, চাল কিনবে কিনা—এমন সময় পেছন থেকে দু'জন লোক এসে ওর

ঘাড়ের ওপর পড়লো তার মধ্যে একজন ওকে জাপটে ধরলে জোর করে ওর চটের থলে সুদ্ধ। গাঙ্গাচরণ চমকে উঠে বললে—কে? কে?

কর্কশ কণ্ঠে কে একজন অস্পষ্ট দিবালোকে বলে উঠলো—চাল নিয়ে পালাচ্চো শালা—হাতে-নাতে ধরেচি!

গঙ্গাচরণ ঝাঁকি মেরে উঠে বললে—কে চাল চুরি করেচে? লোক চেনো না?

লোক দু'জন ওর সামনে এসে ভালো করে মুখ দেখলে! গঙ্গাচরণ চিনলে ওদের, বন্দেবেড়ের দফাদার সাধুচরণ মণ্ডল এবং ঐ ইউনিয়নের জনৈক চৌকিদার। ওরা কিন্তু গঙ্গাচরণকে চেনে না।

চৌকিদার বললে—শালা, লোক সবাই ভালো। সকলকেই আমরা চিনি। চাল ফেললি ক'নে?

—আমার নাম গঙ্গাচরণ পণ্ডিত, নতুন গাঁয়ে আমার পাঠশালা। চাল কিনতে এসেছিলাম বাপু, ব্রাহ্মণকে যা তা বোলো না। আমায় সবাই চেনে এ দিগরে। ছেড়ে দাও—

সাধুচরণ দফাদার ওর সামনে এসে মুখ ভালো করে দেখে বললে—এ দেখচি পুরোনো দাগী চোর। এর নাম মনে পড়চে না, বাঁধো একে।

ঠিক সেই সময়ে নতুন গাঁয়ের তিন জন লোক এসে পড়াতে গঙ্গাচরণ দাগী চোর ও চুরির অভিযোগ থেকে নিস্তার পেলে। এমন হাঙ্গামে গঙ্গাচরণ কখনো পড়ে নি জীবনে।

গঙ্গাচরণের ফিরতে রাত হয়ে গেল সে দিন। অনঙ্গ-বৌ বসে আছে চালের আশায়। এত রাত কখনো হয় না হাট করতে যেয়ে। ব্যাপার কি?

বিনোদ কাপালীর বোন ভানু এসে বললে—কি করচো ঠাকরুণ দিদি?

—এসো ভানু। বসো ভাই—

—দাদাঠাকুর ক'নে?

—রাধিকানগরে হাটে গিয়েচে, এখনো আসবার নামটি নেই।

—আজ নাকি খুব হাংনামা হয়ে গিয়েছে হাটে। দাদা ফিরে এসেচে, তাই বলছেল।

অনঙ্গ-বৌ উদ্বিগ্ন মুখে বললে—কি হাংনামা রে ভানু? হয়েচে কি?

ভানু বললে—কি নাকি চালের দোকান লুঠ হয়েচে, অনেক লোককে পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়েচে—এই সব।

অনঙ্গ-বৌ আশ্বস্ত হলো, তার স্বামী লুঠের ব্যাপারে কখনো থাকবে না, সুতরাং পুলিসে ধরেও নিয়ে যায় নি, হয়তো ওই সব দেখতে দেরি করে ফেলেচে। তবুও সে হাবুকে ডেকে বললে—ও হেবো, একটু এগিয়ে দেখ না—হাট থেকে লোকজন ফিরে এলো। এত দেরি হচ্চে কেন?

এমন সময়ে শূন্য চালের থলে হাতে গঙ্গাচরণ বাড়ী ঢুকে বললে—ওঃ, কি বিপদেই আজ পড়ে গিয়েছিলাম। আমাকে কিনা ধরেচে চোর বলে।

অনঙ্গ বলে উঠলো—সে কি গো?

—হ্যাঁ, ওই বল্লেবেড়ের সাধুচরণ দফাদার আর দু ব্যাটা চৌকিদার।

—ও মা, তারপর?

—তারপর বাঁধে আর কি। শেষে এ গাঁয়ের লোকজন গিয়ে না পড়লে বেঁধে নিয়ে যেতো।

—কি সব্বনাশ গা! মা সাত ভেয়ে কালীর পুজো দেবো স পাঁচ আনা। মা রক্ষা করেচেন।

—যাক, সে তো গেল এক বিপদ, ইদিকে যে তার চেয়েও বিপদ। চাল পেলাম না হাটে।

—তুমি ভেবো না, আমি রাতটা চালিয়ে দেবো এক রকমে। কাল দুপুরেও চালাবো। সারাদিনে চাল যোগাড় করে আনতে পারবে এখন খুবই।

বাইরে এসে তাড়াতাড়ি ভানুকে বললে—ভানু, দিদি আমায় এক পালি চাল ধার দিতে পারবে আজ রাতের মত? উনি হাটে গিয়ে হ্যাংনামাতে পড়ে গিয়েছিলেন, চাল কিনতে পারেন নি।

ভানু বললে—এখুনি পেঠিয়ে দিচ্চি ঠাকরুণ দিদি।

—না দিলে কিন্তু রাতে ভাত হবে না।

—ওমা, সে কি কথা ঠাকরুণ দিদি, নয়তো আমি নিজে নিয়ে আসচি।

ভানু চলে গেল বটে কিন্তু চাল নিয়ে এলো না। এই আসে এই আসে করে প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, তখনও ভানুর দেখা নেই। অনঙ্গ-বৌ আশ্চর্য হয়ে গেল, ব্যাপারটা কি? এই গ্রামে এসে পর্যন্ত যার কাছে যা মুখ ফুটে চেয়েচে সে তখুনি পরম খুশির সঙ্গে সে জিনিসটা এনে দিয়ে যেন কৃতার্থ

হয়ে গিয়েচে। এই প্রথম বার অনঙ্গ-বৌকে সামান্য এক কাঠা চাল ধার চেয়ে বিফল হোতে হলো।

এদিকে বিপদের ওপর বিপদ, স্বামী হাট থেকে এসে কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন, বোধ হয় হাটের গল্প বলবার জন্যে বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী, কি করেই বা তাঁকে সে জানায়? এসে খিদের ওপর ভাত খেতে পাবে না।

সাতপাঁচ ভাবচে, এমন সময় ভানু উঠোন থেকে ডাকলে—ও ঠাকরুণ দিদি?

অনঙ্গ-বৌয়ের প্রাণ এল ফিরে। সে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বললে—বলি কি কাণ্ডখানা হ্যাঁ রে ভানু?

ভানু দাওয়ায় উঠে এসে শুকনো মুখে বললে—ও ঠাকরুন দিদি, আমি সেই থেকে চাল যোগাড় করবার জন্যে তিন-চার বাড়ী ঘুরে বেড়িয়েচি।—

—কেন, তোদের বাড়ী কি হলো?

—নেই। হাটে পায় নি আজ।

—হাটে কেন? ক্ষেতের ধান?

—আ মোর কপাল! ক্ষেতের ধান আর কনে! ছ'টাকা মণ যেমন হলো অমনি কাল সব ধান আড়তে নিয়ে গেল গাড়ীপুরে। বিক্রি করে নগদ টাকা ঘরে এনলে। ফি জনে জুতো কেনলে, কাপড় কেনলে, কাকীমা ঘটি বাসন কেনলে, মাছ খালে, সন্দেশ খালে, মাংস খালে। নবাবী করে সে টাকাও উড়িয়ে ফেললে। এখন সে ধানও নেই, সে টাকাও নেই। ক'হাট কিনে খাতি হচ্ছে মোদেরও।

—অন্য বাড়ী যে ঘুরলি বললি?

—মোদের পাড়ায় কারো ঘরে ধান নেই ঠাকরুণ দিদি। সব কিনে খাওয়ার ওপর ভরসা।

ভানু আঁচলের গেরো খুলতে খুলতে বললে।

—ওতে কি রে?

—এক খুঁটি মোটা চাল ওই ক্ষুদে গয়লার নাত-বৌয়ের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে—

—হাঁ রে, তারা তো বড্ড গরীব। তুই আনলি, তাদের খাবার আছে তো? দাঁড়া—

—সে আমি না জেনে আনি নি দিদি ঠাকরুণ। ওরা লোকের ধান ভানে

কিনা? আট কাঠা ধানে এক কাঠা ধান বানি পায়। বানির ধান ভেনে খোরাকি চালায়।

অনঙ্গ-বৌ একটু ভেবে বললে—আমার একটা উপকার করবি ভানু?

—কি?

—আচ্ছা সে পরে বলবো এখন। দে চাল ক'টা—

এক খুঁটি চালি রাতটা হবে এখন তো? আর না হলিই বা কি করবা ঠাকরুণ দিদি? কত কষ্টে যে চাল ক'ডা যোগাড় ক'রে এনিচি তা আমিই জানি।

গঙ্গাচরণ ভাত খেতে বসলো অনেক রাতে। ডাল, ভাত আর পুঁই শাকের চচ্চড়ি। বাড়ীর উঠোনেই সুগৃহিণী অনঙ্গ-বৌ পুঁই মাচা তুলে দিয়েছে, লাউ মাচা তুলেছে, কিছু ঢেঁড়স, কিছু নটে শাকের ক্ষেত করেছে। হাবু ও নিজে দু'জনে মিলে জল দিয়েছে আগে আগে, তবে এই সব গাছ বেঁচে আজ তরকারি যোগাচ্ছে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—আর দুটো ভাত মেখে নাও, ডাল দিয়ে পেট ভরে খাও—

—এ চাল দু'টো ছিল বুঝি আগের দরুণ?

—হুঁ।

—কাল হবে?

—কাল হবে না। সকালে উঠেই চাল যোগাড় করো। রাতটা টেনেটুনে হয়ে গেল।

—সেই বিশ্বাস মশায়ের দরুণ ধানের চাল!

—হুঁ।

অনঙ্গ-বৌ স্বামী-পুত্রকে পেট ভরে খাইয়ে সে রাতে এক ঘটি জল আর একটু গুড় খেয়ে উপোস করে রইলো।

দিন পনেরো কেটে গেল।

গ্রামে গ্রামে লোকে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেচে। চাল পাওয়া বড় কঠিন হয়ে পড়েচে।

রাধিকানগরের হাটে, যেখানে আগে বিশ-ত্রিশখানা গ্রামের চাষাদের মেয়েরা ঢেঁকি ভানা চাল নিয়ে আসতো, সেখানে আজকাল সাত-আটজন স্ত্রীলোক মাত্র দেখা যায়। তাও চাল পাওয়া যায় না। বড়তলার মোড়ে আর ওদিকে সামটা বিলের ধারে ক্রেতার দল ভিড় পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে চাল কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যায়।

হাটুরে লোকেরা চাল বড় একটা পায় না।

আজ দু' হাট আদৌ চাল না পেয়ে গঙ্গাচরণ সতর্ক হয়ে এসে সামটা বিলের ধারে দাঁড়িয়েচে, একটা বড় জিউলি গাছের ছায়ায়। সঙ্গে আরও চার-পাচ জন লোক আছে বিভিন্ন গ্রামের। বেলা আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে। রোদ খুব চড়া।

কয়রা গ্রামের নবীন পাড়ুই বলচে—বাবাঠাকুর, আমরা তো ভাত না পেয়ে থাকতি পারি নে, আজ তিন দিন ঘরে চাল নেই।

গঙ্গাচরণ বললে—আমার ঘরে আজ দু'দিন চাল নেই।

আর একজন বললে—আমাদের দু'দিন ভাত খাওয়া হয় নি।

নবীন পাড়ুই বললে—কি খেলে?

—কি আর খাবো? ভাগ্যিস্ মাগীনরা দুটো চিঁড়ে কুটে রেখেছিল সেই বোশেখ মাসে, তাই দু'টো করে খাওয়া হচ্ছে। ছেলেপিলে তো আর শোনবে না, তারা ভরপেট খায়, আমরা খাই আধপেটা।

—তা চিঁড়ের সেরও দেখতি দেখতি হয়ে গেল বারো আনা, যা ছিল দু' আনা।

—একি বিশ্বেস করতি পারা যায়? কখনো কেউ দেখেচে না শুনেচে যে চিঁড়ের সের বারো আনা হবে?

গঙ্গাচরণ বললে—কখনো কি কেউ শুনেচে যে চালের মণ ষোল টাকা হবে?

নবীন পাড়ুই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। সে জোয়ান মানুষ যদিও তার বয়েস ঠেকেচে পঞ্চাশের কোঠায়; যেমন বুকের ছাতি, তেমনি বাহুর পেশী ভূতের মত পরিশ্রম করেও যদি আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়, তবে আর বেঁচে সুখ কি? আজ দু-তিন দিন তাই জুটেচে ওর ভাগ্যে।

এমন সময় দেখা গেল আকাইপুরের মাঠের পথ বেয়ে তিন-চারটি স্ত্রীলোক চালের ধামা, কেউ বা বস্তা মাথায় বড় রাস্তায় এসে উঠলো।

সবাই এগিয়ে চললো অমনি।

মুহূর্ত মধ্যে উপস্থিত পাঁচ-ছ জনের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, কে কতটা চাল কিনতে পারে! হঠাৎ ওদের মধ্যে কার যেন মনে পড়লো কথাটা, সে জিজ্ঞেস করলে—কত করে পালি?

একজন চালওয়ালী বললে—পাঁচ সিকে।

গঙ্গাচরণ এবং উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল, পাঁচ সিকে পালি, অর্থাৎ কুড়ি টাকা মণ।

নবীন পাড়ুইয়ের মুখ শুকিয়ে গেল, সে একটি টাকা এনেচে— পাঁচ সিকে না হলে এক কাঠা চাল কেউ বিক্রি করবে না। এক টাকার চাল কেউ দেবে না।

এরা সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেলেও দেখলে যে চাল যদি সংগ্রহ করতে হয় তবে এই বেলা। বিলম্বে হতাশ হতে হবে। আরও পাঁচ ছ'জন ক্রেতাকে দূরে আসতে দেখা যাচ্চে।

দু'জন লোক এদের মধ্যে নিরুপায়। ওদের হাতে বেশি পয়সা নেই। সুতরাং চাল কিনবার আশা ওদের ছাড়তে হলো। এই দলে নবীন পাড়ুই পড়ে গেল।

গঙ্গাচরণ বললে—নবীন, চাল নেবে না?

—না বাবাঠাকুর, একটা সিকি কম পড়ে গেল।

—তবে তো মুশকিল। আমার কাছেও নেই যে তোমাকে দেবো।

—আধসের পুঁটি মাছ ধরেলাম সামটার বিলে। পেয়েলাম ছ'আনা। আর কাল মাছ বেচবার দরুন ছেল দশ আনা। কুড়িয়ে-বুড়িয়ে একটা টাকা এনেলাম চাল কিনতি। তা আবার চালের দাম চড়ে গেল কি করে জানবো?

—তাই তো!

—আধপেটা খেয়ে আছি দুদিন। চাষীদের ঘরে ভাত আছে, আমাদের তা নেই। আমাদের কষ্ট সকলের অপিক্ষে বেশি। জলের প্রাণী তার ওপর তো জোর নেই? ধরা না দিলে কি করচি। যেদিন পালাম সেদিন চাল আনলাম, যে দিন পালাম না, সেদিন উপোস। আগে ধান চাল ধার দিতো, আজকাল কেউ কিছু দেয় না।

গঙ্গাচরণ কাঠাদুই চাল সংগ্রহ করেছিল কাড়াকাড়ি করে। তার ইচ্ছে হলো একবার এই চাল থেকে নবীন পাড়ুইকে সে কিছু দেয়। কিন্তু তা কি করে দেওয়া যায়, চালের অভাবে হয়তো উপোস করে থাকতে হবে বালাই। গ্রামে ধান চাল মেলে না যে তা নয়, মেলে অতি কষ্টে। ধান চাল থাকলেও লোকে স্বীকার করতে চায় না সহজে।

নবীন পাড়ুইকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাচরণ রাধিকানগরের বাজারে এল। এক টাকার চালই কিনে দেবে তাকে। দোকান ছাড়া তো হবে না। কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার, বড় বড় তিন চারটি দোকান খুঁজে বেড়ালে, সকলেরই এক বুলি চাল নেই।

গঙ্গাচরণের মনে পড়লো বৃদ্ধ কুণ্ডু মশায়ের কথা। এই গত বৈশাখ মাসেও কুণ্ডু মশায়ের দোকানের সামনে দিয়ে য'চ্চে সে, কুণ্ডু মশাই তাকে ডেকে আদর করে তামাক সেজে খাইয়ে বলেচে—পণ্ডিত মশাই, আমার দোকান থেকে চাল নেবেন, ভালো চাল আনিয়েচি। কত খাতির করেচে।

কুণ্ডু মশায়ের দোকানে গেলে ফিরতে হবে না, ঠিক পাওয়া যাবেই। কিন্তু সেখানেও তথৈবচ, গঙ্গাচরণ দোকান ঘরটিতে ঢুকবার সময়ে চেয়ে দেখলে বাঁ পাশের যে বাঁশের মাচায় চালের বস্তা ছাদ পর্যন্ত সাজানো থাকে, সে জায়গা একদম খালি, হাওয়া খেলচে।

বৃদ্ধ কুণ্ডু মশায় প্রণাম করে বললে—আসুন, কি মনে করে?

অভ্যর্থনার মধ্যে বৈশাখ মাসের আন্তরিকতা নেই যেন। প্রণামটা নিতান্ত দায়সারা গোছের।

গঙ্গাচরণ বললে—কিছু চাল দিতে হবে।

—কোথায় পাবো, নেই।

—এক টাকার চাল, বেশি নয়। এই লোকটাকে উপোস করে থাকতে হবে। দিতেই হবে আপনাকে।

কুণ্ডু মশায় সুর নিচু করে বললে—সন্ধ্যের পর আমার বাড়ীতে যেতে বলবেন, খাবার চাল থেকে এক টাকার চাল দিয়ে দেবো এখন।

গঙ্গাচরণ বললে—ধান চাল কোথায় গেল? আপনার এত বড় দোকানের মাচা একদম ফাঁক কেন?

—কি করবো বাপু, সেদিন পাঁচু কুণ্ডুর দোকান লুঠ হবার পর কি করে সাহস করে মাল রাখি এখানে বলুন। সবারই সে দশা। তার ওপর শুনচি পুলিসে নিয়ে যাবে চাল কম দামে মিলিটারির জন্যে।

—কে বললে?

—বলচে সবাই। গুজব উঠেচে বাজারে। আপনার কাছে মিথ্যে বলবো না, চাল আমি বাড়ী নিয়ে গিয়ে রেখে দিইচি। কিন্তু লোকের কাছে কবুল যাবো না, আপনাকে তাই বললাম, অন্যকে কি বলি?

—আমরা না খেয়ে মরবো?

—যদিন থাকবে, দেবো। তবে আমার জামাই গরুর গাড়ী করে বদ্দিবাটির হাটে কিছু চাল নিয়ে যেতে চাইচে। তাই ভাবচি।

—পাঠাবেন না, লুঠ হবে পথে। বুঝে কাজ করুন, কিছু চাল দেশে থাকুক, নইলে দুর্ভিক্ষ হবে যে। কি খেয়ে বাঁচবে মানুষ?

—বুঝি সব, কিন্তু আমি একা রাখলি তো হবে না। খাঁ বাবুরা এত বড় আড়তদার, সব ধান বেচে দিয়েচে গভর্ণমেণ্টের কনট্রাক্টারদের কাছে। একদানা ধান রাখে নি। এই রকম অনেকেই করেচে খবর নিয়ে দেখুন। আমি তো চুনোপুঁটি দোকানদার, পঞ্চাশ-ষাট মণ মাল আমার বিক্রে।

গঙ্গাচরণ সন্ধ্যার অন্ধকারে চিন্তান্বিত মনে বাড়ীর পথে চললো।

নবীন পাড়ুই সঙ্গেই ছিল, তাকে যেতে হবে দোমোহানী, নতুন গাঁয়ের পাশেই। বললে—পণ্ডিত মশাই ছেলেন তাই আজ বাচকাচের মুখে দু'টো দানা পড়বে। মোদের কথা ওসব বড় দোকানদার কি শোনে! মোরা হলাম টিকিরি মানুষ। কাল দু'টো মাছ পেটিয়ে দেবো আনে।

গঙ্গাচরণ বাড়ী নেই, পাঠশালায় গিয়েচে পড়াতে। হাবু ও পটল বাপের সঙ্গে পাঠশালায়। একা অনঙ্গ-বৌ রয়েছে বাড়ীতে। কে এসে ডাক দিলে—ও পণ্ডিত মশাই—বাড়ীতে আছ গা—

অনঙ্গ-বৌ কারো সামনে বড় একটা বার হয় না। বৃদ্ধ ব্যক্তি ডাকাডাকি করচে দেখে দোরের কাছে এসে মৃদুস্বরে বললে—উনি বাড়ী নেই। পাঠশালায় গিয়েচেন—

—কে? মা-লক্ষ্মী?

অনঙ্গ সলজ্জ ভাবে চুপ করে রইল।

বৃদ্ধটি দাওয়ায় উঠে বসে বললে—আমায় একটু খাবার জল দিতি পারবা মা-লক্ষ্মী?

অনঙ্গ তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে এক ঘটি জল নিয়ে এসে রাখলে। তারপর বাড়ীর গামছাখানা বেশ করে ধুয়ে ঘটির ওপর রেখে দিলে। একটু আখের গুড় ও এক গ্লাস জল ও নিয়ে এল।

বললে—দু'কোয় কাঁটাল দেবো?

—খাজা না রসা?

—আধখাজা। এখন শ্রাবণ মাসে রসা কাঁটাল বড় একটা থাকে না।

—দাও, নিয়ে এসো—মা, একটা কথা—

—কি বলুন?

আমি এখানে দু'টো খাবো। আমি ব্রাহ্মণ। আমার নাম দীনবন্ধু ভট্টাচার্য। বাড়ী কামদেবপুরের সন্নিকট বাসান-গাঁ।

অনঙ্গ-বৌ বললে—খাবেন বই কি। বেশ একটু জিরিয়ে নিন। ঠাঁই করে দি—

একটু পরে দীনু ভট্‌চাজ মোটা আউশ চালের রাঙা রাঙা ভাত, ঢেঁড়স ভাজা, বেগুন ও শাকের ডাঁটাচচ্চড়ি দিয়ে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছিল। অনঙ্গ-বৌ বিনীতভাবে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

দীনু খেতে খেতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যেন একটু দম নিলে। তারপর বললে—মা-লক্ষ্মীর রান্না যেন অমর্তো। চচ্চড়ি আর একটু দাও তো?

অনঙ্গ লজ্জা কুণ্ঠিত স্বরে বললে—আর তো নেই। ঢেঁড়স ভাজা দুখানা দেবো?

—তাই দাও মা।

এত বৃদ্ধ লোক যে এতগুলো ভাত এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলতে পারে, অনঙ্গ-বৌ নিজের চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করতো না। বললে আর ভাত দেবো?

—তা দুটো দাও মা।

—মুশকিল হয়েচে, খাবেন কি দিয়ে। তরকারি বাড়ন্ত।

—তেঁতুল এক পাট দিতি পারবা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমরা হোলাম গিয়ে গরীব মানুষ। সব দিন কি মাছ তরকারি জোটে? কোনো দিন হলো না। তেঁতুল এক পাট দিয়ে এক পাতর ভাত মেরে দেলাম—

অনঙ্গের ভালো লাগছিল এই পিতার বয়সী সরল বৃদ্ধের কথাবার্তা। ইনি বোধ হয় খুব ক্ষুধার্ত ছিলেন। বলতে নেই, কি রকম গোগ্রাসে ভাত কটা খেয়ে ফেললেন। আরও থাকলে আরও খেতে পারতেন বোধ হয়। কিন্তু বড্ড দুঃখের বিষয়, ভাত তরকারি আর ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার পর অনঙ্গ বললে—তামাক সেজে দেবো?

—তোমাকে দিয়ে তামাক সাজাবো মা-লক্ষ্মী? না—না—কোথায় তামাক বলো। আমি নিজে বলে তামাক সাজতি সাজতি বুড়ো হয়ে গেলাম। উনসত্তর বছর বয়েস হলো।

—উনসত্তর?

—হ্যাঁ। এই আশ্বিন মাসে সত্তর পোরবে। তোমরা তো আমার নাতনীর বয়সী।

দীনু ভট্চায হা হা করে হেসে উঠলো কথার শেষে।

অনঙ্গ-বৌ নিজেই তামাক সেজে কল্কেয় ফুঁ দিতে দিতে এল, ওর গাল দুটি ফুলে উঠেচে, আগুনের আভায় রাঙা হয়ে উঠেচে।

দীনু শশব্যস্তে বললেন—ওকি, ওকি,—এই ছাখো আমার মা-লক্ষ্মীর কাণ্ড!

—তাতে কি? এই তো বললেন—আমাকে নাতনীর সমবয়সী।

—না—না, ওটা ভালো না। মা-লক্ষ্মী তুমি, কেন তামাক সাজবে? ওটা আমি পছন্দ করি নে—দাও হুঁকো আমার হাতে। ফুঁ দিতি হবে না।

অনঙ্গ-বৌ একটা মাদুর ও বালিশ নিয়ে এসে পেতে দিয়ে বললে—গড়িয়ে নিন একটু।

বেলা পাঁচটার সময় পাঠশালার ছুটি দিয়ে গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরে কে একজন অপরিচিত বৃদ্ধকে দাওয়ায় শুয়ে থাকতে দেখে কিছু বুঝতে পারলে না। পরে স্ত্রীর কাছে সব শুনে বললে—ও, কামদেবপুরের সেই বুড়ো ভট্চায। চিনেচি এবার। কিন্তু তুমি তাহলে না খেয়ে আছ?

অনঙ্গ বললে—আহা, আমি তো যা-তা খেয়েই এক বেলা কাটাতে পারি। কিন্তু বুড়ো বামুন ওর না খাওয়ার কষ্টটা—

—সে তো বুঝলাম। কিন্তু যা তা খেয়ে যে কাটাবে—যা-তা ঘরে ছিলই বা কি?

—তোমার সে ভাবনা ভাবতে হবে না।

স্ত্রীকে গঙ্গাচরণ খুব ভালো করেই জানে। ওর সঙ্গে মিছে তর্ক করে কোনো লাভ নেই। মুখের ভাত অপরকে ধরে দিতে ও চিরকাল অভ্যস্ত। অথচ মুখ ফুটে বলবে না কখনো কি খেয়েচে না খেয়েচে। এমন স্ত্রী নিয়ে সংসার করা বড় মুশকিলের কাণ্ড। কত কষ্টে গত হাটে চাল যোগাড় করেছিল সেই জানে।

ইতিমধ্যে দীনু ভট্‌চায ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসলো। বললে—এই যে পণ্ডিত মশাই!

গঙ্গাচরণ দু'হাত জুড়ে নমস্কার করে বললে—নমস্কার। ভালো?

দীনু হেসে বললে—মা-লক্ষ্মীর হাতে অন্ন খেয়ে আপাতোক খুবই ভালো। বড্ড জমিয়ে নিয়েচি। মা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

গঙ্গাচরণ মনে মনে বললে—ওর মাথাটি খেলে কেউ লক্ষ্মী, কেউ অন্নপূর্ণা বলে। আমি এখন মাঝে পড়ে মারা যাই।

মুখে বললে—হেঁ হেঁ তা বেশ—তা আর কি—

—কোথা থেকে ফিরলেন?

—পাঠশালা থেকে।

—আমি একটু বিপদে পড়ে পরামর্শ করতে এ্যালাম পণ্ডিত মশায়।

—কি বলুন?

—বলবো কি, বলতি লজ্জা হয়। চাল অভাবে সপুরী উপোস করতে হচ্চে। কম দুঃখে পড়ে আপনার কাছে আসি নি।

—কামদেবপুরে মিলচে না?

—আমাদের ওদিকি কোনো গাঁয়ে না। আর যদিও থাকে তো দেড় টাকা করে কাঠা বলচে। এ কি হলো দেশে? আমার বাড়ী চার-পাঁচ জন পুষ্যি। দেড় টাকা চালের কাঠা কিনে খাওয়াতি পারি আমি?

—এদিকেও তো ওই রকম ভট্‌চায মশায়। আমাদের গাঁয়েও তাই।

—বলেন কি?

—ঠিক তাই। ও হাটে অতি কষ্টে দুকাঠা চাল কিনে এনেছিলাম।

—ধান?

—ধান কেউ বিক্রি করচে না। করলেও নটাকা সাড়ে নটাকা মণ।

—এর উপায় কি হবে পণ্ডিত মশায়? আপনি বসুন, সেই পরামর্শ করতি তো আমার আসা। সত্যি কথা বলতি কি আপনার কাছে, কাল রাতি আমার খাওয়া হয় নি। চাল ছিল না ঘরে। মা-লক্ষ্মীর কাছে অন্ন খেয়ে বাঁচলাম। বুড়ো বয়সে খিদের কষ্ট সহি করতে পারিনে আর।

—কি বলি বলুন, শুনে বড্ড কষ্ট হলো। করবারও তো নেই কিছু। আমাদের গ্রামের অবস্থাও তথৈবচ।

দীনু ভট্‌চায দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—বুড়ো বয়সে এবারডা না খেয়ে মরতি হবে দেখচি!

গঙ্গাচরণ বললে—তাই তো পণ্ডিত মশাই, কি যে করি, বুঝতে তো কিছু পারিনে। তা ছাড়া আপনাদের গাঁয়ের ব্যবস্থা এখান থেকে কি করে করা যাবে। কতটা চাল চান? চলুন দিকি একবার বিশ্বেস মশায়ের বাড়ী?

কিন্তু বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী যাওয়া হবে কি, দীনু ভট্‌চায ম্লান মুখে বললে—তাই তো, পয়সাকড়ি তো আনি নি।

গঙ্গাচরণ একটু বিরক্তির সুরে বললে—আনেন নি, তবে আর কি হবে? কি করতে পারি আমি?

গঙ্গাচরণ বোধ হয় একটু কড়া সুরে বলে ফেলেছিল কথাটা।

দীনু ভট্‌চায হতাশভাবে বললে—তাই তো, এবারডা দেখচি সত্যিই না খেয়ে মরতি হবে!

গঙ্গাচরণ ভাবলে—ভালো মুশকিল! তুমি না খেয়ে মরবে তা আমি কি করবো? আমার কি দোষ?

এই সময় অনঙ্গ-বৌ দোরের আড়াল থেকে হাতনাড়া দিয়ে গঙ্গাচরণকে ডাকলে।

গঙ্গাচরণ ঘরের মধ্যে গিয়ে বললে—কি বলচ?

—জিজ্ঞেস করো উনি কি এখন দুখানা পাকা কাঁকুড় খাবেন? ঘরে আর তো কিছু নেই।

—থাকে তো দাও না। জিজ্ঞেস করতে হবে না। ফুটি কাঁকুড় কি দিয়ে দেবে? গুড় বা চিনি কিছুই তো নেই।

—সে ব্যবস্থার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না। সে আমি দেখছি। আর একটা কথা শোনো। উনি অমন দুঃখু করচেন বুড়ো বয়েসে না খেয়ে মরবেন বলে, তোমাকে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। আমাদের বাড়ী এয়েচেন কেন, একটা হিল্লে হবে বলেই তো। আমি দুটো কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি। বুড়ো বামুন আমাদের বাড়ী থেকে শুধু হাতে শুধু মুখে ফিরে গেলে অকল্যাণ হবে না! তা ছাড়া যখন আমাদের আশা করে এতটা পথ উনি এয়েচেন, এর একটা উপায় না করলে হয়?

গঙ্গাচরণ বিরক্ত মুখে বললে—কি উপায় হবে? খালি হাতে এসেচে বুড়ো। ও বড্ড ধড়িবাজ। একদিন ওমনি কামদেবপুর থেকে ফিরবার পথে চালগুলো নিয়ে নিলে—

অনঙ্গ-বৌ জিভ কেটে বললে—ছিঃ ছিঃ—অতিথি নারায়ণ। আমার

বাড়ী উনি এয়েচেন, আমাদের কত ভাগ্যি। ও কথাটি বোলো না। অতিথকে অমন কথা বলতে আছে? কাকে কি যে বলো! নিয়েচেন চাল, নিয়েচেন। আমাদের বাপের বয়সী মানুষ। ওঁকে অমন বোলো না—

—তা তো বুঝলাম, বলবো না। কিন্তু পয়সা না থাকলে চাল ধান পাবো কোথায়?

—উনি কি বলেন দ্যাখো—

—উনি যা বলবেন বোঝাই গিয়েচে। উনি এয়েচেন ভিক্ষে করতে, সোজা কথা। মেগে পেতে বেড়ানোই ওঁর স্বভাব।

অনঙ্গ-বৌ ধমক দিয়ে বললে—আবার ওই সব কথা?

—তা আমি কি করব এখন? বলো তাই করি।

—শুধু হাতে উনি না ফেরেন। বাপের বয়সী বামুন। না হয় আমার হাতের পেটি বাঁধা দিয়ে দুটো টাকা এনে ওঁকে চাল কিনে দাও। দিতেই হবে, না দিলে আমি মাথা খুঁড়ে মরবো। চাল তো আমাদেরও কিনতে হবে। রাতে রান্না হবে না।

গঙ্গাচরণ বাড়ীর বাইরে যাচ্ছিল, অনঙ্গ-বৌ বললে—পাকা কাঁকুড় দুখানা খেয়ে যাও। বেরিও না।

গঙ্গাচরণ বিরক্তির সুরে বললে—আমি বিনি মিষ্টিতে ফুটি কাঁকুড় খেতে পারি নে। ওসব বাঙালে খাওয়া তোমরা খাও।

অনঙ্গ-বৌ সকৌতুকে হাসি হাসি চোখ নাচিয়ে বললে—বাঙাল বাঙাল করো না বলচি, ভালো হবে না। আমি বাঙাল, আর উনি এসেচেন একেবারে মুকুসুদাবাদ জেলা থেকে—

—সে আবার কি গো? ও কথা তুমি আবার কোথায় শিখলে?

—শিখতে হয় গো, শিকতে হয়। সেই যে ভাতছালায় উত্তুরে ঘরামি জন ঘর ছাইতে আসতো মনে পড়ে? ওরা বলতো না, মা, আমাদের বাড়ী মুকুসুদাবাদ জেলা—হি-হি-হি—

একটু পরে বাইরের দাওয়ায় বসে দীনু ও গঙ্গাচরণ দুজনেই পাকা ফুটি কাঁকুড় খাচ্ছিল, খেজুর গুড়ের সঙ্গে। কোথায় অনঙ্গ-বৌ একটু খেজুর গুড় লুকিয়ে সঞ্চয় করে রেখেছিল সময় অসময়ের জন্যে। অনঙ্গ-বৌ ওই রকম রেখে থাকে। গঙ্গাচরণ জানে অনেক সময় জিনিসপত্র ভেল্‌কিবাজির মত বার করে অনঙ্গ।

দীনু ভট্‌চায কাঁসার বাটী থেকে গুড়টুকু চেপেপুটে খেয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে—আহা, খেজুর গুড়ের মুখ এবার আর দেখি নি।

গঙ্গাচরণ বললে—তা বটে।

—আগে আগে পণ্ডিত মশায়, গুড় আমাদের কিনতি হতো না। মুচিপাড়ায় বানে খেজুর রস জাল দিতো, ঘটি হাতে করে গিয়ে দাঁড়ালি আধ সের এক সের গুড় এমনি খেতি দিতো। সে সব দিন কোথায় যে গেল!

গঙ্গাচরণ বাড়ী থেকে বার হয়ে গেলেই অনঙ্গ-বৌ দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে বললে—কাঁকুড় কেমন খেলেন?

—চমৎকার মা চমৎকার। তুমি সাক্ষাৎ মা-লক্ষী, কি আর বলবো তোমায়। একটা কথা বলবো?

—কি বলুন না?

—মা একটু চা করে দিতি পারো?

অনঙ্গ-বৌ বিপন্ন মুখে বললে—চা?

—কতদিন চা খাইনি। মাসখানেক আগে সবাইপুরের গাঙ্গুলী-বাড়ী গিয়ে একদিন চা খেয়েছিলাম। চা আমার বড্ড খেতি ভালো লাগে। আগে আগে বড্ড খ্যাতাম। এদানি হাতে পয়সা অনটন, ভাতই জোটে না বলে চা! আছে কি?

অনঙ্গ-বৌ ভেবে বললে—আচ্ছা আপনি বসুন—

হাবুকে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বললে—হ্যাঁরে, কাপালীর মাব বাড়ী ছুটে যা তো। আমার নাম করে বলগে একটু চা দাও। যদি সেখানে না থাকে, তবে শিবু ঘোষেদের বাড়ী যাবি। চা আনতিই হবে বাবা।

হাবু বললে—ও বুড়ো কে মা?

—যাঃ, বড়ো বুড়ো কি রে? ও রকম বলতে আছে? বাড়ীতে নোক এলে তাকে মেনে চলতে হয়। শিখে রাখো।

—হ্যাঁ মা, চা কি দিয়ে হবে। চিনি নেই যে—

—তোর সে ভাবনায় দরকার কি? তুই যা বাপু, চা একটু এনে দে—

আধঘণ্টা পরে প্রফুল্লবদন দীনু ভট্‌চাযের সামনে হাসি হাসি মুখে চায়ের গ্লাস স্থাপন করে অনঙ্গ-বৌ বললে—দেখুন তো কেমন হয়েছে? সত্যি কথা, চায়ের পাটাপাট তেমন তো নেই এ বাড়ীতে। কেমন চা করলাম, কে জানে?

দীনু ভট্‌চায চা-পূর্ণ কাঁসার গ্লাস কোঁচার কাপড়ে জড়িয়ে দু-হাতে ধরে

এক চুমুক দিয়ে চোখ বুঁজে বললে—বাঃ, বেশ, বেশ—মা-লক্ষ্মী—এই আমার অমর্ত্তো। দিব্যি হয়েচে—

এই সময় গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বললে—চলো, ওদিকে একটা কথা শোনো।

অনঙ্গ-বৌ আড়ালে এসে নিচু স্বরে বললে কি ?

—চাল আনলাম এক কাঠা বিশ্বেস মশায়ের বাড়ী থেকে চেয়ে চিন্তে। আর ধারে তিন কাঠা ধানের ব্যবস্থা করে এলাম। দীনু ভট্‌চাযকে কাল সকালে এনে দেবো। আজ আর বুড়ো নড়চে না দেখছি। ও খাচ্চে কি ? চা নাকি ? কোথায় পেলে ? বুড়ো আছে দেখচি ভালোই। আর কি নড়ে এখান থেকে ?

—তোমার এত সন্ধানে দরকার কি ? তুমি একটু চা খাবে ? দিচ্চি। আর ওঁকে অমন বোলো না। বলতে নেই বুড়ো বামুন অতিথি—ছিঃ—

গঙ্গাচরণ মুখ বিকৃতি করে অতিথির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলে। মুখে বললে—ওঃ, ভারি আমার অতিথি রে।

ধমক দিয়ে অনঙ্গ-বৌ বললে—ফের ? আবার ?

বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী একদিন গঙ্গাচরণ গিয়ে দেখলে গ্রামের অনেকগুলি লোক জুটেচে। ঘন ঘন তামাক চলচে।

হীরু কাপালী বলচে—আমাদের কিছু ধান দ্যান বিশ্বেস মশাই, নয়তো আমরা না খেয়ে মলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচ-ছজন লোক ওই এক কথাই বললে। ধান দিতে হবে, না দিলে তাদের পরিবারে অনাহার শুরু হবে।

বিশ্বেস মশায় বললেন—নিয়ে যাও গোলা থেকে। যা আছে, দুপাঁচ আড়ি করে এক একজনের হবে এখন। যতক্ষণ আমার আছে ততক্ষণ তোমাদের দিয়ে তো যাই, তারপর যা হয়।

গঙ্গাচরণও ধানের জন্যে দরবার করতে গিয়েছিল। তাকে বিশ্বেস মশায় বললেন—আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ। আপনাকে কর্জ হিসাবে ধান আর কি দেবো। পাঁচ আড়ি ধান নিয়ে যান। কিন্তু এই শেষ, আর আমার গোলায় ধান নেই।

গঙ্গাচরণ বিস্মিত হলো বিশ্বাস মশায়ের কথায়। যার গোলা ভর্তি ধান, মাত্র এই কয় জন লোককে সামান্য কিছু ধান দিলে তার গোলা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে, এ কেমন কথা হলো ?

পথে তাকে হীরু কাপালী গোপনে বললে—বিশ্বাস মশায় ধান সব লুকিয়ে সরিয়ে ফেলে দিয়েচে পণ্ডিত মশাই। পাছে মোদের দিতি হয় সেই ভয়ে—তুপৌটি ধান ধরে হাতীর মতো গোলা। ধান নেই কি রকম?

—তোমরা তো ধান নিলে, কি রকম দেখলে গোলায়?

—গোলা সাবাড় পণ্ডিত মশাই, নিজের চোখে দেখে এলাম। এক দানা নেই ওর মধ্যে।

—তাই তো!

—এবার এই ধান কটা ফুরুলি না খেয়ে মরতি হবে—

—কেন ভাদ্র মাসের দশ বারো তারিখের মধ্যে আউশ ধান পেকে উঠচে। ভাবনা চলে যাবে তখন।

—তা কি হয় পণ্ডিত মশাই? নতুন ধানের চাল খেলি সন্থ কলেরা। দেখবেন তাই লোকে খাবে পেটের জ্বালায় আর পট্ পট্ মরবে। ও চাল কি এখন খাওয়া যাবে না পেটে সহ্যি হবে? ও খেতি পারা যাবে কার্তিক অঘ্রাণ মাসের দিকি।

—তবে উপায় কি হবে লোকের?

—এবার যে রকমডা দেখচি, না খেয়ে লোক মরবে।

কথাটা গঙ্গাচরণের বিশ্বাস হলো না। না খেয়ে আবার লোক মরে? কখনো দেখা যায়নি কেউ না খেয়ে মরেচে। জুটে যায়ই কোনো-না-কোনো উপায়ে। যে দেশে এত খাবার জিনিস, সে দেশে লোকে না খেয়ে মরবে?

অনঙ্গ-বৌ বললে—ও কটা ধান আমি নিজেই ভেনে কুটে নেবো ঢেঁকিতে। ওর জন্যে আর কারো খোসামোদ করতে হবে না। কিন্তু ওতে কদিন চলবে?

—তাই তো আমিও ভাবচি।

—আমি একটা কথা ভাবচি। অন্য লোকের চাল কেন আমি ভেনে দিই না? বানি পাবো দুকাঠা করে চাল মণে।

—ছিঃ ছিঃ, দুকাঠা চাল বানি দেবে তার জন্যে তুমি দশ আড়ি ধান ভানতে যাবে? অত কষ্ট করে দরকার নেই।

—কষ্ট আর কি? দু'কাঠা চালের দাম কত আজকাল! আমি তা ছাড়বো না। দুকাঠা চাল বুঝি ফেলনা!

—লোকে কি বলবে বল তো?

—বলুক গে। আমার সংসারে যদি দু'কাঠা চালের সাশ্রয় হয় তবে লোকের কথাতে কি আসে যাচ্চে?

—তুমি যা ভালো বোঝো কর, কিন্তু আমার মনে হচ্চে তোমার শরীর টিকবে না।

—সে তোমায় দেখতে হবে না।

তারপর অনঙ্গ-বৌ হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বললে—তোমায় ঠকিয়েচি গো তোমায় ঠকিয়েচি।

গঙ্গাচরণ বিস্ময়ের সুরে বললে কি ঠকিয়েচ?

—ঠকিয়েচি মানে চোখে ধূলো দিইচি।

—কেন?

—কত দিন আগে থেকে আমি ধান ভানচি।

—সত্যি?

—সত্যি গো সত্যি। নইলে চালের হিসেব নিয়ে দেখো। দু'কাঠা চাল তো হাট থেকে কিনেছিলে। কত দিন খেলে মনে নেই?

—আমায় না জানিয়ে কেন অমন করচো তুমি? ছিঃ ছিঃ—কাদের ধান ভানো?

—হরি কাপালীদের। শ্যাম বিশ্বেসদের।

—ক'কাঠা চালের জন্যে কেন কষ্ট করা? ওতে মান থাকে না। ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে কাপালীদের ধান ভানা? লোকে জানলে কি বলবে বল তো? এত ছোট নজর তোমার হলো কেমন করে তাই ভাবছি।

—বেশ, লোকে আমায় বলে বলবে, আমার ছেলেপুলে তো দুমুঠো পেট ভরে খেতে পাবে। তা ছাড়া কাপালীদের দুই বৌ ধান এলে দেয়। আমি শুধু ঢেঁকিতে পাড় দিই।

—তুমি ধান এলে দিতে পারো? এলে দেওয়া বড্ড শক্ত—না?

—এলে দেওয়া শিখতে হয়। তাড়াতাড়ি গড় থেকে যে হাত উঠিয়ে নিতে পারে সে ভালো এলে দিতে পারে। এলে দেওয়ানো শিখচি একটু একটু।

গঙ্গাচরণ স্ত্রীর কথায় ভাবনায় পড়ে গেল। তার স্ত্রী যে তাকে লুকিয়ে এ কাজ করচে তা সে জানতো না। মাঝে মাঝে সে ভেবেচে অবিশ্যি, মাত্র দুকাঠা এক কাঠা চালে তার এক হাট থেকে আর এক হাট পর্যন্ত চলচে কি করে? এত দিন লুকিয়ে লুকিয়ে অনঙ্গ-বৌ চালাচ্চে তা তো সে জানতো না।

আহা, বেচারী! যদি ধান এলে দিতে গিয়ে কোনদিন ওর আঙুলে ঢেঁকি পড়ে যায়।

গঙ্গাচরণ পাঠশালায় বেরিয়ে গেলে হরি কাপালীর ছোট বৌ এসে ছেঁচতলায় দাঁড়িয়ে চুপি চুপি বললে—উনি চলে গিয়েচেন?

—হঁ্যা, দিদি। যাই—

—চলো বামুন-বৌ, ওরা সব বসে আছে তোমার জন্যি।

—কত ধান আজকে?

—পাঁচ আড়ি তিন কাঠা। চিঁড়ে আছে তিন কাঠা।

—আমাকে ধান এলে দেওয়া শিখিয়ে দিবি দিদি?

—সে তোমার কাজ নয়। অমন চাপাফুলের কলির মত আঙুল ঢেঁকি পড়ে ছেঁচে যাবে। তার দায়িক আমি হবো বুঝি-বামুন-বৌ?

—দায়িক হতে হবে না সে জন্যে। আহা, ভঙ্গি দেখো না? মরণের ভগ্নদশা?

কাপালী-বৌ অনঙ্গ-বৌয়ের দিকে চোখ মিটকি মারছিল, তার প্রতি লক্ষ্য করেই অনঙ্গ-বৌয়ের শেষের উক্তিটুকু। হরি কাপালীর ছোট বৌয়ের বয়েস অনঙ্গ অপেক্ষা বছর দুই বেশি হবে, ছেলেপুলে হয় নি, রংও ফসা, মুখ চোখের চটক ও দেহের গড়ন এবং বাঁধুনি ভালোই। রাস্তার লোকে চেয়ে দেখে।

অনঙ্গ হেসে বললে—আড়চোখ দেখাগে অন্য জায়গায়—বহু-লোকের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে পারবি।

কাপালী-বৌ হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। বললে—মুণ্ডু ঘুরিয়ে বেড়ানো বুঝি আমার কাজ?

—কি জানি দিদি?

—আর তুমি বামুন-বৌ—তুমি যে অনেক মুনির মন টালিয়ে দিতে পারো মন করলি? আমরা তো তোমার পায়ের নখের যুগ্যি নই। সামনে খোশামোদ করে বলচি নে বামুন-বৌ। গ্রামের সবাই বলে—

অনঙ্গ-বৌ সলজ্জ হাসি মুখে বললে—যাঃ—

হরি কাপালীর দু'খানা মেটে ঘর, এক দিকে পুঁই মাচা, এক দিকে বেড়ার মধ্যে লালডাঁটা, ঝিঙে ও বেগুনের চাষ। পুঁই মাচার পাশে ছোট্ট চালার নিচে ঢেঁকি পাতা। সেখানে জড়ো হয়েচে হরি কাপালীর বড়-বৌ, আরও পাড়ার

দু-তিনটি ঝি-বৌ। ঢেঁকিঘরের চার পাশে বর্ষাপুষ্ট বনকচুর ঝাড়, ধুতরো গাছ, আদাড় বাগ গাছে রাঙা রাঙা মটর ফল, ঢেঁকি ঘরের চালে তেলাকুচো লতা উঠে দুলচে, বর্ষাসজল হাওয়ায় কাঁচা লতাপাতার গন্ধ।

অনঙ্গ-বৌ আর ছোট-বৌ, সেখানে পৌঁছতে সবাই খুব খুশি।

বড় বৌ বললে—এসো বামুন-বৌ তুমি না এলি ঢেঁকশেলের মজলিশ আমাদের জমে না—

ক্ষিতুরী কাপালী বললে—যা বললে দিদি, ঠাকুরুন-দিদি আমাদের ঢেঁকশেল আলো করে থাকেন। আমাদের বুকের মধ্যি হু-হু-করতি থাকে উনি না এলি—

অনঙ্গ-বৌ হেসে বললে—তোমাদের যে বড্ড দরদ দেখচি—

ছোট-বৌ বললে—আমিও তা বলছিলাম, বামুন-বৌয়ের রাঙা পায়ের তলায় পড়ে আমি মরতি পারি—

বড়-বৌ বললে—সে তো ভাগ্যি—বামুনের এইস্ত্রী বৌয়ের পায়ে মরবার ভাগ্যি চাইরে ছুটকি। সে এমনি হয় না।

এদের দুপুরের মজলিশ জমে উঠলো।

কাপালীপাড়ার বৌ-ঝিয়েদের এই একমাত্র আমোদ-আহ্লাদের স্থান। এখানে না এলে ওদের দুপুরটা মিথ্যে হয়ে যায় যেন। পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থঘরের মেয়ে, দুপুরে ওদের দিবানিদ্রার অভ্যেস নেই, সময়ও পায় না। ধান ভানা চিঁড়ে কোটাতেই অবসর সময় কেটে যায়, ওর মধ্যেই এদের আড্ডা, গল্পগুজব যা কিছু।

অনঙ্গ-বৌ বললে—বড়-বৌ ও ধান কাদের?

—বাল উনি কোত্থেকে কত কষ্টে পাঁচ কাঠা ধান এনেলেন—কিন্তু শুনচি ধান নাকি সব গবরমেণ্টে নিয়ে যাচ্চে?

—কে বললে?

—উনি কাল হাট থেকে নাকি শুনে এয়েচেন।

ছোট-বৌ বললে—ওসব কথা এখন রাখো দিদি। বামুন-বৌয়ের জন্যে একটা পান সেজে নিয়ে এসো দিকি।

—পান আছে, সুপুরি নেই যে? কাল হাটে একটা সুপুরির দাম দুপয়সা।

সিদ্ধেশ্বর কামারের বৌ বললে—হ্যাঁ দিদি, নাকি আজকাল খেজুরের বীচি দিয়ে পান সাজা হচ্চে সুপুরির বদলে?

অনঙ্গ-বৌ বললে—সত্যি ?

কামার-বৌ বললে—সত্যি মিথ্যে জানিনে ঠাকরুন-দিদি। মিথ্যে কথা বলে শেষকালে বামুনের কাছে, নরকে পচে মরবো ? কানে যা শুনিচি—বললাম।

কথা শেষে সে হাতের এক রকম সুন্দর ভঙ্গি করে মৃদু হাসলো।

এই ঢেঁকিশালের মজলিশে অনঙ্গ-বৌয়ের পরে দেখতে ভালো হরি কাপালীর ছোট-বৌ তার পরেই এই কামার-বৌ। এর বয়েস আরও কম ছোট-বৌয়ের চেয়ে, রংও আর একটু ফর্সা—তবে ছোট-বৌয়ের মুখশ্রী এর চেয়ে ভালো। কামার-বৌ সম্বন্ধে গ্রামে একটু বদনাম আছে, সে অনেক ছেলে-ছোকরার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবার জন্যে দায়ী, অনেককে প্রশ্রয়ও দেয়। কিন্তু ছোট-বৌ সম্বন্ধে সে কথা কেউ বলতে পারে না। অনঙ্গ-বৌ বললে—পোড়া কপাল পান খাওয়ার। খেজুরের বীচি দিয়ে পান খেতে যাচ্চি নে।

ক্ষিতুরী কাপালী শুনে হেসে খুন হয় আর কি। সে বিনোদ মোড়লের বিধবা বোন, ছাব্বিশ-সাতাস বছর বয়েস, আধফর্সা থান পরে এসেচে, দেখতে শুনতে নিতান্ত ভালও নয়, খুব মন্দও নয়। কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়া ওর একটা রোগের মধ্যে গণ্য।

অনঙ্গ-বৌয়ের হাসি পেল ক্ষিতুরীর হাসি দেখে।

হাসতে হাসতে বললে—নে, বাপু থাম – তুই আবার জ্বালালি দেখচি—এত হাসিও তোর !

ছোট-বৌ ঠোঁট উল্টে বললে—ওই বোঝো।

ইতিমধ্যে বড় বৌ কি ভাবে দুটো পান সেজে নিচু ঘরের দাওয়ায় ধাপ থেকে নামলো।

ছোট-বৌ বললে—বিনি সুপুরিতে দিদি ?

বড়-বৌ ঝঙ্কার দিয়ে বললে—ওরে না না। খুঁজে পেতে ঘর থেকে উটকে বার করলাম।

—কোথায় ছিল ?

—তোকে বলবো কেন ?

—কেন ?

—তুই সর্বস্ব উটকে বের করবি। তোর জ্বালায় ঘরে কিছু থাকবার জো আছে ? আমি যাই গিন্নী, তাই সব জিনিস যোগাড় করে তুলে লুকিয়ে রেখে দি। আর তুই সব উটকে উটকে বার করিস।

ছোট-বৌ চোখ পাকিয়ে ভুরু তুলে বললে—আমি ?

—হ্যাঁ, তুই। আমি কাউকে ভয় করে কথা বলবো নাকি ? তুই ছাড়া আর কে ?

—তুমি দেখেচ দিদি ?

—দেখিনি, একশো দিন দেখিচি। বলি, ঘর বলতি দুখানা বাতাসা রেখে দিইছিলাম, ওমা সেদিন দেখি নেই সেটুকু। তুই চুরি করে খেয়েচিস। কে ঘরে ঢুকতে গিয়েচে তুই ছাড়া ? ছেলেপিলের বালাই নেই যখন বাড়ীতে।

কথাটা বোধ হয় নিতান্ত মিথ্যে নয়, কারণ এই কথার পরে ছোট-বৌয়ের কথার সুর ও তেজ কমে গেল। সে বললে—খেইচি যাও, বেশ করিচি আমার জিনিস না ?

—বড্ড যে স্বত্ব দেখাচ্চিস লা !

অনঙ্গ বৌ বললে—আহা, কি তুচ্ছ জিনিস নিয়ে দুবেলা তোমাদের ঝগড়া। থামো না বাপু।

বড়-বৌ বললে—আমি অন্যাই কথাটি বলিচি কি বামুন-বৌ, তুমিই বিচের কর। ঘর বলে জিনিস লুকিয়ে রাখি এই যুদ্ধের বাজারে। তুই সেগুলো উটকে উটকে চুরি করে খাস কেন ?

অনঙ্গ-বৌ বললে—ও ছেলে মানুষ যে বড়-বৌ। তোমার মেয়ে হলে আজ অত বড় মেয়েই হতো। হতো না ?

—আমার মেয়ের পোড়াকপাল !

—ওমা সেকি, পোড়াকপাল কি ? ছোট-বৌ দেখতে সুশ্রী কেমন ? চেয়ে দেখতে পাও না ? দু চোখের কি মাথা খেয়েচ ?

ছোট বৌ হঠাৎ বড় নরম হয়ে গিয়েছিল। সে বললে—নাও নাও বামুন-বৌ, তোমার আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনে !

বড়-বৌ ছোট-বৌয়ের দিকে আড়চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে মুখ চোখ ঘুরিয়ে হাত নেড়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বললে—আহা-হা ! বলি কত ঢং দেখালি লা !

ক্ষিতুরী কাপালী বড়-বৌয়ের চোখ মুখ ঘোরানোর ভঙ্গি দেখে পুনরায় হেসে গড়িয়ে প্রায় ঢেঁকির গড়ের উপর উপুড় হয়ে পড়লো। মুখে অসংলগ্ন ভাবে যা বলতে লাগলো তা অনেকটা এই রকম—ওমা পোড়ানি—বড়-বৌ—হি হি—কি কাণ্ড—হি হি—বলে কিনা—ও বামুনদিদি—হি হি—আমি আর বাঁচবো না—ওমা—হি হি—ইত্যাদি।

কামার বৌ বললে—তা নাও, তুমি আবার যে এক কাণ্ড বাঁধালে! গড়ে কপাল ছেঁচে না যায় দেখো!

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি অবস্থা দেখে অনঙ্গ-বৌ যে এত আশাবাদী, সে পর্যন্ত ভয় খেয়ে গেল। ধান চাল হঠাৎ যেন কর্পূরের মত দেশ থেকে উবে গেল কোথায়! এক দানা চাল কোথাও পাওয়া যায় না; অত বড় গোবিন্দপুরের হাটে চাল আসে না আজকাল। খালি ধামা কাঠা হাতে দলে দলে লোক ফিরে ফিরে যাচ্চে চাল অভাবে। হাহাকার পড়ে গিয়েচে হাটে হাটে। কুণ্ডুদের দোকানে যে এত চাল ছিল, বস্তা সাজানো থাকতো বালির বস্তার মতো, সে গুদাম আজকাল শূন্যগর্ভ। পথেঘাটে ক্রমশঃ ভিখিরীর ভিড় বেড়ে যাচ্চে দিন দিন, এরা এতদিন ছিল কোথায় সকলেই ভাবে, অথচ কেউ জানে না। এ দেশের লোকও নয় এরা, বিদেশী ভিখিরী, একদিন অনঙ্গ-বৌ রান্নাঘরে রান্না করচে, হঠাৎ পাঁচ-ছটি অর্ধউলঙ্গ জীর্ণ শীর্ণ স্ত্রীলোক, সঙ্গে তাদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ বালক-বালিকা—ঘরের দাওয়ার ধারে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো—ফ্যান খাইতাম্—ফ্যান খাইতাম্—

অনঙ্গ প্রথমটা ওদের উচ্চারণের বিকৃতির দরুন কথাটা কি বলা হচ্চে বুঝতে পারলে না। তা ছাড়া 'খাইতাম' এটা যে ক্রিয়াপদের অতীতকালের রূপ এসব দেশে, তা বর্তমানে প্রয়োগ করার সার্থকতা কি, এটা বুঝতেও একটু দেরি হলো।

পরে বুঝলে যখন তখন বললে—একটু দাঁড়াও—ফ্যান দেবো।

ওরা হাঁড়ি, তোবড়ানো টিনের কৌটো পেতে ফ্যান নিয়ে যখন চলে গেল, তখন অনঙ্গ-বৌ কতক্ষণ ওদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েচে নাকি যে দেশ ছেড়ে এদের বিদেশে আসতে হয়চে ছেলেমেয়ের হাত ধরে এক মগ্ ফ্যান ভিক্ষে করতে? অনঙ্গ-বৌয়ের চোখে জল এল। নিজের ছেলেরা পাঠশালায় গিয়েচে, ওদের কথা মনে পড়লো। এতগুলো লোককে ভাত দেওয়ার উপযুক্ত চাল নেই ঘরে, নইলে দিত না হয় ওদের দুটো দুটো ভাত।

ক্রমে নানাস্থান থেকে ভীতিজনক সংবাদ আসতে লাগলো সব। অমুক গ্রামে চাল একদম পাওয়া যাচ্চে না, লোকে না খেয়ে আছে। অমুক গ্রামের

অমুক লোক আজ পাঁচদিন ভাত খায় নি—ইত্যাদি। তবুও সবাই ভাবতে লাগলো, মানুষে কি সত্যি সত্যি না খেয়ে মরে? কখনই নয়। তাদের নিজেদের কোনো বিপদ নেই।

একদিন অনঙ্গ-বৌ খুব ভোরে ঘাটে গিয়ে দেখলে জেলেপাড়ার রয়ে জেলের বৌ ঘাটের ধারের কচুর ডাঁটা তুলে এক বোঝা করেচে।

অনঙ্গ হেসে বললে—কি গা রয়ের-বৌ, আজ বুঝি কচুর শাক খাবে?

জেলে-বৌ যেন ধরা পড়ে একটু চমকে গেল। যেন সে আশা করে নি এত ভোরে কেউ নদীর ঘাটে আসবে। লুকিয়ে লুকিয়ে এ কাজ করছিল সে, এমন একটা ভাব প্রকাশ পেলে ওর ধরনধারণে।

সে মৃদু হেসে বললে—হ্যাঁ, মা।

—তা এত? এ যে দু-তিন বেলার শাক হবে।

—সবাই খাবে মা, তাই।

বলেই কেমন এক অদ্ভুত ধরনে ওর মুখের দিকে চেয়ে জেলে-বৌ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে।

অনঙ্গ-বৌ অবাক হয়ে বললে—ওকি রয়ের-বৌ, কাঁদচিস্ কেন? কি হলো?

রয়ের-বৌ আঁচলে চোখের জল মুছে আস্তে আস্তে বলে—কচ্চি কি সাধে মা? এই ভরসা।

—কি ভরসা?

—এই কচুর শাক মা। তিন দিন আজ কারো পেটে লক্ষীর দানা সেধোঁয় নি।

—বলিস কি রয়ের-বৌ? না খেয়ে—

—নিনক্যি, মা নিনক্যি—তোমার কাছে মিছে কথা বলবো না সকালবেলা। কার দোরে যাবো, কে দেবে মোরে এই যুজ্যের বাজারে। যুজ্যের আক্রা ভাত কার কাছে গিয়ে চাইবো মা? তাই বলি এখনো কেউ ওঠে নি, গাঙের ধারে বড় বড় কচুর ডাঁটা হয়েচে তুলে আনি গে। তাই কি তেল নুন আছে মা? শুধু সেদ্ধ।

অন্নকষ্টের এ মূর্তি কখনো দেখে নি অনঙ্গ। সে ভাবলে—আহা, আমার ঘরে যদি চাল থাকতো! আজ রয়ের-বৌ আর তার ছেলেমেয়েকে কি না খাইয়ে থাকি?

জেলে-বৌ আপন মনেই বলতে লাগলো—এক সের দেড় সের মাছ ধরে।

পয়সা বড় জোর দশ আনা বারো আনা হয়। এক কাঠা চাল কিনতি একটা টাকা যায়—তাও মিলচে না হাটে বাজারে। মোরা গরীব নোক, কি করে চালাই বলো মা—

অনঙ্গ-বৌ আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে বাড়ী গেল। গঙ্গাচরণ ঘুম থেকে উঠে তামাক খেতে বসেচে। স্বামীকে বললে—হ্যাগা, এ কি রকম বাজার পড়লো চালের? ভাত বিনে কি সব উপোস দিতে হবে? আমাদের' ঘরেও তো চাল বাড়ন্ত। আজকাল চালের ধান আর কেউ দেয় না। গা থেকে ধান গেল কোথায়?

গঙ্গাচরণ হেসে বললে— তামার পয়সা যেখানে গিয়েচে।

অনঙ্গ-বৌ রেগে বললে—দ্যাখো ওসব রঙ্গরস ভালো লাগে না। একটা হিল্লে করো—ছেলেপুলে উপোস করে থাকবে শেষে?

গঙ্গাচরণ চিন্তিত মুখে বললে—তাই ভাবচি। আমি কি চুপ করে বসে আছি গা? কি হবে, এ ভাবনা আমারও হয়েচে।

—চারিধারের ব্যাপার দেখে হাত পা পেটের ভেতর ঢুকে যাচ্চে যে—আর বসে থেকো না। উপায় দ্যাখো। তিন দিনের মত চাল ঘরে আছে মজুত—

—আর ধান কতটা আছে?

—সে ভান্‌লে বড় জোর পাঁচ কাঠা চাল হবে। তাতে ধরো আরও দশদিন। তার পরে?

—আমিও তাই ভাবচি।

—যা হয় উপায় করো।

দিন দুই পরে গঙ্গাচরণ পাঠশালা বন্ধ রেখে নরহরিপুরের হাটে গেল চালের সন্ধানে। বিষ্টুপুর, ভাতছালা, সুবর্ণপুর, খড়িদীঘি প্রভৃতি গ্রাম থেকে ধানচাল জড়ো হয়ে আগে আগে নরহরিপুরের প্রসিদ্ধ চালের ও ধানের হাট বোঝাই হয়ে যেতো—সেই হাটের অত বড় চালাঘর খালি পড়ে আছে—এক কোণে বসে শুধু এক বুড়ো সামান্য কিছু চাল বিক্রি করচে।

গঙ্গাচরণ কাছে গিয়ে বললে—কি ধানের চাল?

—কেলে ধান ঠাকুর মশায়। নেবেন? খুব ভালো চাল কেলে ধানের। কথায় বলে—

ধানের মধ্যি কেলে, মানুষের মধ্যি ছেলে—

বুড়ীর কবিত্বের দিকে তত মনোযোগ না দিয়ে গঙ্গাচরণ ওর ধামা থেকে চাল তুলে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। যেমন মোটা, তেমনি গুমো। মানুষের অখাদ্য। তবুও চাল বটে, খেয়ে মানুষে প্রাণ বাঁচাতে পারে।

—কতটা আছে?

—সবটা নেবা তুমি? তিন কাঠা আছে।

—দাম?

—দেড় টাকা করে কাঠা।

গঙ্গাচরণ চমকে উঠলো, ভাবলে কথাটা সে শুনতে পায় নি। আবার জিজ্ঞেস করার পরেও যখন বুড়ী বললে এক কাঠার দাম দেড় টাকা, তখন গঙ্গাচরণের কপালে ঘাম দেখা দিয়েচে। দেড় টাকায় আড়াই সের, তা হলে পড়লো চব্বিশ টাকা মণ। কি সর্বনাশ! অনঙ্গ-বৌ এত দিন পরের বাড়ীর ধান ভেনে চালিয়ে আসছিল বলে সে অনেকদিন হাটে বাজারের চালের দর জানে না। চাল এত চড়ে গিয়েচে তা তো তার জানা ছিল না। চারিদিক অন্ধকার দেখলো গঙ্গাচরণ। এত বড় নরহরিপুরের হাট—ধান চাল শূন্য। মানুষ এবার কি সত্যিই না খেয়ে মরবে? কিসের কুলক্ষণ এসব? পরশুও তো চালের দাম এত ছিল না। দুদিনে ষোল টাকা থেকে উঠলো চব্বিশ টাকা এক মণ চালের দর—তাও এই মোটা, গুমো, মানুষের অখাদ্য আউশ চালের!

গঙ্গাচরণের সারা শরীরটা যেন ঝিম ঝিম করে উঠলো। কি করে সে চালাবে? নিজেদের ধানের ক্ষেত নেই। চব্বিশ টাকা মণের চাল সে কিনে খাওয়াতে পারবে কদিন, বারো টাকা যার মাসিক আয়? অনঙ্গ-বৌ না খেয়ে মরবে? হাবু পটল না খেয়ে—না, আর সে ভাবতে পারে না।

গঙ্গাচরণ চাল নিয়ে বাড়ী ফিরবার পথে দেখলে ধামা কাঠা হাতে আরও অনেকে হাটের দিকে ছুটেচে চালের চেষ্টায়। অনেকে ওকে জিজ্ঞেস করে, চাল কনে পালেন ও পণ্ডিত মশাই? কি দর?

—চব্বিশ টাকা।

—মোটা আশ চাল চব্বিশ? বলেন কি পণ্ডিত মশাই?

—দেখ গে যাও হাটে গিয়ে।

বৃদ্ধ দীনু নন্দী একটা ধামা হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটচে। দীনু নন্দী বাড়ীতে বসে সোনা-রুপোর কাজ করে অর্থাৎ গহনা গড়ে। সোনার কাজ

তত বেশি নয়, চাষা-মহলে গহনার কাজে সোনার চেয়ে রুপোর ব্যবহারই বেশি। কিন্তু এই তুর্দিনে গহনা কে গড়ায়, কাজেই দীনুর ব্যবসা অচল। তুটি বিধবা ভাই-বৌ, বৃদ্ধা মাতা ও কয়েকটি শিশুসন্তান, তৃতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যা তার ঘাড়ে। দীনু বললে—পণ্ডিত মশায়, চাল পাবো ?

—ছুটে যাও। বড্ড ভিড়।

—ছুটি বা কোত্থেকে, পায়ে বাত হয়ে কষ্ট পাচ্চি বড্ড। তুবেলা খাওয়া হয় নি—

—বল কি ?

—সত্যি বলচি পণ্ডিত মশাই। বামুন দেবতা, এই অবেলায় কি মিছে কথা বলে নরকগামী হবো ?

দীনু খোঁড়াতে খোঁড়াতে সজোরে প্রস্থান করলে।

গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরতে ফিরতেই কত লোক শুধু হাতেই হাট থেকে ফিরচে দেখা গেল। সাগরতলার কর্মকারদের বাড়ীতে একটু বসে তামাক খাচ্ছিল, এমন সময় তু-চার জন লোক সেখানে এসে জুটলো গল্প করতে।

একজন বললে—নরহরিপুরের হাটে চাল পাওয়া গেল না, আর কোথায় পাওয়া যাবে বলুন!

আর একজন বললে—লোকও জড়ো হয়েছে হাটে দেখুন গে। এক কাঠা চাল নেই। কেউ তিন দিন, কেউ পাঁচ দিন না খেয়ে আছে। আমারই বাড়ীতে তুদিন ভাত খায় নি কেউ।

গঙ্গাচরণ বললে—আটা ময়দা নিয়ে যে যাবে, তাও নেই।

—বস্তাপচা আটা আছে তু-এক দোকানে, বারো আনা সের। কে খাবে ?

আরও মাইলখানেক এগিয়ে গেল গঙ্গাচরণ। গলসেখালির সনাতন ঘোষ নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে, ওকে দেখে বললে—পণ্ডিত মশাই, ওতে কি ? চাল নাকি ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় পেলেন ?

—সে যা কষ্ট তা আর বোলো না। এক বুড়ীর কাছ থেকে সামান্য কিছু আদায় করেচি, তাও আগুন দর।

—কই দেখি দেখি ?

সনাতন ঘোষ নেমে সে ওর হাতের পুঁটুলিটা নিজের হাতে নিয়ে পুঁটুলি

নিজেই খুলে চাল দেখতে লাগলো। ওর মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল। চালের দানা পরীক্ষা করতে করতে বললে—বড্ড মোটা। কত দর নিলে? একটা কথা বলবো পণ্ডিত মশাই?

—কি?

—দাম আমি যা হয় দিচ্চি। আমায় অর্ধেকটা চাল দিয়ে যান। দিতেই হবে। দুদিন না খেয়ে আছে সবাই। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী থেকে এনে এখন মহা মুশকিল, সে বেচারীর পেটে আজ দুদিন লক্ষ্মীর দানা যায় নি—কত চেষ্টা করেও চাল পাই নি—

সনাতন ঘোষের অবস্থা খারাপ নয়, বাড়ীতে অনেকগুলো গরু, দুধ থেকে ছানা কাটিয়ে নরহরিপুরের ময়রাদের দোকানে যোগান দেয়—এই তার ব্যবসা। গঙ্গাচরণ ইতিপূর্বে সনাতনের বাড়ী থেকে দু-এক খুলি টাটকা ছানা নিয়েও গিয়েচে। তার আজ এই দশা! কিন্তু চাল মাত্র সে নিয়েচে তিন কাঠা। আর কোথাও চাল পাওয়া যাচ্চে না। এ চাল দিলে তার স্ত্রী-পুত্র অনাহারে থাকবে দুদিন পরে। চাল দেওয়ার ইচ্ছে তার মোটেই নেই—এদিকে সনাতন মোক্ষম ধরেচে চালের পুঁটুলি, তার হাত থেকে চাল নিতান্তই ছিনিয়ে নিতে হয় তাহলে। কিংবা ঝগড়া করতে হয়।

সনাতন ততক্ষণে কাকে ডেকে বললে—ওরে একটা ধামা নিয়ে আয় তো বাড়ীর মধ্যে থেকে? একটা কাঠাও নিয়ে আয়—

সনাতন নিজের হাতে এক কাঠা চাল যখন মেপে ঢেলে নিয়েচে, তখন গঙ্গাচরণ মিনতিসূচক ভদ্রতার স্বরে বললে—আর না সনাতন, আর নিও না—

—আর আধ কাঠা—

—না বাপু, আমি আর দিতে পারবো না। বাড়ীতে চাল বাড়ন্ত—বুঝলে না?

সনাতনের নাতিটি বললে—দাদামশাই, ওঁর চাল আর নিও না, দিয়ে দাও।

সনাতন মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলো—তোদের জন্যি বাপু খেটে মরি, নিজের জন্যি কিসের ভাবনা। একটা পেট যে করে হোক চলে যাবেই। রইল পড়ে চাল, যা বুঝিস করগে যা।

রাগ না লক্ষ্মী। গঙ্গাচরণ বিনা চক্ষুলজ্জায় সমস্ত চাল উঠিয়ে নিয়ে চলে এল। বাড়ী এসে দেখলে অনঙ্গ-বৌ ভাত চড়িয়ে ওল কুটতে বসেচে রান্নাঘরের

দাওয়ায়। স্বামীকে দেখে বললে—ওগো শোনো, আমি এক কাজ করিচি। সেদিন সেই বোষ্টম প্রভাতী সুরে গান করছিল মনে আছে? আজ এসেছিল, কি সুন্দর গান যে গায়!

—কে বল তো?

—সেই যে বলে—'উঠ গো উঠ নন্দরাণী কত নিদ্রা যাও গো'—বেশ গলা—লম্বা মত, ফর্সা মত বোষ্টমটি—

—ওর বাড়ী বেনাপোল। বেনাপোলে হরিদাস ঠাকুরের পীঠ আছে, সেখানকার কাজকর্ম করতো। বেশ গায়।

—আমি তাকে বললাম রোজ সকালে এসে আমাদের বাড়ীতে ভগবানের নাম করবে। ভোর বেলায় বড় ভালো লাগে ভগবানের নাম। মাসে এক টাকা আর এক কাঠা চালের একটা সিধে দিতে হবে বলেচে, এই ধরো ডাল, নুন, বড়ি, দুটো আলু, বেগুন, একটু তেল—এই। আমি বলিচি দেবো। কাল থেকে গাইতে আসবে। হ্যাঁগা, রাগ করলে না তো শুনে?

—তোমার যে পাগলামি। বলে, নিজে খেতে জায়গা পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। দেবে কোথা থেকে?

—তুমি ঝগড়া কোরো না। সকালে উঠে ভগবানের নাম শুনবে যে রোজ রোজ তখন? হুঁ-হু—আমি যেখানে থেকে পারি জুটিয়ে দেবো, তুমি ভেবো না কিছু। গরীব বলে কি ভালো গান শুনতে নেই?

পরদিন খুব ভোরে সেই বোষ্টমটি সুস্বরে প্রভাতী গান গাইতে গাইতে ওদের উঠানে এসে দাঁড়ালো। অনঙ্গ-বৌ খুশিতে ভরপুর হয়ে পাশের ঘরে এসে স্বামীকে ডেকে বললে—ওগো শুনচো? কেমন গায়? আর ভগবানের নাম—বেশ লাগে—না?

গঙ্গাচরণ কিছু জবাব না দিয়ে মৃদু হেসে পাশ ফিরে শুয়ে রইল। অনঙ্গ-বৌ-রাগ করে বললে—আহা, ঢং দ্যাখো না! ওগো গান শোনো—তাতে জাত যাবে না।

—আমি কি রাজা যে বন্দীরা প্রভাতী গান গেয়ে আমার ঘুম ভাঙাবে? তোমার পয়সা থাকে তুমি বন্দীদের মাইনে দিয়ো গো রানী। আমি ওর মধ্যে নেই।

—আমার বন্দীর গান যে শুনবে, তাকে পয়সা দিতে হবেই। তবে কানে আঙুল দাও—

গঙ্গাচরণ হেসে কান চেপে ধরে বললে—এই দিলাম।

একটু বেলা হলে অনঙ্গ-বৌ রান্না চড়ালে, তার পরে মনে মনে হিসেব করে দেখলে দিন দশ বারো পরে চাল একেবারে ফুরিয়ে যাবে তখন উপায় কি হবে? চাল নাকি হাটে পাওয়া যাচ্চে না। সবাই বলচে। তার স্বামী নির্বিরোধী মানুষ, কোথা থেকে কি যোগাড় করবে এ দুর্দিনে, ভাবলে মায়া হয়।

কাপালীদের ছোট-বৌ চুপি চুপি এসে বললে—বামুন-দিদি, একটা কথা বলবো? এক খুঁচি চাল ধার দিতি পারো?

—মুশকিল করলি ছোট-বৌ। তোদের চাল কি বাড়ন্ত?

—মোটে নেই। কাল ছোলা সেদ্ধ খেয়ে সব আছে। না হয় ছোট ছেলেটিকে দুটি ভাত দিও এখন দিদি। আমরা যা হয় করবো এখন।

অনঙ্গ-বৌ কি ভেবে বললে—একটু দাঁড়া। এসেচিস যখন তখন নিয়ে যা এক খুঁচি চাল। ওতে আমাদের কতদিনের সাশ্রয় বা হতো?

কাপালী-বৌ চাল আঁচল পেতে নিয়ে বললে—এক জায়গায় কচুব শাক আছে তুলতে যাবে বামুন-দিদি? গেরামে তো কচুর শাক নেই—যে যেখান থেকে পারচে তুলে নিয়ে যাচ্চে। গাঙের ধারে এক জায়গায় সন্ধান করিচি, ঢের কচুর শাক হয়ে আছে। দুজনে চলো চুপি চুপি তুলে আনি।

—চল্‌, আজ দুপুরে যাবো। চাল তো নেই। যা দেখচি ওই খেয়েই থাকতে হবে দুদিন পরে।

কাপালী-বৌ হেসে বুড়ো আঙুল তুলে নাচিয়ে বললে—লবডঙ্কা! তাই বা কোথায় পাচ্চ বামুন-দিদি? কাওরা পাড়ার মাগী-মিন্সে এসে গাঙের ধারের যত সুষনি শাক, কলমি শাক, হেলেঞ্চা শাক, তুলে উজোড় করে নিয়ে যাচ্চে দিনরাত। গিয়ে দ্যাখো গে কোথাও নেই। আমি কি খোঁজ করি নি বামুন-দিদি? ওই খেয়ে আজ দুদিন বেঁচে আছি—ওই সব শাক আর ছোলা সেদ্ধ। তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলে বড়াই করে কি করবো?

বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী মিটিং বসেচে।

বর্তমান সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্যেই মিটিং, তবে কাপালীপাড়ার লোক ছাড়া অন্য কোনো লোক এতে উপস্থিত নেই। ক্ষেত্র কাপালী বললে—এখন ধান আমাদের দেবেন কিনা বলুন বিশ্বেস মশায়।

বিশ্বাস মশায় অনেকক্ষণ থেকে সেই একই কথা বলচেন—ধান নেই, তার দেবো কি। আমার গোলা খুঁজে ছাখো।

অধর কাপালী বললে—আমাদের পাড়াটা আপনি কর্জ দিয়ে বেঁচিয়ে রাখুন। আসচে বারে আপনার ধার এক দানাও বাকি রাখবো না।

বিশ্বাস মশায়ের বাঁ-দিকে গঙ্গাচরণ অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে। সে এসেছিল ধানচাল সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা যায় কি না বিশ্বাস মশায়ের সাহায্যে, সেই চেষ্টায়। এত বড় মিটিং-এর মধ্যে এসে পড়বে তা সে ভাবে নি। সে চুপ করে বসেই আছে।

হঠাৎ তার দিকে ফিরেই বিশ্বাস মশায় বললেন—পণ্ডিত মশাই, আপনি এই নিন গোলার চাবি। এদের গিয়ে খুলে দেখান ওতে কি আছে—

বিশ্বাস মশায় চাবিটা গঙ্গাচরণের সামনে ছুড়ে ফেলে দিতেই ক্ষেত্র কাপালী বলে উঠলো—গোলা দেখতে হবে না। আমরা জানি ও গোলাতে আপনার ধান নেই।

চটে উঠে বিশ্বাস মশায় বললেন—তবে কোথায় আছে ?

—আপনি ধান লুকিয়ে রেখেছেন বাড়ীতে।

—তুমি দেখেচ ?

—দেখতে হবে না, আমরা জানি।

কথা শেষ করে ক্ষেত্র কাপালী মিটিং ছেড়ে উঠে চলে গেল।

অধর কাপালী অনুনয়ের স্বরে বললে—শুনুন, বিশ্বেস মশায়, আপনি পাড়ার মা-বাপ। এ বিপদে যদি আপনি না বাঁচান, তবে ছেলেপিলে নিই কোথায় দাঁড়াই বলুন দিকি ? অমন করবেন না। ধানের ব্যবস্থা আজ করে দিতেই হবে আপনাকে।

বিশ্বাস মশায় দাঁত খিঁচিয়ে বললেন—অমনি বলে সবাই। তুমি তো আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্দি হলে—তারপর ঠ্যালা সামলায় কে শুনি ? ধান আমার নেই।

—একটু দয়া করুন—একটু আমাদের দিকে চান। আজ দুদিন বাড়ীতে একটা চালের দানা কারো পেটে যাই নি, সত্যি বলচি।

—বেশ, তুমি আধ কাঠা চাল আমার ঘর থেকে নিয়ে যাও না, তাতে কি ? না হয় আমি এক মুঠো কম খাবো। সে কথা তো বল্লিই হয়, কি বলেন ঠাকুর মশাই ?

গঙ্গাচরণ চুপ করে রইল, এ কথায় সায় দিলে পাড়ায় লোকে তার ওপর চটে যাবে, সবাইকে নিয়ে বাস করতে হবে যখন, কাউকে সে চটাতে চায় না।

সভা বেশিক্ষণ চললো না। বিশ্বাস মশায়ের কাছে যারা দরবার করতে এসেছিল, সবাই বুঝলে এখানে ডাল গলানো শক্ত। যে যার বাড়ী চলে গেল।

গঙ্গাচরণ সুযোগ পেয়ে বললে—বিশ্বাস মশায়, আমি কি না খেয়ে মরবো?

—কেন?

—বাজারে চাল অমিল। আর দুদিন পরে উপোস শুরু হবে। কি করি পরামর্শ দিন।

—আমার বাড়ী থেকে দুকাঠা চাল নিয়ে যাবেন।

—তা দিয়ে কদিন চলবে বলুন।

—কেন বলুন?

—আমার বাড়ীর পুষ্যি দুতিন জন। ও দুকাঠা চাল নিয়ে কদিন খাবো? আমার স্থায়ী একটা ব্যবস্থা না করলে এই বিপদের দিনে আমি কোথায় যাই? পাঠশালা চালাই কি খেয়ে?

—আমার ধানচাল থাকতো তো বলতে পারা যেতো কিন্তু আমার তা নেই। আজ দুকাঠা চাল নিয়ে যান দিচ্চি—

গঙ্গাচরণ চাল নিয়ে চলে গেল।

সে রাত্রে বিশ্বাস মশায় আহারাদির পর পুকুরপাড় থেকে গরু আনতে গিয়েছেন, কারণ সেখানেই তার গোয়াল—এমন সময় দুজন লোককে গাছের আড়ালে দেখে বলে উঠলেন—ওখানে কে?

—তোর বাবা—

সঙ্গে সঙ্গে তারা এসে বিশ্বাস মশায়ের মাথায় সজোরে এক লাঠি বসিয়ে দিলে। এর পর ওরা তাঁকে পুকুরপাড়ের বাবলা গাছের সঙ্গে মোটা দড়া দিয়ে বেঁধে ফেললে। বিশ্বাস মশায়ের জ্ঞান রইল না বেশিক্ষণ, মাথার যন্ত্রণায় ও রক্তপাতে।

জ্ঞান হয়ে প্রথমেই দেখলেন সূর্যের আলো জানলা দিয়ে এসে পড়েচে, তাঁর বিধবা বড় মেয়ে তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাঁদচে।

বিশ্বাস মশায় বলে উঠলেন—ডাকাত! ডাকাত!

বড় মেয়ে সৌদামিনী বললে—ভয় কি বাবা? আমি—আমি যে—এই ছাখো।

বিশ্বাস মশায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলেন।

সৌদামিনী বললে—বাবা কেমন আছ?

বিশ্বাস মশায় একবার ডাইনে বাঁয়ে সতর্কতার সঙ্গে চেয়ে দেখে চুপি চুপি বললে—সব নিয়ে গিয়েছে?

—কি বাবা?

—সেই সব।

—তুমি কিছু ভেবো না বাবা। সব ঠিক আছে।

—সেই যা আড়ায় তোলা আছে? বস্তা?

—কিছু নেয় নি।

—আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখা মা—

সৌদামিনী বাপের মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন—তুমি সেরে সেমলে ওঠো, আমি কি মিথ্যে বলচি তোমারে? আড়ার ওপর যে বস্তা রেখিলে তা কেউ নেয় নি।

—তক্তাপোশের তলায় যে বস্তা ছিল?

—সব ঠিক আছে। নেবে কে?

এই সময় গঙ্গাচরণ ঘরে ঢোকাতে ওদের কথা বন্ধ হয়ে গেল।

গঙ্গাচরণ পাশে বসে বললে—কেমন আছেন বিশ্বেস মশায়?

—আছি এক রকম।

গঙ্গাচরণ মুরুব্বিয়ানা ভাবে বললে—হাতটা দেখি—

পরে বিজ্ঞের মত মুখ করে বিশ্বাস মশায়ের নাড়ি পরীক্ষা করে বললে—হুঁ—

সৌদামিনী উদ্বিগ্ন স্বরে বললে—কি রকম দেখলেন পণ্ডিত মশাই?

—ভালো। তবে কফের ধাত একটু প্রবল হয়েছে।

সৌদামিনী উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলে—তাতে কি হয়?

—হবে আর কি। তবে বয়েস হয়েচে কিনা, কফের আধিক্য—

—ভালো করে বলুন।

—মানে জিনিসটা ভালো না।

বিশ্বাস মশায় স্বয়ং এবার মিনতির সুরে বললেন—আমাকে এবারটা চাঙ্গা করে তুলুন পণ্ডিত মশাই। আপনি দশ সের চাল নিয়ে যাবেন।

—থাক থাক তার জন্যে কি হয়েচে?

সৌদামিনী কিন্তু ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে উঠলো—না, আজই নিয়ে যাবেন'খন। ধামা আমি দেবো।

বিশ্বাস মশায় বললেন—এখন না। সন্দের পরে। কেউ টের না পায়।

গঙ্গাচরণ এ অঞ্চলে কবিরাজিও করে। কিন্তু কবিরাজি এখানে ভালো চলে না—কারণ এখানকার সবার 'সারকুমারী মত'। সে এক অদ্ভুত চিকিৎসার প্রণালী। জ্বর যত বেশিই হোক, তাতে স্নানাহারের কোনো বাধা নেই। দুচার জন সেরেও ওঠে, বেশির ভাগই মরে। তবু ও মতের লোক কখনো ডাক্তার বা কবিরাজ দেখাবে না, মরে গেলেও না।

গঙ্গাচরণ কথাটা জানে, তাই বললে—আপনার সেই সারকুমারী মতের ফকির আসবে নাকি ?

—নাঃ। সেবার জলজ্যান্ত নাতিটাকে মেরে ফেললে। আমি ও-মতে আর নেই।

—ঠিক তো ? দেখুন, তবে আমি চিকিচ্ছে করি মন দিয়ে।

সৌদামিনী বলে উঠলো—আপনি দেখুন ভালো করে। আমি ও-মতে আর কাউকে যেতে দেবো না এ বাড়ীতে। চাল নিয়ে যাবেন সন্দের পরে।

দিন দুই পরে বিশ্বাস মশায় একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। একদিন গঙ্গাচরণ গিয়ে দেখলে বিশ্বাস মশায় বিছানায় উঠে বসে তামাক খাচ্চেন। গঙ্গাচরণ শুনলে, এ গ্রাম থেকে বিশ্বাস মশায় উঠে যাচ্চেন। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্চে। বাইরে আট-দশখানা গরুর গাড়ীর চাকার দাগ। রাত্রে এই গাড়ীগুলি যাতায়াত করেচে বলেই মনে হয়। গঙ্গাচরণ বুঝতে পারলে বিশ্বাস মশায় মজুদ ধান চাল সব সরিয়ে দিয়েছেন রাতারাতি।

গঙ্গাচরণ বললে—কোথায় যাবেন চলে নিজের গাঁ ছেড়ে ?

বিশ্বাস মশায় বললেন—আপাতোক যাচ্চি গঙ্গানন্দপুর, আমার শ্বশুরবাড়ী। এ গাঁয়ে আর থাকবো না। এ ডাকাতের দেশ। সামান্য দুচার মণ ধান চাল কে না ঘরে রাখে বলুন তো পণ্ডিত মশায়। তার জন্যে মানুষ খুন ? আজ ফসকে গিয়েচে, কাল যে খুন করবে না তার ঠিক কি ? না, এ দেশের খুরে নমস্কার বাবা।

—আপনার জমিজমা পুকুর এ সবের কি ব্যবস্থা হবে ?

আমার ভাগ্নে দুর্গাপদ মাঝে মাঝে আসবে যাবে। সে দেখাশুনো করবে।

আমি আর এমুখো হচ্চি নে কখনো। ঢের হয়েচে। ভালো কথা, একটা ভালো দিন দেখে দেবেন তো যাবার?

বুধবার সকালবেলা বিশ্বাস মশায় সত্যসত্যই জিনিসপত্র সমেত নতুন গাঁ কাপালী-পাড়ার বাস উঠিয়ে চলে গেলেন।

অনঙ্গ-বৌ শুনে বললে—এই বিপদের দিনে তবুও ওই একটা ভরসা ছিল। কোথাও চাল না পাওয়া যায়, ওখানে তবু পাওয়া যেতো। এবার গাঁয়ের খুব দুর্দশা হবে। একদানা ধানচাল কারো ঘরে রইল না আর। ভয়ে পড়েই লোকটা চলে গেল।

শ্রাবণ মাসের শেষ।

বেড়ায় বেড়ায় তিৎপল্লার ফুল ফুটেচে। কোঁচ বকের লম্বা সারি নদীর ওপর উড়ে যায় এপার থেকে ওপারের দিকে।

অনঙ্গ-বৌ নদীর ঘাটে জল তুলতে গিয়েচে। ভূষণ ঘোষের বৌ এক জায়গায় হাবড় কাদার উপর ঝুকে পড়ে কি করচে। অনঙ্গ-বৌকে দেখে সে যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে গেল। যেন এ অবস্থায় কারো সঙ্গে না দেখা হওয়াই ভালো ছিল, ভাবটা এমন।

অনঙ্গ-বৌ কৌতূহলের সঙ্গে বললে—কি হচ্ছে গো গয়লা-দিদি?

ভূষণ ঘোষের বৌয়ের বয়স বেশী নয়, অনঙ্গ-বৌয়ের সমবয়সী কিংবা দু-এক বছরের বড় হতেও পারে। আঁচলে কি একটা ঢেকে সলজ্জভাবে বললে—কিছু না ভাই—

—কিছু না তবে ওখানে কি হচ্চে তোমার মরণ?

—এমনি।

—তবুও?

—সুষনি শাক তুলচি—

বলেই হঠাৎ সলজ্জ হাসি হেসে আঁচল দেখিয়ে বললে—মিথ্যে কথা বলবো না বামুনের মেয়ের সামনে। এই গ্যাখো—

অনঙ্গ-বৌ বিস্ময়ের সঙ্গে বললে—ও কি হবে? হাঁস আছে বুঝি?

গয়লা-বৌয়ের আঁচলে এক রাশ কাদামাখা গেঁড়ি-গুগলি। সে বললে—হাঁস নয় ভাই, আমরাই খাবো।

—ও কি করে খায়?

—এমনি! শাঁস বের করে ঝাল-চচ্চড়ি হবে।

—সত্যি?

—অনেকে খায়, তুমি জানো না? আমরা শপ করে খাই ভাই।

—কি করে রাঁধে আমাকে বলে দিও তো?

—না ভাই। তুমি খেতে যাবে কি দুঃখে? তোমাকে বলে দেবো না।

সেদিনই একটু বেলা হলে কাপালীদের ছোট-বৌ এসে বললে—এক খুঁচি চাল ধার দিতে পারো ভাই? বড্ড লজ্জায় পড়িচি—

অনঙ্গ-বৌ বললে—কি ভাই?

—ভূষণ কাকার বৌ এসেচে দুটো চাল নিতি। দুদিন ভাত পেটে যায় নি। দুটো গেঁড়ি-গুগলি তুলে এনেচে সেদ্দ করে খাবে। কিন্তু দুটো চাল নেই—আমার বাড়ী এসেচে—তা বলে, তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে—

—আমারও চাল নেই ভাই।

—দুটো একটা হবে না?

—আছে, দেবার মত নেই। তোর কাছে লুকুবো না। সের চারেক চাল আছে, তা থেকে দেবো না। তিন বেলার খোরাকও নেই।

কাপালী-বৌ বসে পড়ে গালে হাত দিয়ে টেনে টেনে বললে—তাই তো, কি হবে উপায় দিদি? চাল তো কোথাও নেই। কি করি বল তো?

অনঙ্গ বৌ বললে—ছিল বিশ্বেস মশায়, তার ঘরে যা হয় দুটো ধান চাল ছিল। সেও চলে গেল—

—আমরাও তো তাই বলি—

—তবে কোন্ সাহসে চাল দেবো বের করে?

—তা তো সত্যি কথাই।

হঠাৎ অনঙ্গ-বৌ হেসে বললে—রাগ করলি ভাই ছোট-বৌ?

—না ভাই, এর মধ্যে রাগ কিসের?

—আঁচল পাত্। চাল নিয়ে যা—

—তোমাদের?

—যা হয় হবে। তবু থাকতে দেবো না তা কি হয়? নিয়ে যা—

দিন কতক পরে চালের ঘোর অনটন লোকের ঘরে ঘরে। প্রত্যেকে

প্রত্যেকের বাড়ী এসে চাল ধার চায়, কে কাকে দেবে? অনঙ্গ-বৌ দুদিন ছেলেদের মুখে ভাত দিতে পারলে না, শুধু সজনে শাক সেদ্ধ। একদিন এসে কাপালী-বৌ দুটো সুষনি শাক দিয়ে গেল, একদিন গঙ্গাচরণ কোথা থেকে একখানা থোড নিয়ে এল। ভাতের ফ্যান চেয়ে ঘরে ঘরে ফিরচে [illegible] জেলা থেকে আগত মেয়েপুরুষ। গ্রামে হাহাকার পড়ে গেল।

সন্ধ্যাব দিকে রামলাল কাপালী এসে গঙ্গাচরণকে চুপি চুপি বললে—পণ্ডিত মশায়, চাল নেবেন?

গঙ্গাচরণ বিস্ময়ের সুরে বললে—কোথায়?

—মেটেবা বাজিতপুর থেকে আমার শ্বশুব এক বস্তা চাল নিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে এসেচেন আমার বাড়ী। দেড মণ চাল, বেনা মুড়ি ধানের ভালো চাল। ছোট-বৌ বললে—বামুন-দিদির বাড়ী বলে এসো।

—কি দর?

—শ্বশুব বলচেন চল্লিশ টাকা করে মণ—

—আউশ চালেব মণ চল্লিশ টাকা?

—তাই মিলচে না দাদাঠাকুর। আপনি তো সব জানো।

গঙ্গাচবণ ইতস্তত: করতে লাগলো। দুগাছা পাতলা রুলি আছে অনঙ্গ-বৌয়ের হাতে। একবার গেলে আর হবে না।

কিন্তু উপায় কি? ছেলেপুলেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো? বাড়ীতে এসে স্ত্রীর কাছে বলতেই তখুনি সে খুলে দিলে। এক মণ চালই এসে ঘরে উঠলো।

রামলাল কাপালী বলে দিলে—চুপি চুপি নিয়ে যাবেন দাদাঠাকুর।

সন্ধ্যার অনেক পবে চাল নিয়ে আসতে গিয়ে গঙ্গাচরণ ও তার দুই ছেলে পড়ে গেল নিমাই জেলের সামনে। সে নদীতে যাচ্চে আলোর মাছ ধরতে। ওদের দেখে বললে—কে?

গঙ্গাচরণ বললে—এই আমরা।

—কে পণ্ডিত মশাই? পেন্নাম হই। কি ওতে?

—ও আছে।

—ধান বুঝি—পণ্ডিত মশাই?

—হাঁ।

নিমাই জেলের বিধবা মেয়ে পরদিন ভোর না হতে এসে হাজির। না

খেয়ে মারা যাচ্ছে ওরা, দুটো ধান দিতে হবে। অনঙ্গ-বৌ মিথ্যে কথা বলতে তেমন পারে না, না ভেবেই বলে বসলো—ধান তো নেই ঘরে, চাল এনেছিলেন কিনে উনি।

—তাই দুটো দ্যান বামুন-দিদি, না খেয়ে মরচি।

দিতে হলো। ঘরে থাকলে না দিয়ে পারা যায় না। ফলে দলে দলে এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে লোক আসতে লাগলো। কেউ ভাত দাও, কেউ চাল দাও দুটি। এক মণ চাল দশ দিনে উঠে গেল, মাঝে পড়ে অনঙ্গ-বৌয়ের শেষ সম্বল রুলি দুগাছা অনন্তের পথে যাত্রা করলো।

ইতিমধ্যে একদিন ভাতছালা থেকে মতি মুচিনী এসে হাজির।

অনঙ্গ-বৌ বললে—কি রে মতি? আয় আয়—

মতি গলায় আঁচল দিয়ে দূর থেকে প্রণাম করে বললে—গড় করি দিদি-ঠাকুরুন।

—কি রকম আছিস্? এ রকম বিচ্ছিরি রোগা কেন?

—ভালো না দিদি-ঠাকরুন। না খেয়ে খেয়ে এমনি দশা।

—তোদের ওখানেও মন্বন্তর?

—বলেন কি দিদি ঠাকরুন, অত বড় মুচিপাড়ার মধ্যে লোক নেই। সব পালিয়েচে।

—কোথায়?

—যে দিকি দুচোখ যায়। দিদি ঠাকরুন, সাতদিন ভাত খাই নি, শুধু চুনো মাছ ধরতাম আর গেঁড়ি-গুগলি। তাও এদানি মেলে না। ভাতছালার সেই বিলির জল ঘোল দই। শুধু দ্যাখো মুচিপাড়া, বাগদিপাড়ার মেয়ে-ছেলে বৌ-ঝি সব সেই একগলা জলে নেমে চুনো মাছ আর গেঁড়ি-গুগলি ধরচে। সব ফুরিয়ে শেষ হয়ে গেল। আর আধ পোয়া মাছও হয় না। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ডাঙায় বসে কাঁদছে। ওদের মা কাঁচা গেঁড়ি-গুগলি তুলে ওদের মুখে দিয়ে কান্না থামিয়ে এসে আবার জলে নেমেচে। কত মরে গেল ওই সব খেয়ে। নেতু বুনোর ছোট মেয়েটা তো ধড়ফড় করে মরে গেল পেটের অসুখে।

—বলিস কি মতি?

—আর বলবো কি। অত বড় মুচিপাড়া ভেঙে গিয়েচে দিদি-ঠাকরুন।

—কেন?

—কে কোথায় চলে গেল। না খেয়ে কদিন থাকা যায় বলুন? যার চোক যেদিকে যায় বেরিয়ে পড়েচে। আমার ভাই দুটো, অমন জোয়ান ভাইপো দুটো না খেয়ে খেয়ে এমনি খ্যাংরা কাটি—তারপর কোন দিকি যে তারা চলে গেল তা জানি নে। আহা, অমন জোয়ান দুই ভাইপো!—আর এই দ্যাখো আমার শরীল—

হাত দুটো বের করে দেখিয়ে মতি মুচিনী হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো।

অনঙ্গ-বৌ তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে বললে—কাঁদিস্ নি মতি। জল খা একটু গুড় দি। ভাত দেবো। কদিন খাস নি?

মতি দুহাতের আঙুল ফাঁক করে বললে—সাত দিন।

শেষ পর্যন্ত মতি মুচিনীর অবস্থা অনঙ্গ-বৌয়ের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিলে।

না খেয়েও তাহলে মানুষ কষ্ট পায়, নয় তো ভাতছালার অতগুলো মুচির অবস্থা আজ এরকম হলো কি করে?

এই অসময়ে আবার এক দিন এসে পড়লো কামদেবপুরের দুর্গা পণ্ডিত।

সেদিন অনঙ্গ-বৌ দুটো সুষনি শাক তুলে এনেচে নোনাতলার জোল থেকে, সে যেন এক পরম প্রাপ্তি। খুব বেলা গেলে কাপালীদের ছোট-বৌ সেদিন ডাকলে—ও বামুন-দিদি, চলো এক জায়গায়—

—কোথায় রে ছুটকি?

—নোনাতলার জোলে—

—কেন রে, এত বেলা গেলে নোনাতলার জোলে? তোর নাগর বুঝি লুকিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করবে?

—আ মরণ বামুন-দিদির। সোয়ামী আছে না আমার? অমন বুঝি বলতি আছে সোয়ামী যাদের আছে তাদের? তোমরা রূপসী বৌ, তোমাদের নাগর থাকুক, আমার দিকি কে তাকাবে তোমরা থাকতি? তা না গো—সুষনি শাক হয়েচে অনেক, লুকিয়ে তুলে আনি চলো। কেউ এখনো টের পায় নি। টের পেলে আর থাকবে না।

নোনাতলার জোল গ্রামের পেছন দিকের বাঁশবন আমতলার পেছনে ঘন ঝোপে ঘেরা জায়গা। বর্ষাকালে নিচু জায়গাতে জল বাধে—এখন জল নেই—শরতের শেষে জলাশয় শুকিয়ে উঠচে। ভিজে মাটির ওপর নতুন সুষনি শাক

এক রাশ গজিয়েচে দেখে অনঙ্গ-বৌয়ের মুখে হাসি ধরে না। বললে—এ যে ভাই অনেক!

কাপালী-বৌ হাসতে হাসতে বললে—একেই বলে কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখানো!

—তা হোক, কারো চুরি তো করচি নে।

—ভগমানের জিনিস হয়ে আছে, তুলে খাও। এখনো কেউ টের পাই নি তাই রক্ষে। নইলে ভেসে যেতো সব এতদিন।

অনঙ্গ-বৌ আবার ভীতু মেয়ে, একটা শেয়াল ঝোপের দিকে খসখস করতেই চমকে উঠে বলে উঠলো—কি রে কাপালী-বৌ, বাঘ না তো?

—বাঘ না তোমার মুণ্ডু বামুন-দিদি। ছাখো না চেয়ে—

—তুই কি করে এ বনলা জায়গায় শাকের সন্ধান পেলি? সত্যি কথা বল্ ছুটকি—

অনঙ্গ-বৌ কাপালীদের ছোট-বউয়ের স্বভাবচরিত্রের কথা কিছু কিছু না জানতো এমন নয়। গোড়া থেকেই ওর মনে সন্দেহ না হয়েছিল এমন নয়।

কাপালী-বৌ হাসতে হাসতে বললে—দূর—

—আবার ঢাকছিস? এখানে তুই কি করে এলি রে? কখন এলি রে? কখন এলি? এখানে মানুষ আসে?

—এ্যালাম।

—কেন এলি?

কাপালী-বৌয়ের মুখ সলজ্জ হয়ে উঠলো। বললে—এমনি।

—মিথ্যে কথা। এমনি নয়। বলি, হ্যাঁরে ছুটকি, তোর ও স্বভাব গেল না? ভারি খারাপ ওসব, জানিস্? স্বামীকে ঠকিয়ে ওসব কখনো করতে তোর মন সরে? ছিঃ—

কাপালী-বৌ চুপ করে রইল। অন্য কেউ এমন কথা বললে সে রেগে ঝগড়া-ঝাঁটি করতো, কিন্তু অনঙ্গ-বৌয়ের মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে কারো সাধ্য হয় না তার মুখের উপর কথা কইতে। বিশেষ করে যখন সে একটা এমন ধরনের ব্যাপারের প্রতিবাদ করচে।

অনঙ্গ বৌ বললে—না সত্যি ছুটকি, তুই রাগ করিস নে। আমি ঠিক তোরে বলচি—

কাপালী-বৌ ঝাঁকি মেরে মুখ ওপরের দিকে ফুটন্ত ফুলের মত তুলে বললে—আমি কি আসতে চাই ? আমাকে ছাড়ে না যে—

—কে ?

—নাম নাই বললাম বউ-দিদি ?

—বেশ যাক্ সে। না ছাড়লেই তুই অমনি আস্‌বি ?

—আমারে চাল যোগাড় করে এনে দেয়। সত্যি, বউ-দিদি তুমি সতী নক্ষি ভাগ্যিমানি—মিথ্যে বলবো না তোমার কাছে, বামুন দেবতা। সেদিন আমি না খেয়ে উপোস করে আর পারি নে। খিদে সহ্যি করতে পারি নে ছেলেবেলা থেকি। বাপ মা থাকতি, সকাল সকাল এক পাথর পান্ত ভাত ছুটো কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে বেড়ে দিত। খেতাম পেট ভরে।

—তার পর বল্—

—সেদিন উপোস করে আছি সারাদিন, ও এসে বললে—

এই পর্যন্ত বলে কাপালী-বৌ লজ্জায় মুখ নিচু করে বললে—না, সে কথা আর—

—কি বললে ?

—চাল দেবো আধ কাঠা।

—তাইতে তুই—

এই পর্যন্ত বলেই অনঙ্গ-বৌ চুপ করে গেল। ওর কাছে এসে ওর হাত ধরে গম্ভীর স্বরে বললে—ছুটকি ?

কাপালী-বৌ চুপ করে হইল।

—তুই আমার কাছে গেলিনে কেন ?

—তুমি সেদিনও আমার সঙ্গে শাক তুলে নিয়ে গেছলে। তোমার কাছে কিছু ছিল না সেদিন।

—যেদিন মতি মুচিনী এল ভাতছালা থেকে ?

—হুঁ।

অনঙ্গ-বৌয়ের চোখ ছলছল করে এল। সে আর কিছু না বলে কাপালী-বৌয়ের ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলে।

দুর্গা পণ্ডিত এসে আড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল ওদের দাওয়ায়। বাড়ীতে কেউ ছিল না গঙ্গাচরণ পাঠশালায়, ছেলেরা কোথায় বেরিয়েছিল। অনঙ্গ-বৌ

শাক তুলে বাড়ী ফিরে এসে দেখে প্রমাদ গনলো। আজই দিন বুঝে! শুধু এই শাক ভরসা, দুটো কটা মোটা নাগরা চাল কোথা থেকে উনি ওবেলা এনেছিলেন, তাতে একজনেরও পেট ভরবে না।

দুর্গা পণ্ডিত বললেন—এসো মা। তোমার বাড়ী এলাম।

—বসুন, বসুন।

—তোমাদের সব ভালো?

—এক রকম ওই।

আধঘণ্টা পরে দুর্গা পণ্ডিত হাত-পা ধুয়ে সুস্থ ঠাণ্ডা হয়ে অনঙ্গ-বৌয়ের কাছে তাঁর দুঃখের বিবরণ দিতে বসলেন। যেন অনঙ্গ-বৌ তাঁর বহুদিনের আপনার জন।

অনঙ্গ বললে—তিন দিন খান নি? বলেন কি?

—আমি তো নয়, বাড়ীসুদ্ধ কেউ নয় মা। বলি না খাওয়ার কষ্ট আর সহ্যি হয় না, আমার মায়ের কাছে যাই।

—তা এলেন ভালই করেছেন।

অনঙ্গ আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো আপাতোক বুড়োকে কি দিয়ে একটু জল দেওয়া যায়। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল পুরোনো দুটো চা পড়ে আছে হাঁড়ির মধ্যে পুঁটুলিতে। বললে—একটু চা করে দেবো?

দুর্গা পণ্ডিত খুশির সঙ্গে বলে উঠলো—আহা, তা হোলে তো খুবই ভালো হলো। কতদিন চা পেটে পড়ে নি।

অনঙ্গ-বৌ চিন্তিত মুখে বললে—কিন্তু নুন-চা খেতে হবে। দুধ নেই।

—তাই দাও মা। লবণ-চা আমি বড্ড ভালবাসি।

শুধু এক বাটি নুন-চা। তা ছাড়া অনঙ্গ-বৌয়ের কিছু দেবার উপায়ও ছিল কি?

রাত্রে গঙ্গাচরণ এসে দুর্গা পণ্ডিতকে দেখে মনে মনে ভারি চটে গেল। স্ত্রীকে বললে—জুটেচে ওটা আবার এসে?

অনঙ্গ-বৌ রাগের সুরে বললে—জুটেচে। তা কি হবে এখন?

—চলে যেতে বলতে পারলে না? কি খেতে দেবে শুনি?

—তুমি আমি দেবার মালিক? যিনি দেবার তিনিই দেবেন।

—হাঁ তিনি তো দিলেন দুবেলা। তাহলে ওকেও তো তিনি দিলেই পারতেন। তোমার স্কন্ধে নিয়ে এসে চাপালেন কেন?

—ছিঃ, অমন বলতে নেই তাঁর নামে। তিনি ঠিক জোটাবেন। এখানে যে পাঠিয়েচেন, এও তাঁর কাজ। যোগাবেন তিনি।

—বেশ, যোগান তবে। দেখি বসে বসে।

—নাও, হাত-পা ধুয়ে—এখন নুন-চা খাবে একটু?

দুর্গা পণ্ডিত বেশ শেকড় গেড়ে বসে গেল সেদিন থেকে, মনে হলো গঙ্গাচরণের। মনে মনে বিরক্ত হলেও গঙ্গাচরণ মুখে কিছু বলতে পারে না। দেখতে দেখতে তিন দিন দিব্যি কাটিয়ে দিলে। অনঙ্গ-বৌয়ের আশ্রিত জীব, কোথা থেকে এনে যে ওকে অনঙ্গ-বৌ খাওয়ায়, কেউ বলতে পারে না।

সেদিন দুর্গা পণ্ডিতকে বসে সামনের বেড়া বাঁধতে দেখে গঙ্গাচরণ বিরক্ত হয়ে বললে—ও কাজ করতে আপনাকে কে বলেচে?

দুর্গা পণ্ডিত থতমত খেয়ে বললে—বসে বসে থাকি, বেড়াটা বাঁধি ভাবলাম।

—না, ও রাখুন। ও আপনাকে করতে হবে না। হাবু বাঁধবে এখন।

—ও ছেলেমানুষ, ও কি পারবে?

—খুব ভালো পারে। আপনার হাতে এখুনি দায়ের কোপ লেগে যাবে। এখন ও রাখুন।

দুর্গা পণ্ডিত একটু কুণ্ঠিত হয়েই থাকে। সংসারের এটা-ওটা করবার চেষ্টা করে, তাতে গঙ্গাচরণ আরও চটে যায়। এর মতলবখানা কি, তাহলে এখানেই থেকে যেতে চায় নাকি? অনঙ্গ-বৌ দিব্যি ওকে চা খাওয়াচ্চে, খাবারও যে না খাওয়াচ্চে এমন নয়। স্ত্রীকে কিছু বলতেও সাহস করে না গঙ্গাচরণ।

চালের অবস্থা ভীষণ। এর ওর মুখে শুধু শোনা যাচ্চে চাল কোথাও নেই। একদিন সাধু কাপালী সন্ধান দিলে, কুলেখালিতে এক গোয়ালা-বাড়ীতে কিছু চাল বিক্রি আছে। কথাটা গঙ্গাচরণের বিশ্বাস হলো না। তবুও গরজ বড় বালাই, সাধু কাপালী ও সে দুজনে সাত ক্রোশ হেঁটে কুলেখালি গ্রামে উপস্থিত হলো। এদিকে রেল-টেল নেই, বড় বাজার শক্ত নেই—চাল থাকতেও পারে এ বিশ্বাস হলো গঙ্গাচরণের।

খুঁজে খুঁজে সেই গোয়ালা-বাড়ী বারও হলো। ব্রাহ্মণ দেখে গৃহস্বামী ওকে যত্ন করে বসালে, তামাক সেজে নিয়ে এল।

গঙ্গাচরণ বললে—জায়গাটা তোমাদের বেশ।

আসল কথা কিছু বলতে সাহস করচে না, বুক ঢিপ ঢিপ করচে। কি বলে বসে কি জানি! চাল না পেলে উপোস শুরু হবে সবসুদ্ধু।

গৃহস্বামী বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে ম্যালেরিয়া খুব।

—সে সর্বত্র।

—আপনাদের ওখানেও আছে? নতুন গাঁয়ে বাড়ী আপনার? সে তো নদীর ধারে।

—তা আছে বটে, তবু ম্যালেরিয়াও আছে।

—এদিকে যাচ্ছিলেন কোথায়?

—তোমার এখানেই আসা।

—আমার এখানেই? সে আমার ভাগ্যি। ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো পড়লো। তা কি মনে করে?

—ভয়ে বলবো না নির্ভয়ে বলবো?

—সে কি কথা বাবাঠাকুর! আমাদের কাছে ও কথা বলতে নেই। বলুন কি জন্যে আসা?

—তোমার বাড়ী চাল আছে সন্ধান পেয়ে এসেচি। দিতেই হবে কিছু। না খেয়ে মরচি একেবারে।

গৃহস্বামী কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললে—আপনাকে বলেচে কে?

—আমাদের গ্রামেই শুনেচি।

বাবা ঠাকুর, চাল আমার আছে, মিথ্যে কথা বলবো না। আপনি দেবতা কিন্তু সে চাল বিক্রি করবার নয়।

—কত আছে বলবে?

—তিন মণ। লুকিয়ে রখেছিলাম, যেদিন গবর্ণমেণ্টের লোক আসে কার ঘরে কত চাল আছে দেখতে, সেদিন মাটির মধ্যে পুঁতে রেখেছিলাম বলে চালগুলো একটু গুমো গন্ধ হয়ে গিয়েচে। ধান নেই, শুধু ওই চাল কটা সম্বল। ও বিক্রি করে আমরা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি, রাগ করবেন না, অভিসম্পাত দেবেন না বাবাঠাকুর। দিতে পারলি দিতাম। ওই কটা চাল ছাড়া আমার আর কোনো সম্বল নেই। ব্রাহ্মণের পায়ে হাত দিয়ে বলচি।

চাল পাওয়া গেল না। ফিরে আসবার পথে গঙ্গাচরণ চোখে অন্ধকার দেখলে। সাধু কাপালীও সঙ্গে ছিল ওর। ক্রোশ দুই এসে ওদের বড় খিদে ও জলতেষ্টা পেলো। সাধু বললে—পণ্ডিত মশাই, আর তো হাঁটা যায় না।

—তাই তো দেখছি। কাছে কি গাঁ ?

—চলুন যাই, বামুনডাঙা-শেরপুর সামনে, তার পরে ঝিকরহাটি।

বামুনডাঙা-শেরপুর গ্রামে ঢুকেই ওরা একটা বড় আটচালা ঘর দেখতে পেলে। সাধু কাপালী বললে—চলুন ওখানে। ওরা একটু জল তো দেবে।

গৃহস্বামী জাতিতে সদগোপ, ওদের যত্ন করে বসালে। গাছ থেকে ডাব পেড়ে খেতে দিলে। তারপর একটা বাটিতে খানিকটা আখের গুড় নিয়ে এল, জল নিয়ে এল। বললে—এবেলা এখানে দুটো রসুই করে খেয়ে যেতে হবে।

গঙ্গাচরণ আশ্চর্য হয়ে বললে—রসুই ?

—হাঁ বাবাঠাকুর। তবে চাল নেই।

গঙ্গাচরণ আরও আশ্চর্য হয়ে বললে—তবে ?

—বাবাঠাকুর চাল তো অনেকদিনই নেই গাঁয়ে। দিন দশেক থেকে কেউ ভাতের মুখ দেখে নি এখানে।

—তবে কি রসুই করবো ?

—বাবাঠাকুর বলতে লজ্জা করে, কলাই-সেদ্ধ খেয়ে সব দিন গুজরান করচে। বড়-ছোট সবাই। আপনাকেও তাই দেবো। আর লাউ-ডাঁটা চচ্চড়ি। ভাতের বদলে আজকাল সবাই ওই খাচ্চি এ গাঁয়ে।

সাধু কাপালী তাতেই রাজী। সে বেচারী দুদিন ভাত খায় নি—ওর মুখের দিকে চেয়ে গঙ্গাচরণ বললে—বাপু যা আছে বের করে দাও।

সেদ্ধ কলাই নুন আর লঙ্কা, তার সঙ্গে বেগুনপোড়া। সাধু কাপালী খেয়ে উঠে বললে—উঃ, এতও অদেষ্টে ছিল পণ্ডিত মশাই।

গঙ্গাচরণ বললে—একটা হদিস পাওয়া গেল, এ জানতাম না সত্যি বলচি। কিন্তু এ খেয়ে পেটে সইবে কদিন তাই ভাবচি। সন্ধ্যার দিকে শুধু হাতে গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরলো, কেবল সাধু কাপালী গোটাকতক বেগুন দিয়েচে। সাধু গরীব লোক নয়, তরি-তরকারি বেচে সে হাটে হাটে তিন-চার টাকা উপার্জন করে, কিন্তু টাকা দিয়েও চাল মিলচে কোথায় ?

দীনু, অনঙ্গ-বৌ ও ছেলেদের কারো খাওয়া হয় নি। ওদের মুখ দেখে বুঝতে পারলে গঙ্গাচরণ। ও নিজে তবুও যা হোক দুটো কলাই সেদ্ধও খেয়েছে।

অনঙ্গ-বৌ স্বামীকে খালি হাতে ফিরতে দেখে চালের কথা কিছু জিজ্ঞেসই করলে না। গঙ্গাচরণ হাত-পা ধুয়ে বসলে চা করেও নিয়ে এল। দীনু নিজেও নাকি আজ চালের চেষ্টায় বেরিয়েছিল। কোথাও সন্ধান মেলে নি। অনঙ্গ-বৌ ওকে বললে—খাবে এখন? গঙ্গাচরণ কৌতূহলের সঙ্গে খাবার জায়গায় গিয়ে দেখলে থালের একপাশে শুধু তরকারী, ভাত নেই—খানিকটা বেশি করে মিষ্টি কুমড়ো সেদ্ধ, একটু আখের গুড়। স্ত্রী যেন অন্নপূর্ণা, এও তো কোথা থেকে জোটাতে হয়েচে ওরই।

গঙ্গাচরণ কিছু ঠিক করতে পারে না ভেবে ভেবে। রোজ রোজ এই খেয়ে মানুষ কি বাঁচে!

স্ত্রীকে বললে—আর এক খাবার দেখে এলুম বামুনডাঙা-শেরপুরে। সেখানে সবাই কলাই সেদ্ধ খাচ্চে।—খাবে এক দিন।

অনঙ্গ-বৌয়ের দিকে চেয়ে ওর মনে হলো এই কদিনেও রোগা হয়ে পড়েচে। বোধ হয় পেট পুরে খেতে পায় না নিজে আর ওই বুড়োটা এসে এই সময় স্কন্ধে চেপে আছে। বুড়োকে খাওয়াতে গিয়ে ওর নিজের পেটে কিছু যাচ্চে না হয় তো। নাঃ এমন বিপদেও পড়া গিয়েচে।

অনঙ্গ-বৌ কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময় বাইরে থেকে কে বলে উঠলো—ও বামুন-দিদি—

অনঙ্গ-বৌ বাইরে এসে দেখলে ভাতছালার মতি-মুচিনী উঠোনে দাঁড়িয়ে। শরীর জীর্ণশীর্ণ, পরনে উলি-ঝুলি ছেঁড়া কাপড়, মাথায় রুক্ষ চুল বাতাসে উড়চে।

ওকে দেখে মতি হাসতে গেল। কিন্তু শীর্ণ মুখের সব দাঁতগুলো বেরিয়ে হাসির মাধুর্য গেল নষ্ট হয়ে। সর্বপ্রথমে অনঙ্গ-বৌ প্রশ্ন করলে—কে মতি! খাস নি কিছু? আয়—বোস।

তার পর দুমিনিটের মধ্যে দেখা গেল টেমি জেলে উঠোনে একখানা কলার পাত পেতে মতিকে বসিয়ে দিয়ে অনঙ্গ-বৌ ওকে খেতে দিয়েচে, সেই মিঠে কুমড়ো সেদ্ধ আর লাউশাক চচ্চড়ি। মতি বললে—দুটো ভাত নেই বামুন-দিদি? অনঙ্গ-বৌ দুঃখিত হলো।

মতি মুচিনীর মুখে নিরাশার চিহ্ন। ভাত দিতে পারলে না ওর পাতে অনঙ্গ-বৌ। একদানা চাল নেই ঘরে আজ কদিন। এই সব খেয়ে চলচে সবারই। তাও যে মেলে না। লাউশাক আর কুমড়ো কত কষ্টে যোগাড় করা।

অনঙ্গ-বৌ আদর করে বললে—আর কি নিবি মতি?

মতি হেসে বললে—মাছ খ্যাও, মুগির ডাল খ্যাও, বড়ি-চচ্চড়ি খ্যাও—

—দেবো, তুই খা খা—হ্যাঁরে ভাত পাস্ নি কদিন রে ?

মতি চোখ নিচু করে কলার পাতার দিকে চেয়ে বললে—পনেরো ষোল দিন আজ সুদ্ধু কচু সেদ্ধ আর পুঁইশাক সেদ্ধ খেয়ে আছি। আর পারি নে বামুন-দিদি। তাই জোটাতে পাচ্ছিনে। ভাবলাম আর তো মরেই যাবো, মরবার আগে বামুন-দিদির বাড়ীতে দুটো ভাত খেয়ে আসি।

অনঙ্গ-বৌ চোখের জল মুছে দৃপ্ত কণ্ঠে বললে—মতি, তুই থাক আজ। ভাত তোকে আমি কাল খাওয়াবোই। যেমন করে পারি।

মতি মুচিনীকে দুদিন অন্তর যাহোক দুটি ভাত দেয় অনঙ্গ-বৌ।

কোথা থেকে যে ভাত যোগাড় হয়, তা তাকে কেউ জিজ্ঞেস করে না। ভট্চায বুড়ো বাড়ী গিয়েচে কামদেবপুরে, কিন্তু গঙ্গাচরণের দৃঢ়বিশ্বাস, ও ঠিক আবার এসে জুটবে। এ বাজারে এমন নির্ভাবনায় আহার জুটবে কোথা থেকে ?

সেদিন মতি দুপুরে এসে হাজির। ওর পরনে শতচ্ছিন্ন কাপড়, মাথায় তেল নেই। অনঙ্গ-বৌ ওকে বললে—মতি তেল দিচ্চি, একটা ডুব দিয়ে আয় দিকি !

—পেট জ্বলচে বামুন-দিদি। কাল ভাত জোটে নি, নেয়ে এলেই পেটে আগুন জ্বলে উঠবে।

—তুই যা, সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না।

মতি মুচিনী নির্বোধ মেয়ে নয়, সে চুপ করে থেকে বললে—না, তোমাদের এখানে আর খাবো না।

—কেন রে ?

—তুমি পাবে কোথায় বামুন-দিদি যে রোজ রোজ দেবে ?

—সে ভাবনা তোর নয়, আমার। তুই যা দিকি, নেয়ে আয়—

মতি মুচিনী স্নান সেরে এল। একটা কলার পাতে আধপোয়াটাক কলাই সিদ্ধ ও কিসের চচ্চড়ি। অনঙ্গ-বৌ ধরা গলায় বললে—ওই খা মতি।

মতি অবাক হয়ে এক দৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে বললে—তোমাদেরও এই শুরু হোয়েচে ?

—তা হোয়েচে।

—চাল পেলে না ?

—পঞ্চান্ন টাকা মণ। দাম দিলে এখুনি মেলে হয়তো।

—কিন্তু এ তোমরা খেয়ো না বামুন-দিদি।

—কেন রে?

—একি তোমাদের পেটে সহ্যি হয়? আমাদের তাই সহ্যি হয় না।

—তুই খা খা—এত বক্তিমে দিতে হবে না তোকে।

বিকেলে মতি এসে বললে—বামুন-দিদি, এক জায়গায় মেটে আলু আর বুনো শোলা কচু হয়েচে জঙ্গলের মধ্যে। একটা সাবল-টাবল দ্যাও, কেউ এখনো টের পায় নি, তুলে আনি।

অনঙ্গ-বৌ বললে—তুই একলা পারবি আলু তুলতে?

—কেন পারবো না? দ্যাও একখানা শাবল—

—খাস নি, দুর্বল শরীর, ভিরমি লেগে পড়ে যাবি। তুই আর আমি যাই—

এই সময় কাপালীদের ছোট-বৌ এসে জুটলো। বললে—কি পরামর্শ হচ্চে তোমাদের গা?

অতএব ছোট-বৌকেও ওদের সঙ্গে নিতে হলো।

গ্রামের উত্তর মাঠের নিচেই সরাইপুরের বাঁওড়। বাঁওড়ের ধারে খুব জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে একটা শিমুলগাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ষাঁড়াগাছের দুর্ভেদ্য ঝোপের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়।

ওরা এগিয়ে গিয়েচে অনেকখানি। কিন্তু অনঙ্গ-বৌ আর কাপড় ছাড়াতে পারে না। কি বিশ্রী কাঁটা।

মতি মুচিনী বিরক্ত হয়ে বললে—তখুনি বললাম তুমি এসো না। এখানে আসা কি তোমার কাজ? কক্ষনো কি এ সব অভ্যেস আছে তোমার? সরো দেখি—

মতি এসে কাঁটা ছাড়িয়ে দিলে।

অনঙ্গ-বৌ রাগ করে বললে—ছুঁলি তো এই সন্দেবেলা?

মতি হেসে বললে—নেয়ে মরো এখন বামুন-দিদি।

—যা যা, আর মজা দেখতে হবে না তোমার—ঢের হয়েচে।

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। মস্ত বড় মেটে আলু লতার গোড়া খুঁড়ে সের পাঁচ-ছয় ওজনের বড় আলুটা তুলতে ওরা সবাই ঘেমে নেয়ে উঠেচে। মতি মুচিনী মাটি মেখে ভূত হয়েছে, কাপালী বৌ লতার জঙ্গল টেনে ছিঁড়তে ছিঁড়তে হাত লাল করে ফেলেচে, অনঙ্গ-বৌ একটু আনাড়ির মত আলুর একদিক ধরে বৃথা টানাটানি করচে গর্ত থেকে সেটাকে তুলবার প্রচেষ্টায়।

কাপালী-বৌ হেসে বললে—রাখো, রাখো বামুন-দিদি, ও তোমার কাজ নয়; দাঁড়াও একপাশে—

বলে সে এসে দুহাত দিয়ে টানতেই আলুটা গর্ত থেকে বেরিয়ে এল।

অনঙ্গ-বৌ অপ্রতিভের হাসি হেসে বললে—আমি পারলাম না—বাবাঃ—

—কোথা থেকে পারবে বামুন-দিদি—নরম রাঙা হাতের কাজ নয় ওসব।

—তুই যা—তোকে আর ব্যাখ্যান কত্তে হবে না মুখপুড়ী—

এমন সময়ে এক কাণ্ড ঘটলো। সেই ঘন ঝোপের দূর প্রান্তে একজন দাড়িওয়ালা জোয়ান মত চেহারার লোকের আকস্মিক আবির্ভাব হলো। লোকটা সম্ভবতঃ মেঠো পথ দিয়ে যেতে যেতে নদীতীরের ঝোপের মধ্যে নারীকণ্ঠের হাসি ও কথাবার্তা শুনতে পেয়ে এদিকে এসেচে। কিন্তু তার ধরনধারণ ও চলনের ভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি দেখে সর্বপ্রথমে অনঙ্গ-বৌয়ের মনে সন্দেহ জাগল। ভালো নয় এ লোকটার মতলব। ঝোপের মধ্যে তিনটি সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়েকে দেখেও ও কেন এদিকেই এগিয়ে আসচে? যে ভদ্র হবে, সে এমন অদ্ভুত আচরণ কেন করবে?

মতি এগিয়ে এসে বললে—তুমি কে গা? এদিকি মেয়েছেলে রয়েচে—এদিকি কেন আসচো?

কাপালী-বৌও জনান্তিকে বললে—ওমা, এ ক্যান্ধারা নোক গা?

লোকটার নজর কিন্তু অনঙ্গ-বৌয়ের দিকে, অন্য কোনদিকে তার দৃষ্টি নেই; সে হন্ হন্ করে সোজা চলে আসচে অনঙ্গ-বৌয়ের দিকে। অনঙ্গ-বৌ ওর কাণ্ড দেখে ভয়ে জড় সড় হয়ে মতির পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালো। তার বুক ঢিপ ঢিপ করচে—ছুটে যে একদিকে পালাবে এ তেমন জায়গাও নয়। তখনও লোকটা থামে নি।

মতি চেঁচিয়ে উঠে বললে—কেমন নোগ গা তুমি? ঠেলে আসচো যে ইদিকি বড়ো?

কাপালী-বৌ এসময়ে আরও পিছিয়ে গিয়েচে। কারণ কাছাকাছি এসে লোকটা ওর দিকেও একবার কট্‌মট্ করে চেয়েচে—মুখে কিন্তু লোকটা কোন কথা বলে নি।

এদিকে অনঙ্গ-বৌয়ের মুশকিল হয়েচে, ছুটে পালাতে গিয়ে ওর চুল জড়িয়ে গিয়েচে শেয়াকুল কাঁটায় আর কুঁচ লতায়। বসন হয়ে গেছে বিস্রস্ত। ঘেমে ও পরিশ্রমে মুখ হয়েছে রাঙা। লোকটা ওর দিকে যেন অগ্নিশিখার দিকে

পতঙ্গের মত ছুটে আসচে—কাছে এসে যেমন খপ্ করে অনঙ্গ-বৌয়ের হাত ধরতে যাবে, মতি তাকে প্রাণপণ শক্তিতে মারলে এক ঠ্যালা। সঙ্গে সঙ্গে অনঙ্গ-বৌ বলে উঠলো—খবরদার! কাপালী-বৌ হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো।

লোকটা ধাক্কা খেয়ে মেটে আলুর গর্তের মধ্যে পড়ে গেল।

ততক্ষণ মতি এসে অনঙ্গ-বৌকে কাঁটার বাঁধন থেকে মুক্ত করবার প্রাণপণে চেষ্টা করচে। তার তখন রণরঙ্গিণী মূর্তি। সে চেঁচিয়ে বললে—তোল্ তো শাবলটা কাপালী-বৌ—মিনসের মুণ্ডুটা দিই গুঁড়ো করে ভেঙে—এত বড় আস্পদ্দা!

অনঙ্গ-বৌ ষাঁড়াঝোপের নিবিড়তম অংশে ঢুকে গিয়েচে ততক্ষণ, ও ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপচে। কারণ ঝোপ থেকে বেরুবার পথ নেই বাইরে, সে সুঁড়ি পথটাতে ওর আর মতির যুদ্ধ চলছিল। লোকটা গর্ত থেকে উঠবার চেষ্টা করচে, মতি কাপালী-বৌয়ের হাত থেকে শাবলটা নিচ্চে—এই পর্যন্ত অনঙ্গ-বৌ দেখতে পেলে। পালাবার পথ বন্ধ। অনঙ্গ-বৌ যেখানে ঢুকেচে সেখানে মানুষ আসতে হলে তাকে হামাগুড়ি দিয়ে চার হাত-পায়ে আসতে হবে। বিষম কুঁচ কাঁটার লতাজাল। মাথার ওপর শাবল হাতে মতি মুচিনী রণরঙ্গিণী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে।

লোকটা নিজের অবস্থা বুঝলো। মতির হাত থেকে শাবল কেড়ে নেওয়া অত সহজ হবে না।

এদিক-ওদিক চেয়ে সে সে-পথেই এক-পা দু-পা করে পিছু হঠতে লাগলো।

একেবারে ঝোপের প্রান্তসীমায় পৌঁছে লোকটা হঠাৎ পিছন ফিরে দিলে দৌড়। মতি মুচিনী বললে—বেরিয়ে এসো গো বামুনদিদি—পোড়ারমুখো মিন্‌সে ভয় পেয়ে ছুট দিয়েচে।

অনঙ্গ-বৌ তখনও কাঁপচে, তার ভয় তখনও যায় নি। কাপালী-বৌ ভয় পেলেও অনঙ্গ-বৌয়ের মত ভয় পায় নি বা তার অতটা ভয় পাওয়ার কারণও ঘটে নি। সে হেসে ফেললে।

অনঙ্গ-বৌ ধমক দিয়ে বললে—আবার হাসি আসচে কিসে পোড়ার মুখে? —চুপ, ছুঁড়ির রঙ্গ ছাখো না—

মতি মুচিনী বললে—ওই বোঝো।

সবাই মিলে এমন ভাবটা করলে যেন সব দোষটা ওরই।

কাপালী-বৌয়ের বয়স কম, সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে কৌতুক জনক

বলে মনে না হলে সে হাসে নি—হাসি চাপবার চেষ্টা করতে করতে বললে—ওঃ, মতি-দিদির সে শাবল তোলার ভঙ্গি দেখে আমার তো—হি-হি-হি—

অনঙ্গ-বৌ ধমক দিয়ে বললে—আবার হাসে!

—নাও, নাও বামুন-দিদি, রাগ কোরো না—

—হয়েচে—এখন চলো এখান থেকে বেরিয়ে—বেলা নেই।

এতক্ষণ ওদের যেন সেদিকে দৃষ্টি ছিল না—এখন হঠাৎ ঝোপ থেকে উঁকি মেরে সবাই চেয়ে দেখলে সবাইপুরের বাঁওড়ের ওপারে নোনাতলা গ্রামের বাঁশবনের আড়ালে কতক্ষণ পূর্বে সূর্য অস্ত গিয়েচে, ঘন ছায়া নেমে এসেচে বাঁওড়ের তীরে তীরে, বাঁওড়ের জলের কচুরিপানার দামের ওপর। আবার কি উৎপাত না জানি হয়, সন্ধ্যেবেলা। মাত্র তিনটি মেয়েছেলে তেপান্তর মাঠের মধ্যে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—বাবাঃ—এখন বেরোও এখান থেকে।

মতি বললে—বা রে, মেটে আলুটা?

—কি হবে তাই?

—অত বড় মেটে আলুটা ফেলে যাবা? কাল থাকবে? এই মন্বন্তরের সময়ে?

কথাটা সকলেরই প্রাণে লাগলো। থাকবে না মেটে আলু। আজকাল গ্রামের লোক সব যেন কেমন হয়ে উঠেছে। সন্ধান পাবেই।

কাপালী-বৌ বললে—তাই করো বামুন-দিদি। আলুটি নেওয়া যাক—লোক সব হন্যে হয়ে উঠেচে না খেতি পেয়ে। বুনো কচু আলু কিছু বাদ দিচ্চে না, সব্বদা খুঁজে বেড়াচ্চে বনে-জঙ্গলে। ওই আলুটা তুললে আমাদের তিন বেলা খাওয়া হবে।

আবার সবাই মিলে আলুর পিছনে লাগলো এবং যখন সকলে মিলে গর্ত হতে মেটে আলুটা বের করে উপরে তুলে ধুলো ঝাড়ছে—তখন সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকার মাঠ-বন ঘিরে ফেলেছে। মতি মুচিনী নিজেই অত বড় ভারি আলুটা বয়ে নিয়ে চললো, মধ্যে অনঙ্গ-বৌ, পেছনে শাবল হাতে কাপালী-বৌ। ওরা সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিকে সশঙ্ক দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে গ্রামের মধ্যে এসে ঢুকলো।

গ্রামে ঢুকবার আগে অনঙ্গ-বৌ বললে—এই ছুঁড়ি, আজকের কথা ওই সব যেন কাউকে বলিস নে—

কাপালী-বৌ ঘাড় নেড়ে বললে—নাঃ—

—হাড্ড পেট-আল্‌গা তুই, পেটে কোনো কথা থাকে না—

—কেন, কবে আমি কাকে কি বলিচি ?

—সে হিসেব এখন বসে বসে দেবার সময় নেই—মোটের ওপর একথা কারো কাছে—

—কোন্ কথা ? মেটে আলুর কথা ?

—আবার ন্যাকামি হচ্চে ? ত্থাখ্ ছুট্‌কি, তুই কিন্তু দেখবি মজা আমার হাতে আজ। তুমি বুঝতে পারচো না কোন্ কথা ?—নেকু !

কাপালী-বৌ, আবার হি-হি করে হেসে ফেললে—কি কারণে কে জানে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—এ পাগলকে নিয়ে আমি এখন কি করি ? তুই বলবি ঠিক—না ?

কাপালী-বৌ হাসি থামিয়ে আশ্বাস দেওয়ার সুরে বললে—পাগল বামুন-দিদি ? তোমায় নিয়ে যখন কথা, তখন জেনো, কাগ পক্ষিতেও একথা টের পাবে না। মাথার ওপর চন্দ্র-সূয্যি নেই ?

বাড়ী এসে আলুব ভাগ নিয়ে চলে গেল যে যার ঘরে।

গঙ্গাচরণ বেরিয়েছিল চাল যোগাড়ের চেষ্টায়। কিন্তু ন হাটার হাটে ঘোর দাঙ্গা আর লুটপাট হয়ে গিয়েচে—চালের দোকানে। পুলিস এসে অনেক লোককে ধরে নিয়ে গিয়েচে। গঙ্গাচরণ বর্ণনা করে স্ত্রীর কাছে বসে সন্ধ্যার পরে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—এখন উপায় ?

—উপবাস।

অনঙ্গ-বৌ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলে সে উপোস করতে ভয় পায় না, উপোস কি করে নি এর মধ্যে ? কিন্তু এই যে উনি শুকনো মুখে এত দূর থেকে এসেচেন ফিরে, ওঁকে এখন সে কি খেতে দেবে ওই মেটে আলু সিদ্ধ ছাড়া ? বাধ্য হয়ে দিতে হলো তাই। শুধু মেটে আলু সিদ্ধ। এক তাল মেটে আলু সিদ্ধ। সবাইকে তাই খেতে হলো। দীনু ভট্‌চায সম্প্রতি বাড়ী চলে গিয়েচে। তবুও আলু সেদ্ধ খানিকটা বাঁচবে। হাবু খেতে বসে বললে—এ মুখে ভালো লাগে না মা—

অনঙ্গ বললে—এ ছেলের চাল ত্থাখ না ? মুখে ভালো না লাগলে করচি কি ?

মতি মুচিনী খেতে এল না, কারণ সে ভাগের ভাগ আলু নিয়ে গিয়েচে, আলাদা করে আলু সেদ্ধ বা আলু পোড়া খেয়েচে।

পরদিনও আলু সেদ্ধ চললো। এ কি তাচ্ছিল্যের দ্রব্য? কত বিপদের সম্মুখীন হয়ে তবে ওইটুকু আলু সংগ্রহ করে আনতে হয়েচে—ছেলের মুখে ভালো লাগে না তো সে কি করবে?

রাত্রিতে অনঙ্গ-বৌ বললে—হ্যাগা, চাল না পাও, কিছু কলাই আজ আনো। আলু ফুরিয়েচে।

—তাই বা কোথা থেকে আনি?

—পরামাণিকদের দোকানে নেই?

—সব সাবাড়। গুদোম সাফ।

—কি উপায়?

—কিছু নেই ঘরে? আলুটা?

—সে আর কতটুকু। কাল ফুরিয়েচে। তবুও তো এবার ভট্‌চাজ ঠাকুর নেই—মতি নেই—নিজেরাই খেয়েচি।

কাল থেকে কি হবে তাই ভাবচি—

—চাল কোথাও নেই?

—আছে। পঁয়ষট্টি টাকা মণ, নেবে? পারবে নিতে?

অনঙ্গ-বৌ হেসে বললে—আমার হাতের একগাছা রুলি আছে, তাই বেচে চাল নিয়ে এসো।

তিনদিন কেটে গেল।

চাল তো দূরের কথা কোন খাবারই মেলে না। কলাইয়ের মণ ষোল টাকা, তাও পাওয়া দুষ্কর।

কাপালী-বৌ না খেয়ে রোগা হয়ে গিয়েচে, তার চেহারায় আগের জলুস আর নেই। সন্ধ্যাবেলা পা টিপে টিপে অনঙ্গ-বৌয়ের কাছে এসে বললে—কি করচো বামুন-দিদি?

বসে আছি ভাই, রান্না-বান্না তো নেই।

—সে তো কারো নেই।

—কি খেয়েছিস? সত্যি বলবি?

কাপালী-বৌ চুপ করে রইল।

অনঙ্গ-বৌ ঘরের মধ্যে গিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজলো। কিছুই পেলে না।

তার ধারণা ছিল কাল রাত্রের আধখানা নারকোল বোধ হয় ঘরের কোথাও আছে, কিন্তু খিদের জ্বালায় ছেলেরা বোধ হয় কখন শেষ করে দিয়েচে সে দেখেনি।

কাপালী-বৌ ওর দিকে চেয়ে রইল অদ্ভুত দৃষ্টিতে। ওকে দেখে কষ্ট হয়।

একটু কাছে ঘেঁষে এসে বললে—আমি যাবো।

অনঙ্গ-বৌ বিস্ময়-সুরে বললে—কোথায় যাবি ?

—ইটখোলায়।

—কোন্ ইটখোলায় ?

—দীঘির পারের বড় ইটখোলায়—জানো না ? আহা !

কাপলী-বৌ যেন ব্যঙ্গের সুরে কথা শেষ করলে। অনঙ্গ-বৌ বললে—সেখানে কেন যাবি রে ?

কাপালী-বৌ চুপ করে রইল নিচু চোখে। অনঙ্গ-বৌ বললে—ছুট্‌কি !

—বলো গে তুমি, বামুন-দিদি। তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি এতদিন জবাব দিই নি। আর পারি নে না খেয়ে—না খেয়েই যদি মলাম, তবে কিসেব কি ? আমি কোনো কথা শুনবো না—চলি বামুনদি. পাপ হয়ে নরকে পচে মরবো সেও ভালো—

অনঙ্গ কোনো কথা বলবার আগে কাপালী-বৌ ততক্ষণ হন্ হন্ করে চলেচে বেড়ার বাইরের পথে।

অনঙ্গ-বৌ পিছনে ডাক দিলে--ও বৌ শুনে যা, যাস নি,—শোন্ ও বৌ—

পুরোনো ইটখোলাব এদিকে একটা বড শিমুল গাছের তলায় অন্ধকারে কে একজন দাঁড়িয়ে। কাপালী-বৌ আনাডির মত অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পথ চলে সেখানে পৌছুলো।

দাঁড়িয়ে আছে পোড়ো যদু—বাল্যে সর্বাঙ্গ পুড়ে গিয়েছিল, এখনও সে দাগ মেলায় নি—তাই ওর ওই নাম গ্রামের মধ্যে। পোডা যদুও বলে আবার যদু-পোডাও বলে। যদু ইটখোলায় কাঠ যোগান দেওয়ার ঠিকাদার। মোটা পয়সা রোজগার করে।

যদু-পোড়া ওকে দেখতে পেয়ে বললে—এই যে ইদিকি !

কাপালী-বৌ ভেংচি কেটে বললে—ইদিকি ! দেখতি পেইচি। এ অন্ধকারে আর ও ভূতের রূপ চোখ মেলে দেখতি চাইনে। আঁতকে ওঠবো।

যদু পোড়া শ্লেষের সুরে বললে—তবু ভালো। তবুও যদি—

কাপালী-বৌ বাধা দিয়ে না থামিয়ে দিলে যদু-পোড়া একটা কি অশ্লীল কথার দিকে ঝুঁকে ছিল।

থামিয়ে দিয়ে নীরস রুক্ষস্বরে বললে—কই চাল?

—আছে রে আছে—

—না, দেখি আগে। কত কটি?

—আধ পালি। তাই কত কষ্টে যোগাড় করা। শুধু তোকে কথা দিইচি বলে।

—কে তোমার কাছে কথা পেড়েছিল আগে? আমার কাছে তুমি কখন কথা দিইছিলে? বাজে কথা কেন বলো। আমি দেরি করতে পারবো না—সন্দে হয়ে গিয়েচে—দেখি চাল আগে—তোমাকে আমার বিশ্বাস নেই—

যদু-পোড়া নিজের সততার প্রতি এ রূঢ় মন্তব্যে হঠাৎ বড় অবাক হয়ে উঠে কি একটা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কাপালী-বৌ আবার ধমক দিয়ে বলে উঠলো—আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু। সারারাত এ শিমুল তলায় তোমার মত শ্মশানের পোড়া কাঠের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতি হবে নাকি? চললাম আমি—

যদু-পোড়া ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বললে—শোন্, শোন্ যাস নে—বাবাঃ এ দেখচি ঘোড়ায় জিন দিয়ে—আচ্ছা আচ্ছা—এই ছাখ চাল—এই ধামাতে—এই যে—বাপ রে কি তেজ!

কাপালী-বৌ সদর্পে বললে—চুপ!

—আচ্ছা, আচ্ছা, কিছু বলচি নে—তাই বলচি যে—

কাপালী-বৌ আধঘণ্টা পরে ইটখোলা থেকে বেরুলো, আঁচলে আধ পালি চাল। পেছনে পেছনে আসছে যদু-পোড়া। অন্ধকার পথের দু'ধারে আশ সেওড়া বনে জোনাকী জ্বলচে।

কাপালী-বৌ তিরস্কারের সুরে বললে—পেছনে পেছনে কোন্ যমের বাড়ী আসচো?

—তোকে একটু এগিয়ে দি—

—ঢের হয়েচে। ফিরে যাও—

—অন্ধকারে যাবি কি করে?

—তোমার সে দরদে কাজ নেই—চলে যাও—

গাঁয়ের লোক এ পথে আসবে না, ভয় নেই—

—সে ভয় করি নে আমি। আমাকে সবাই চেনে—তুমি যাও চলে—

তবুও যদু-পোড়া পিছু পিছু আসচে দেখে কাপালী-বৌ হঠাৎ দাঁড়িয়ে ঝাঁজের স্বরে বললে—যাও বলচি—কেন আসচো?

যদু-পোড়া আদরের স্বরে বললে—তুমি অমন করচো কেন হ্যাগো? বলি আমি কি পর?

কাপালী-বৌ নীরস কণ্ঠে বললে—ওসব কথায় দরকার নেই। তোমাকে উপকার করতে কেউ বলচে না, যাও বলচি, নইলে এ চাল সব ওই খানায় ফেলে দেবো কিন্তু।

যদু-পোড়া এবার থমকে দাঁড়ালো। বললে—যাচ্চি যাচ্চি—একটা কথা—

—কি কথা?

—চাল আর কিছু আমি যোগাড় করচি—পরশু সন্দেবেলা আসিস।

—যাও তুমি—

অনঙ্গ-বৌ রান্নাঘরের দাওয়ায় আঁচল পেতে শুয়ে আছে, গঙ্গাচরণ কোথায় বেরিয়েচে, এখনো ফেরে নি। আধ-অন্ধকারে কে একজন দাওয়ার ধারে খুঁটি ধরে এসে দাঁড়ালো। অনঙ্গ-বৌ চমকে বলে উঠলো—কে?

পরে ভলে করে চেয়ে দেখে ব'ল্লে—আ মরণ! মুখে কথা নেই কেন?

কাপালী-বৌ মুখে আঁচল দিয়ে খিল খিল করে হাসচে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—কি মনে করে?

—একটু নুন দেবা?

—দেবো। কোত্থেকে এলি?

—এল্যাম।

—বোস না—

—বোসবো না। খিদে পাই নি?

—খাবি কি?

কাপালী-বৌ আঁচল দেখিয়ে বললে—এই যে।

—কি ওতে?

—চাল—দেখতি পাচ্চ না? নুন দ্যাও দিদি। খাই গিয়ে—

—কোথায় পেলি চাল ?

—বলবো কেন ? তুমি দুটো রাখো বামুন-দিদি।

অনঙ্গ-বৌ গম্ভীর সুরে বললে—ছুটকি তোর বড় বাড় হয়েচে। যত বড় মুখ না তত বড় কথা—

—পায়ে পড়ি বামুন-দিদি ! নাও দুটো চাল তুমি—

—তোর মুখে আগুন দেবো—

—আচ্ছা বামুন-দিদি আমরা নরকে পচে মরবো ঠিকই। আমাদের কথা বাদ দাও তুমি। তুমি সতীলক্ষ্মী, পায়ের ধূলো দিও—নরকে গিয়েও যাতে দুটো খেতে পাই—

অনঙ্গ-বৌয়ের চোখে জল এল। সে কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল।

কাপালী-বৌ বললে—নেবা দুটো চাল ?

—না, তুই যা—

—তবে মর গিয়ে। আমিই খাই গিয়ে। কই নুন দ্যাও—

নুন নিয়ে চলে গেল কাপালী-বৌ। কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এসে বললে—ও বামুন-দিদি, আজ তুমি কি খেয়েচ ?

—ভাত।

—ছাই—সত্যি বলো।

—যা খাই তোর কি ? যা তুই—

কাপালী-বৌ এগিয়ে এসে বললে—পায়ের ধূলো একটু দ্যাও—গঙ্গা নাওয়ার কাজ হয়ে যাক্—

বলেই সে অনঙ্গ-বৌয়ের দুই পায়ের ধূলো দুই হাতে নিয়ে মাথায় দিলে। তারপর কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে গঙ্গাচরণ এসে পড়াতে সে ছুটে পালালো।

গঙ্গাচরণ বললে—ও কে গেল গা ?

—ছোট-বৌ কাপালীদের।

—কি বলছিল ?

—দেখা করতে এসেছিল। চাল পেলে ?

—এক জায়গায় সন্ধান পেয়েচি। ষাট টাকা মণ—ভাবচি কিছু বাসন বিক্রি করি।

—তাতে ষাট টাকা হবে ?

—কুড়ি টাকা তো হবে। তেরো সের চাল কিনে আনি—আর না খেয়ে তো পারা যায় না, সত্যি বলচি—

—তার চেয়ে আমার সোনা-বাঁধানো শাঁখাটা বিক্রি করে এস। বাসন থাক গো—

—তোমার হাতের শাঁখা নেবো?

—না নিলে অনাহারে মরতে হবে। যা ভালো বোঝো তাই করো।

পরদিন গঙ্গাচরণ শাঁখাজোড়া গ্রামের সব স্যাকরার দোকানে বিক্রি করলে। সব স্যাকরা বললে—এ জিনিস বিক্রি করবেন কেন?

—দরকার আছে।

কিন্তু চাল পাওয়ার যে এত বিপুল বাধা, তা গঙ্গাচরণ জানতো না। শঙ্করপুরের নিবারণ ঘোষের বাড়ী চালের সন্ধান একজন দিয়েছিল। খুব ভোরে পরদিন উঠে সেখানে পৌঁছে দেখলে দশজন লোক সেখানে ধামা নিয়ে বসে। বাড়ীর মালিক তখনও ওঠে নি। নিবারণ দোর খুলে বাইরে আসতেই সবাই মিলে তাকে ঘিরে ধরলে। সে বললে—আমার চাল নেই—

গঙ্গাচরণ বললে—সে আমি জানি। তবুও তোমার মুখে শুনবো বলে এসেছিলাম—

গঙ্গাচরণ সেখানেই বসে পড়লো। চাল না নিয়ে সে ফিরবে কেমন করে। বাড়ীর সকলেই আজ দু'দিন থেকে ভাত খায় নি। ছেলেদের মুখের দিকে তাকালে কষ্ট হয়। অন্য কয়েকজন লোক যারা এসেছিল, তারা একে একে সবাই ফিরে গেল। নিবারণ ঘোষ বাইরের বাড়ী আর ভেতর বাড়ীর মধ্যেকার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

কতক্ষণ পরে নিবারণ ঘোষ আবার বাইরে এল। গঙ্গাচরণকে বসে থাকতে দেখে বললে—বাবাঠাকুর কি মনে করে বসে? চাল? সে দিতে পারবো না। ঘরে চাল আছে, সে তোমার কাছে অস্বীকার করে যাচ্ছি নে—শেষে কি নরকে পচে মরবো? কিন্তু সে চাল বিক্রি করলি এরপর বাচ-কাচ না খেয়ে মরবে যে!

—কত চাল আছে?

—দু মণ।

ঠিক?

—না ঠাকুরমশাই মিথ্যে বলবো না। আর কিছু বেশী আছে। কিন্তু সে

হাতছাড়া করলি বাড়ীসুদ্ধ না খেয়ে মরবে। ট্যাকা নিয়ে কি ধুয়ে খাবো? ও জিনিস পয়সা দিলি মেলবে না।

গঙ্গাচরণ উঠবার উদ্যোগ করছে দেখে নিবারণ হাত জোড় করে বললে—একটা কথা বলি বাবাঠাকুর। ব্রাহ্মণ মানুষ, এত দূর এয়েচেন চালির তেষ্টায়। আমি চাল দিচ্চি, আপনি আমার বাড়ীতে দুটো রান্না করে খান। রসুই চড়িয়ে দিন গোয়ালঘরে। মাছ পুকুর থেকে ধরিয়ে দিচ্চি, মাছের ঝোল ভাত আর গরুর দুধ আছে ঘরে। এক পয়সা দিতি হবে না আপনার।

গঙ্গাচরণ বললে—না, তা কি করে হয়? বাড়ীতে কেউ খায় নি আজ দু'দিন। ছেলেপিলে রয়েছে, তা হয় না। তুমি আমাকে রান্নার জন্যে তো চাল দিতেই, আর দুটো বেশী করে দাও। আমি দাম দিয়ে নেবো। ষাট টাকা করেই মণ দেবো, কিছু বেশী না হয় নাও।

নিবারণ কিছুতেই রাজী হলো না। তার ওপর রাগ করা যায় না, প্রতি কথাতেই সে হাত জোড় করে, এখানে বসে খাওয়ার নিমন্ত্রণ তো করে রেখেচেই। গঙ্গাচরণ চলে আসছে, নিবারণ এসে পথের ওপরে আবার তাকে হাত জোড় করে রান্না করে খাওয়ার অনুরোধ জানালে।

গঙ্গাচরণ রাগ করে বললে—আমি কি তোমার বাড়ী খেতে এসেছি? যাও যাও—ওকথা বলো না—

কিন্তু গঙ্গাচরণের মনের মধ্যে আর সে জোর নেই। হঠাৎ তার মনের চক্ষে ভেসে উঠেছে, দিব্যি হিঙের টোপা টোপা বড়ি ভাসচে মাছের ঝোলে, আলু বেগুন বড় বড় চিংড়ি মাছ আধ-ভাসা অবস্থায় দেখা যাচ্চে বাটির উপরে। ভাতে সেই মাছের ঝোল মাখা হয়েচে। কাঁচা ঝাল একটা বেশ করে মেখে···

নিবারণ বললে—আসুন, চলুন। আমার একথা আপনাকে রাখতেই হবে। সে শোনবো না আমি। দুপুর বেলায় না খেয়ে বাড়ী থেকে ফিরে যাবেন?

হাবু ভাত খায় নি আজ দু'দিন। অনঙ্গ-বৌ খায় নি দু'দিনেরও বেশি। ও যে কি খায়-না-খায় গঙ্গাচরণ তার খবর রাখে না। নিজে না খেয়েও সবাইকে জুগিয়ে বেড়ায়। তার খাওয়া কি এখানে উচিত হবে? গঙ্গাচরণ নিবারণকে বললে, আচ্ছা যদি খাই, তবে এক কাঠা চাল দেবে?

—না বাবাঠাকুর। মিথ্যে বলে কি হবে। চাল হাতছাড়া করবো না। আপনি একা এখানে বসে আধ কাঠা চাল রেঁধে খান তা দেবো।

—তোমার জেদ দেখছি কম নয়।

—এই আকালে এমনি করেছে। ভয় ঢুকে গিয়েছে যে সবারই।

—চাল আর যোগাড় করতে পারবে না?

—কোথা থেকে করবো বলুন! কোন মহাজনের ঘরে ধান নেই। বাজারে এক দানা চাল আসে না। আমাদের গেরামের পেছনে একটা বিল আছে জানেন তো? দাসপাড়ার বিল তার নাম। এখন এই তো বেলা হয়েছে, গিয়ে দেখুন সেখানে ত্রিশ-চল্লিশ জন মেয়ে-মানুষ জুটেছে এতক্ষণ। জলে পাঁকের মধ্যি নেমে পদ্ম গাছের মূল তুলছে, গেঁড়ি-গুগলি তুলছে—জল-ঝাঁঝির পাতা পর্য্যন্ত বাদ দেয় না।

—বল কি?

—এই যাবার সময় দেখবেন সত্যি না মিথ্যে। যত বেলা হবে, তত লোক বাড়বে, বিলির জল লোকের পায়ে পায়ে ঘোল দই হয়ে যাবে কাদা ঘুলিয়ে। এক-একজন কাদামাখা পেত্নীর মত চেহারা হয়েছে—তবুও সেই কাদা জলে ডুব দিয়ে দিয়ে পদ্মের মূল, গেঁড়ি গুগলি এসব খুঁজে বেড়াচ্চে। চেহারা দেখলি ভয় হয়। তাও কি পাচ্চে বাবাঠাকুর? বিল তো আর অফুরন্ত নয়। যা ছিল, তিন দিনের মধ্যি প্রায় সাবাড় হয়ে গিয়েচে। এখন মনকে চোখ ঠারা।

—তবে যাচ্ছে কেন?

আর তো কোথাও কিছু খাবার নেই। যদি তবুও বিলের মধ্যি খুঁজলি পাওয়া যায়। ভেবে দেখুন বাবাঠাকুর, আপনাকে যদি চাল বেচি, তবে একদিন আমার বাড়ীর ঝি-বউদের অমনি করে পাঁক মেখে বিলের জলে নামতি হবে দুটো গেঁড়ি-গুগলি ধরে খাবার জন্য। চলুন, বাবাঠাকুর, আসুন, দুটো খেয়ে যান। পেট ভর্তি চাল দেবো এখন।

গঙ্গাচরণ ফিরলো। মাছের ঝোল ভাত—গেঁড়ি-গুগলি সেদ্ধ নয়। এখনো এ গ্রামে এ দিনেও ভাত খেতে পাওয়া যাচ্চে। এর পরে আর পাওয়া যাবে কি না কে জানে।

গোয়ালঘর নিকিয়ে পুঁছে দিলে নিবারণের বিধবা বড় মেয়ে ক্ষ্যান্তমণি। কাঠা নিয়ে এসে এক পাশে রাখলে। গঙ্গাচরণ পুকুরের জলে স্নান করে আসতেই ক্ষ্যান্তমণি তসরের কেটে কাপড় কুঁচিয়ে হাতে দিলে। রান্নার জন্যে কুটনো বাটনা সব ঠিক্ করে এনে দিলে। একবার হেসে বললে—দাদাঠাকুর, অতটা নুন? পুড়ে যাবে যে বেন্নন।

—দেবো না?

—বেগুন মুখে দিতে পারবেন না। আপনার রসুই করবার অভ্যেস নেই বুঝি ?

—না।

—আপনি বসে বসে রাঁধুন, আমি দেখিয়ে দিচ্চি।

ক্ষ্যান্তমণি যে বেশ ভাল মেয়ে, গঙ্গাচরণ অল্প সময়ের মধ্যেই তা বুঝতে পারলে। কোথা থেকে একটু আখের গুড, গাওয়া ঘি যোগাড করে নিয়ে আসে। যাতে গঙ্গাচরণের খাওয়াটা ভাল হয়, সেদিকে খুব লক্ষ্য। খেতে বসে গঙ্গাচরণের কিন্তু ভাত যেন গলা দিয়ে নামে না—আশ্চর্যের কথা, হাবুর জন্যে দুঃখ নয়, পটলার জন্যেও নয়—দুঃখ হলো অনঙ্গ-বৌয়ের জন্যে। সে আজ দু'দিন খায় নি। তার চেয়ে হয়তো আরও বেশি দিন খায় নি। মুখ ফুটে তো কোনো দিন কিছু বলে না।

—আর একটু আখের গুড দি ?

—না। এ দুধ তো খাঁটি, গুড দিলে সোয়াদ নষ্ট হয়ে যাবে।

এমন ঘন দুধের বাটিতে হাত ডুবিয়ে সে খাচ্চে এখানে, ওখানে অনঙ্গ-বৌ হয়তো উঠোনের কাঁটানটের শাকের বনে চুবডি নিয়ে ঘুরচে, অখাদ্য কাটানটে শাক তুলবার জন্যে। নইলে বেলা হোতে না হোতে পাডার ছেলেমেয়েরা এসে জুটবে। তাদের উৎপাতে গাছের পাতাটি থাকবার যো নেই।

ক্ষ্যান্তমণি পান আনতে গেল। পাতে দুটি ভাত পডে আছে—গঙ্গাচরণের প্রবল লোভ হলো ভাত দুটি সে বাডী নিয়ে যায়। কিন্তু কি করে নিয়ে যাবে ? চাদরের মুডোয় বেঁধে ? ছিঃ—ওমাই টের পাবে। এঁটো ভাত ব্রাহ্মণ হয়ে চাদরের মুডোয় বেঁধে নেবে ?

গঙ্গাচরণ বসে বসে মতলব ভাজতে লাগলো। কি করা যাবে ? বলা যাবে কি এই ধরনের যে, আমাদের বাডী একটা কুকুর আছে তার জন্যে ভাত কটা নিয়ে যাবো ? তাতে কে কি মনে করবে ? বড লজ্জা করে যে ! অনেকগুলো ভাত নয় বটে, তবুও চার-পাঁচ গ্রাস হবে অনঙ্গ-বৌয়ের। বড বড চার-পাঁচ গ্রাস। ...নিয়ে যাবেই সে। কিসের লজ্জা ? এমন সময়ে ক্ষ্যান্তমণি এসে পান দিতেই ওর মুখের দিকে চেয়ে গঙ্গাচরণের সাহস চলে গিয়ে রাজ্যের লজ্জা-সঙ্কোচ এসে জুটলো। দিব্যি সুন্দরী মেয়ে, যৌবন-পুষ্ট দেহটির দিকে বার বার চেয়ে দেখেও আশ মেটে না। কালো চুল মাথায় একতাল, নাকের ডগায় একটা ছোট্ট তিল। মুখে দু-দশটা বসন্তের দাগ আছে বটে, তবুও ক্ষ্যান্তমণির সুশ্রী মুখ।

গঙ্গাচরণ বললে—ক্ষ্যান্ত, তোমার বসন্ত হয়েছিল ?

—হ্যাঁ দাদাঠাকুর। আজ তিন বছর আগে।

—ডাবের জল দিয়ে মুখ ধুলে ও দাগ কটা আর থাকতো না।

আপনিও যেমন দাদাঠাকুর। আর কি হবে মুখের চেহারা নিয়ে বলুন। সে দিন চলে গিয়েচে, কপাল যেদিন পুড়েচে, হাতের নোয়া ঘুচেছে। এখন আশীর্বাদ করুন, যেন ভালোয় ভালোয় যেতে পারি।

তারপর চুপি চুপি বললে—আপনি ওই পুকুরের বাঁশঝাড়ের ধারে দাড়িয়ে থাকুন গিয়ে।

গঙ্গাচরণ সবিস্ময়ে বললে কেন ?

—চুপ চুপ। বাবাকে লুকিয়ে ডুটো চাল দিচ্চি আপনাকে। কাউকে বলবেন না। আধ পালিটাক চাল আমি আলাদা করে রেখে দিইচি আপনার রান্নার চাল আনবার সময়। নিয়ে যান চাল কটা। আপনার মন খারাপ হয়েচে বাড়ীর জন্যি, আমি তা বুঝতে পেরেচি।

মেয়েরাই লক্ষ্মী। মেয়েরাই অন্নপূর্ণা। বুভুক্ষু জীবের অন্ন ওরাই দু'হাতে বিলোয়। ক্ষ্যান্তমণিকে আঁচলের মুড়োতে লুকিয়ে চাল আনতে দেখে দূর থেকে গঙ্গাচরণের এই কথাই মনে হলো। ক্ষ্যান্ত গঙ্গাচরণের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—হাতে করে ডুটো চাল দেবো ব্রাহ্মণকে, এ কত ভাগ্যি ! কিন্তু বাবাঠাকুর, যে আকাল পড়েচে, তাতে কাউকে কিছু দেবার যো নেই। সবাই অদেষ্ট। নিয়ে যান—

—লুকিয়েই নিয়ে যাচ্ছি—

—না লুকিয়ে নিয়ে গেলে লোকে চেয়ে নেবে। না দিলি কান্নাকাটি করবে এমন মুশকিল হয়েচে।...আমাদের গাঁয়ে তো দোর বন্ধ না করে ডুপুরে খেতে বসবার যো নেই। সবাই এসে বলবে, ভাত দ্যাও। দেখে দুঃখুও হয়—কিন্তু কতজনকে ভাত দেবেন আপনি ? খ্যামতা যখন নেই, তখন দোর বন্ধ করে থাকাই ভালো। একটা কথা বলি—

—কি ?

—যদি কখনো এমন হয়, না খেয়ে থাকতি হয়, তবে আমার কাছে আসবেন, আমি যা পারি দেবো। আমার নিজের সোয়ামী পুত্তুর নেই, দেবতা ব্রাহ্মণের সেবাও যদি না করলাম, তবে জীবনে করলাম কি বলুন !

বাড়ী ফিরবার পথে নসরাপুরের বিলের ধারে একটা দোকান। বেলা পড়ে এসেছে। দোকানীকে তামাক খেতে দেখে গঙ্গাচরণ দোকানে গিয়ে উঠে বললে—তামাক খাওয়াও দিকি একবার—

দোকানী বললে—আপনারা ?

—ব্রাহ্মণ !

—পেরণাম হই।

দোকানী উঠে গিয়ে একটা কলার পাতা নিয়ে এসে ঠোঙা করে কল্কে বসিয়ে গঙ্গাচরণের হাতে দিলে। বললে—আপনার নিবাস ?

—নতুন পাড়া, চর পোলতা।

—গিয়েছিলেন কোথায় ?

—নিবারণের বাড়ী, ও গাঁয়ের নিবারণ ঘোষ।

—বাবাঠাকুরের পুঁটুলিতে কি ? চাল ?

—হ্যাঁ বাপু।

—ঢেকে রাখুন। এসব দিকে বড্ড আকাল। এখুনি এসে ঘ্যান ঘ্যান করবে সবাই।

গঙ্গাচরণ বসে থাকতে তিন-চারটি দুলে বাগদি জাতীয় স্ত্রীলোক এসে আঁচলে বেঁধে কলাই নিয়ে গেল। একজন নিয়ে গেল অপকৃষ্ট পাতা চা ও একটা ছোট্ট পাথরবাটিতে একবাটি গুড়। দোকানী বললে—বসুন ঠাকুরমশায়—

—না বাপু, আমি যাবো অনেক দূর, উঠি।

—না, একটু চা খেয়ে যেতেই হবে। আর তো কিছু দেওয়ার নেই, বসুন—

—চা খাবো আবার—

—হ্যাঁ, একটুখানি খেয়ে যান দয়া করে।

—আরও পাঁচ-ছ'টি খদ্দের দোকানে এল গেল। সকলেই নিয়ে গেল কলাই। শুধু কলাই, আর কিছু নয়।

চা একটু পরে তৈরি হয়ে এল, একটা কাঁচের গ্লাসে করে দোকানী ওকে চা দিলে। গঙ্গাচরণ লক্ষ্য করলে দোকানের মধ্যে তাকে, মেজের ওপর, নানা জায়গায় পেতল কাঁসার বাসন থরেথরে সাজানো। বেশির ভাগ থালা আর বড় বড় জাম বাটি। গঙ্গাচরণ ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না, এরা কি কাঁসারি ? বাসন বিক্রির জন্যে কেন এত ?

দোকানী আবার তামাক সাজলে। গঙ্গাচরণের মনের কথা বুঝতে পেরে বললে—ও বাসন অত দেখচেন, ওসব বাঁধা দিয়ে গিয়েচে লোকে। এ গাঁয়ে বেশীর ভাগ তুলে বাগদি আর মালো জাতের বাস। নগদ পয়সা দিতি পারে না, ওই সব বাসন বাঁধা দিয়ে তার বদলে কলাই নিয়ে যায়।

—সবাই কলাই খায়?

—তা ছাড়া কি মিলবে ঠাকুরমশায়। ওই খাচ্চে—

—তোমার চাল নেই?

—না ঠাকুরমশায়।

—আমি দাম দেবো, সত্যি কথা বলো। নগদ দাম দেবো।

—না, ঠাকুরমশায়। হাত জোড় করে বলচি ও অনুরোধ করবেন না?

—তোমরা কি খাও বাড়ীতে?

—মিথ্যে কথা বলবো না, ভাত চার আনা, কলাই বারো আনা। ডাঁটা শাক দুটো করেলাম বাড়ীতে, তা সে রাখবার উপায় নেই। দিনমানেই ক্ষেতে লোকজন মেয়েছেলে, খোকাখুকীরা ঢুকে গোছা গোছা উপড়ে নিয়ে যাচ্চে। সাবাড় করে দিয়েচে সব। কিছু রেখে খাবার যো নেই। চালকুমড়ো ফলেছিল গোটাকতক এই দোকানের চালে, কে তুলে নিয়ে গিয়েচে।

গঙ্গাচরণ তামাক খাওয়া সেরে ওঠবার যোগাড় করলে। দোকানী বললে—ঠাকুরমশায়, কলাই নেবেন?

—দাও।

—নিয়ে যান সেরখানেক। এর দাম আপনাকে দিতে হবে না। আর একটা জিনিস—দাঁড়ান, গোটাকতক পেয়ারা দিই নিয়ে যান, আমার গাছের ভালো পেয়ারা—তাও আর কিছু নেই, সব পেড়ে নিয়ে গেল ওরা। আমি ডাসা দেখে দশ-বারোটা জোর করে কেড়ে নিয়ে রেখেছিলাম।

গঙ্গাচরণ বাড়ী পৌছে দেখলে অনঙ্গ-বৌ চুপ করে শুয়ে আছে। এমন সময়ে সে কখনো শুয়ে থাকে না।

গঙ্গাচরণ জিজ্ঞেস করলে—শুয়ে কেন? শরীর ভালো তো? দেখি—

অনঙ্গ-বৌ যন্ত্রণাকাতর স্বরে বলকে—কাউকে ডাকো।

—ডাকবো?

—কাপালীদের বড় বৌকে ডাকো চট করে। শরীর বড্ড খারাপ।

গঙ্গাচরণ বড় ছেলেকে বললে—দৌড়ে যা কাপালী-বাড়ী—বলগে এক্ষুণি আসতে হবে। মার শরীর খারাপ—

অনঙ্গ-বৌ যন্ত্রণায় চীৎকার করতে লাগলো, কখনো ওঠে কখনো বসে। যুপবদ্ধ আর্ত পশুর মত চীৎকার। গঙ্গাচরণ নিরুপায় অবস্থায় বাইরের দাওয়ায় বসে তামাক টানতে লাগলো। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েচে, আকাশে পঞ্চমী তিথির এক ফালি চাঁদও উঠেচে। ঝিঁঝিঁ ডাকচে সেবু-ঝোপে। গঙ্গাচরণ আর সহ্য করতে পারচে না অনঙ্গ-বৌয়ের চীৎকার। ওর চোখে প্রায় জল এল। ততক্ষণে বাড়ীর মধ্যে আশপাশের বাড়ীর মেয়েছেলে এসে গিয়েচে।

ওদের মধ্যে একজন বর্ষীয়সীকে ডেকে গঙ্গাচরণ উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ দিদিমা, বলি ও অমন করছে কেন?

ঠিক সেই সময় একটা যেন মৃদু গোলমাল উঠলো। একটি শিশু কণ্ঠের ট্যাঁ-ট্যা কান্না শোনা গেল। বারকয়েক শাঁক বেজে উঠলো।

সতীশ কাপালীর মেয়ে বিন্দি বাড়ীর ভেতর থেকে ছুটে এসে বললে—ও দাদাবাবু, বৌদিদির খোকা হয়েচে—এখন সন্দেশ বের করুন আমাদের জন্যে—দিন টাকা—

গঙ্গাচরণের চোখ বেয়ে এবার সত্যিই ঝর ঝর করে জল পড়লো

তার পর দিন কতক সে কি কষ্ট! প্রসূতিকে খাওয়ানোর কি কষ্ট! না একটু চিনি, না আটা, না মিছরি। অনঙ্গ-বৌ শুয়ে থাকে, নবজাত শিশু ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদে, গঙ্গাচরণ কাপালীদের বড়-বৌকে বলে—ওর খিদে পেয়েছে, মুখে একটু মধু দাও খুড়ী—

—মধু খেয়ে বমি করেচে দুবার। মধু পেটে রাখছে না।

—তবে কি দেবে খুড়ী, দুধ একটু জল দিয়ে দেবো?

—অত ছোট ছেলে কি গাইয়ের দুধ খেতে পারে? আর ইদিকে আঁতুড়ে পোয়াতি ঘরে, তার খাবার কোনো যোগাড় নেই। হিম হয়ে বসে থাকলে চলবে না বাবাঠাকুর, এর যোগাড় কর।

গ্রামে কোনো কিছু মেলে না, হাটেবাজারেও না। আটা সুজি বা চিনি আনতে হলে যেতে হবে মহকুমা শহরে সাপ্লাই অফিসারের কাছে। গঙ্গাচরণ দু-একজনের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলে, মহকুমা শহরেই যেতে হবে।

সাড়ে সাত ক্রোশ পথ।

সকালে রওনা হয়ে বেলা এগারোটার সময় সেখানে পৌছলো। এখানে দোকানে অনেক রকম জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। গঙ্গাচরণের হাতে পয়সা নেই, জলখাবারের জন্য মাত্র দু'আনা রেখেছিল, কিন্তু খাবে কি, চিঁড়ে পাঁচসিকে সের মুড়িও তাই। মুড়কি চোখে দেখবার যো নেই। দু'আনার মুড়ি একটা ছোট্ট বাটিতে ধরে।

ক্ষেত্র কাপালী বললে—ও দাদাঠাকুর, এ যে ভয়ানক কাণ্ড দেখছি। খাবা কি?

গঙ্গাচরণ ও ক্ষেত্র কাপালী সাপ্লাই অফিসারের আপিসে এসে দেখলে সেখানে রথযাত্রার ভিড। আপিসঘরের জানালা দিয়ে পারমিট বিলি করা হচ্চে, লোকে জানালার কাছে ভিড করে দাঁড়িয়ে পারমিট নিচ্চে। সে ভিড়ের মধ্যে ছত্রিশ জাতির মহাসম্মেলন। দস্তুরমত বলবান ব্যক্তি ছাড়া সে ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ অসম্ভব। ঘরের মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে তাড়া শোনা যাচ্চে, লোক জন কিছু কিছু পিছিয়ে আসচে, কিছুক্ষণ পরেই আবার পূর্বের অবস্থা, ভিড়ের স্থিতিস্থাপকত্ব দিব্যি বেশি।

গঙ্গাচরণ হতাশভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে। ভিড় কমবার নাম নেই, —বরং ক্রমবর্ধমান। গরমও তেমনি, আকাশে মেঘ জমে গুমটের সৃষ্টি করেচে। এক ঘণ্টা কেটে গেল—হঠাৎ ঝুপ করে জানলা বন্ধ হয়ে গেল। শোনা গেল হাকিম আহার করতে গেলেন, আবার কখন আসবেন তার কিছু ঠিক নেই। ভিড় ক্রমে পাতলা হয়ে এল--লোকজন কতক গিয়ে আপিসের সামনে নিমগাছের তলায় বসে বিড়ি টানতে লাগলো।

ক্ষেত্র কাপালী বললে- ঠাকুরমশাই, কি করবেন?

—বসি এসো।

—চলুন, বাজারে গিয়ে খোঁজ করি। যদি দোকানে পাই। এ ভিড়ে ঢুকতি পারবেন না।

বাজারে গিয়ে প্রতি দোকানে খোঁজ করা হলো। জিনিস নেই কোনো দোকানে। পাতিরাম কুণ্ডুর বড় দোকানে গোপনে বললে—সুজি দিতে পারি দেড় টাকা সের। লুকিয়ে নিয়ে যাবেন সন্দের পর।

ক্ষেত্র কাপালী বললে—আটা আছে?

—আছে, বারো আনা করে সের।

—মিছরি ?

—দেড় টাকা সের। সন্দের পর বিক্রি হবে।

গঙ্গাচরণ হিসেব করে দেখলে কাছে যা টাকা আছে, তাতে বিশেষ কিছু কেনা হবে না। পারমিট পেলে সস্তায় কিছু বেশী জিনিস পাওয়া যেতে পারে। আবার ওরা দুজনে সাপ্লাই অফিসারের আপিসে এল, তখন ভিড় আরও বেড়েচে, কিন্তু জানালা খোলে নি।

একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসে আছেন। গঙ্গাচরণ বিড়ি খাওয়ার জন্য তাঁর কাছে গেল। জিজ্ঞেস করলে—আপনার নিবাস কোথায় ?

—মলিপোতা।

—সে তো অনেক দূরে। কি করে এলেন ?

—হেঁটে এলাম, আবার কিসে আসবো ? গরীব লোক, এ বাজারে নৌকো কি গাড়ীভাড়া করে আসবার খ্যামতা আছে ?

—কি নেবেন ?

—কিছু খাবার নেই ঘরে। আমার বিধবা পিসি ঘরে, তাঁর একাদশী আসচে। দশমীর দিন রাত্তিরে দুখানা রুটি করেও তো খাবেন। তাই আটা নিতে এসেচি।

—চাল পাচ্ছেন ওদিকে ?

—পাবো না কেন, পাওয়া যায়। দু'টাকা কাঠা—তাও অনেক খুঁজে তবে নিতে হবে। খাওয়া হয় না মাঝে মাঝে।

এই সময় জানালা খোলার শব্দ হতেই লোকের ভিড় সেই দিকেই ছুটলো। গঙ্গাচরণ বৃদ্ধের হাত ধরে বললে—শীগগির আসুন, এর পর জায়গা পাবেন না—

তাও এরা পিছিয়ে পড়ে গেল। অতগুলো মরীয়া লোকের সঙ্গে দৌড়পাল্লায় প্রতিযোগিতা করা এদের পক্ষে সম্ভব হলো না। এদের পক্ষে বেশির ভাগ এসেচে আটা যোগাড় করতে।

একজনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল সে দুপুরবেলা চাল যোগাড় না করতে পেরে উপবাসে আছে, একটু আটা নিয়ে গেলে তবে তার দিনের আহার পেটে পড়বে। তারা মরীয়া হবে না তো মরীয়া হবে কে ?

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর গঙ্গাচরণ জানালার সামনে দাঁড়াবার জায়গা পেলে।

সাপ্লাই অফিসার টানা টানা কড়া সুরে জিজ্ঞেস করলেন—কি ?

গঙ্গাচরণের ভরসা ছিল তার চেহারার দিকে চাইলে সাপ্লাই অফিসার ভদ্রলোক বা ব্রাহ্মণ বলে খাতির করবে। কিন্তু তাতে নিরাশ হতে হলো, কারণ হাকিম চোখ তুলে তার দিকে চাইলেনই না। তাঁর চোখ টেবিলের ওপরকার কাগজের দিকে। হাতে কলের কলম, অর্থাৎ যে কলম কালিতে ডোবানোর দরকার হয় না।

গঙ্গাচরণের গলা কেঁপে গেল, বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। হাত-পা কাঁপতে লাগলো।

সে বললে—হুজুব, আমার স্ত্রী আঁতুড়ের। কিছু খাবার নেই, আঁতুড়ের পোয়াতি, কি খায়, না আছে একটু আটা—

হাকিম ধমকের স্বরে বললেন—আঃ কি চাই ?

—আটা, চিনি, সুজি, একটু মিছরি—

—ওসব হবে না।

—না দিলে মরে যাবো হুজুর। একটু দয়া করে—

—হবে না। আধসের আটা হবে, এক পোয়া সুজি, একপোয়া মিছরি—

বলেই খস্ খস্ করে কাগজ লিখে হাকিম গঙ্গাচরণের হাতে তুলে দিয়ে বললেন—যাও—

—হুজুর, পাঁচ-ছ'কোশ দূর থেকে আসচি। এতে ক'দিন হবে হুজুর। দয়া করে কিছু বেশি করে দিন—

—আমি কি করবো ? হবে না। যাও—

গঙ্গাচরণ হাত জোড করে বললে—গরীব ব্রাহ্মণ, দয়া করে আমায়—

হাকিম বিরক্তির সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বললেন—দেখি কাগজ ? যাও, এক সের আটা—যত বিরক্ত।

লোকজনের ধাক্কায় গঙ্গাচরণকে ছিটকে পড়তে হলো জানলা থেকে। পেছন থেকে দু-একজন বলে উঠলো—ওমা, দেরি করো কেন ? কেমন ধারা লোক তুমি ? সরো—

চাপরাশি চেঁচিয়ে বললে—হঠ্ যাও—

বাজারে দোকান থেকে আটা কিনতে গিয়ে দেখলে আটা এবং সুজি দুই খারাপ। একেবারে খাদ্যের অনুপযুক্ত নয় বটে তবে জিনিস ভালও নয়।

একটা ময়রার দোকানে ওরা খাবার খেতে গেল। ক্ষেত্র কাপালীর বড় ইচ্ছে সে গরম সিঙাড়া খায়। শহর বাজারে তো প্রায় আসা হয় না—থাকে

নিতান্ত অজ পাড়াগাঁয়ে। কিন্তু খাবার দোকানে সিঙাড়া কিনতে গিয়ে সে দেখলে পানের খিলি অপেক্ষা একটু বড় সিঙাড়া একখানার দাম দু পয়সা। জিনিসপত্রের আগুন দর। সন্দেশের সের এ অঞ্চলে চিরকাল ছিল দশ আনা বারো আনা, এখন তাই হয়েছে তিন টাকা। রসগোল্লা দু'টাকা।

ক্ষেত্র কাপালী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—কোনো জিনিস কিনবার জো নেই ঠাকুরমশাই!

—তাই তো দেখচি—

—কি খাবো বলুন তো। এ তো দেখচি এক টাকার কম খেলি পেট ভরবে না। আপনি খাবা না?

—না, আমি কি খাবো। আমার খিদে নেই।

—সে হবে না ঠাকুরমশাই। আমার কাছে যা পয়সা আছে, দুজনে ভাগ করে খাই।

গঙ্গাচরণ ধমক দিয়ে বললে—কেন মিছে মিছে বাজে কথা বলিস? খেয়ে নিগে যা—

কিন্তু গঙ্গাচরণের বড় লোভ হলো একখানা থালায় সাজানো বড় বড় জোড়া সন্দেশ দেখে। তার নিজের জন্যে নয়, অনঙ্গ-বৌ কতকাল কোন জিনিস খায় নি। ওর জন্যে যদি দুখানাও নিয়ে যাওয়া যেতো।

ক্ষেত্র কাপালী গরম সিঙাড়া খেয়ে জল খেয়ে পানের দোকানে পান কিনতে গিয়েচে—ও তখন ময়রাকে বললে—তোমার ঐ জোড়া সন্দেশের দাম কত?

—চার আনা করে

—দু খানা চার আনা?

—সেকাল নেই ঠাকুর। একখানার দাম চার আনা।

গঙ্গাচরণ অবাক হলো। ওই জোড়া সন্দেশের একখানির দাম ছিল এক আনা। সেই জায়গায় একেবারে চার আনা! সে কি কেনা ওর চলবে? অসম্ভব। হাতে অত পয়সা নেই। গঙ্গাচরণ বার বার জোড়া সন্দেশের দিকে চাইতে লাগলো। সুন্দর সন্দেশ গড়েচে। কারিগর ভালো।

ঠোঙা থেকে বের করেই যদি অনঙ্গর হাতে দেওয়া যেতো!

—ওগো, ছাখো কি এনেচি—

—কি গা?

—কেমন জোড়া সন্দেশ, দেখেচ? তোমার জন্য নিয়ে এলাম।

কখনো স্ত্রীর হাতে কোন ভালো খাবার তুলে দেয় নি। পাবেই বা কোথায়? কবে সচ্ছল পয়সার মুখ দেখেচে সে? তার ওপর এই ভীষণ মন্বন্তর।

ক্ষেত্র কাপালীর কাছেও পয়সা নেই যে ধার করবে। সে পেটুক ব্যক্তি। বসে বসে, যা কিছু এনেছিল, জিলিপি আর সিঙাড়া কিনেই ব্যয় করেচে।

বেলা পড়ে এসেচে। নদীর ধার দিয়ে দিয়ে রাস্তা। দুজনে পথ হেঁটে চললো গ্রামের দিকে। ক্ষেত্র কাপালী বিড়ি টানচে আর বকবক করে বকচে। গঙ্গাচরণ চাদরের প্রান্তে দুটি মুড়ি-মুড়কি বেঁধে নিয়েচে—মাত্র দু'আনার। এত অল্প জিনিস যে কয়েক মুঠো খেলেই ফুরিয়ে যাবে। ছেলে দুটো বাড়ীতে আছে, বলবে এখন, বাবা কি এনেচ আমাদের জন্যে? ছেলেমানুষ, তারা কি মন্বন্তর বোঝে? তাদের জন্যে দুটো নিয়ে যেতে হবে, দুটো ও খাবে একটা ভাল পরিষ্কার জায়গায় বসে। খেয়ে নদীর জল পান করবে। সারাদিন অনাহার, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দুই প্রবল।

এক জায়গায় গাছতলায় বসে গঙ্গাচরণ দু'তিন মুঠো মুড়ি-মুড়কি খেয়ে নিজে জলে নামতে গিয়ে দেখলে একটা শেওলা দামের ওপারে অনেক কলমী শাক। আজকাল দুর্লভ, শাকপাতা কি লোকে রাখচে? ক্ষেত্র কাপালীকে বললে—জলে নামতে পারবি? শাক নিয়ে আয় তো দিকি—

ক্ষেত্র কাপালী গামছা পরে জলে নেমে একগলা জল থেকে দাম টেনে এনে কলমীলতার ঝাঁক ডাঙার কাছে তুললে। তারপর দুজনে মিলে শাক ছিঁড়ে বড় দু'আটি বাঁধলে। বাড়ী ফিরতেই অনঙ্গ-বৌ ক্ষীণস্বরে ডেকে বললে—ওগো, এলে? এদিকে এসো।

—কেমন আছ?

—এখানে বোসো। কোথায় গিইছিলে এতক্ষণ? কতক্ষণ যেন দেখি নি—

—টাউনে গেলাম তো। তোমাকে বলেই তো গেলাম। জিনিসপত্র নিয়ে এলাম সব।

অনঙ্গ নিস্পৃহ, উদাস সুরে বললে—বোসো এখানে। সারাদিন টো টো করে বেড়াও কোথায়? তোমায় একটুও দেখতে পাই নে।

গঙ্গাচরণের মনে বড় কষ্ট হলো ওকে দেখে। বড় দুর্বল হয়ে পড়েচে অনঙ্গ-বৌ। এমন ধরনের কথাবার্তা ও বড় একটা বলে না। এ হলো দুর্বল

রোগীর কথাবার্তা। অনাহারে শীর্ণ, দুর্বল হয়ে পড়েচে, কতকাল ধরে পেট পুরে খেতে পেতো না, কাউকে কিছু মুখ ফুটে বলা ওর স্বভাব নয়, কত সময় নিজের বাড়া ভাত অপরকে খেতে দিয়েচে। শরীর সে সবের প্রতিশোধ নিচ্চে এখন।

গঙ্গাচরণ সস্নেহে বললে—তুমি ভাল হয়ে ওঠো। তোমাকে জোড়া সন্দেশ এনে খাওয়াবো টাউন থেকে। হরি ময়রা যা সন্দেশ করেচে! দেখলে খেতে ইচ্ছে করে।

অনঙ্গ-বৌ আঁতুড় থেকে বেরিয়েচে, কিন্তু বড় দুর্বল, শীর্ণদেহ। খেতেই পায় না তা সারবে কোথা থেকে। গঙ্গাচরণ প্রাণপণে চেষ্টা করে খাবারের এটা সেটা যোগাড করতে, কিন্তু পেরে ওঠে না। একটু ঘি কত কষ্টে গঙ্গানন্দপুরের শশী ঘোষের বাড়ী থেকে যোগাড় করে নিয়ে এল। তাও ঘোষমশায় আট টাকা সেরের কমে ছাড়তে চায় না। ব্রাহ্মণত্বের দোহাই দিয়ে অনেক করে ঘিটুকু যোগাড় করা।

ঘি যদি বা মেলে দূর গ্রামে, নিজ গ্রামে না মেলে একটু দুধ, না একটু মাছ।

অনঙ্গ-বৌ বললে—ওগো, তুমি টো টো করে অমন বেড়িও না। তোমার চেহারাটা খারাপ হয়ে গিয়েচে। আয়নায় মুখখানা একবার দেখো তো—

গঙ্গাচরণ বললে—দেখা আমার আছে। তুমি ঠাণ্ডা হও তো।

—চাল পেয়েছিলে?

—অল্প যোগাড করেছিলাম কাল।

—তোমরা খেয়েছ?

—হুঁ।

অনঙ্গ-বৌ আঁতুড় থেকে বেরুলেও নড়তে চড়তে পারে না—শুয়েই থাকে। রান্না করে গঙ্গাচরণ ও হাবু। পাঠশালা আজকাল সবদিন হয় না। বিশ্বাসমশায় এখান থেকে সরে যাওয়াতে পাঠশালার অবস্থা ভালো নয়। এ দুর্দিনে আকস্মিক বিপৎপাতের মত দীনু ভট্চায একদিন এসে হাজির। গঙ্গাচরণ পাঠশালাতে ছেলে পড়াচ্চে।

—এই যে পণ্ডিত মশায়!

গঙ্গাচরণ চমকে গেল। বললে—আসুন, কি ব্যাপার?

—এলাম।

—ও, কি মনে করে?

—মা ভালো আছেন?

—হুঁ।

—সন্তানাদি কিছু হলো?

—হয়েচে।

গঙ্গাচরণ তখনও ভাবচে, দীনু ভট্টচাযের মতলবখানা কি। ভট্চায কি বাড়ী যেতে চাইবে নাকি? কি মুশকিলেই সে পড়েচে। কত বড় লোক আছে দেশে, তাদের বাড়ীতে যা না কেন বাপু। আমি নিজে পাইনে খেতে, কোনো রকমে ছেলে দুটোর আর রোগা বউটার জন্যে দুটি চাল আটা কত কষ্টে যোগাড় করে আনি, ভগবান তা জানেন। থাকে থাকে, এ ভ্যাজাল কোথা থেকে এসে জোটে তার মধ্যে।

দীনু একটা ছেলেকে উঠিয়ে তার কেরোসিন কাঠের বাক্সটার ওপর বসলো, তারপর গলার উড়ুনিখানা গলা থেকে খুলে হাঁটুর ওপর রেখে বললে—একটু জল খাওয়াতে—

হ্যাঁ হ্যাঁ। ওরে পটলা, টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে আয় দিকি ঘটিটা মেজে।

—একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে, বলচি, জলটা খাই। তেষ্টায় জিব শুকিয়ে গিয়েচে।

জলপান করে দীনু একটু সুস্থ হয়ে বললে—আঃ!

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর দীনুই প্রথম বললে—বড় বিপদে পড়েচি পণ্ডিতমশাই—

—কি?

—এই মন্বন্তর, তার ওপর চাকরিটা গেল।

—পাঠশালার চাকরি?

—হ্যাঁ মশাই। হয়েচে কি, আমি আজ ন'টি বছর কামদেবপুর পাঠশালায় সেকেন পণ্ডিতি করচি, মাইনে আগে ছিল সাড়ে তিন টাকা, এখন দেয় পাঁচ টাকা। তা মশাই গোয়ালা হলো ইস্কুলের সেক্রেটারি। আজ পাঁচ মাস হলো কোথা থেকে এক গোয়ালার ছেলে জুটিয়ে এনে তাকে দিয়েচে চাকরি।

সে করলে কি মশাই দার্জিলিং গেল বেড়াতে। সেখান থেকে এসে উন্মাদ পাগল হয়ে গেল·—

—কেন কেন ?

—তা কি করে জানবো মশাই। কোথাকার নাকি ফটোগেরাপ তুলতে গিয়েছিল, সায়েবে কি খাইয়ে দেয়—এই তো শুনতে পাই। মশাই, তুমি পাও পাঁচ টাকা মাইনে, তোমার সেই দার্জিলিং—দার্জিলিং-এ যাওয়ার কি দরকার ? সেখানে সায়েব-সুবোদের জায়গা। বাঙালীরা সেখানে গেলে পাগল করে দেয় ওযুধ খাইয়ে। সাধে কি আর বলে—

—সে যাক, আসল কথাটা কি সংক্ষেপে বলুন—

—তারপর সে ছোকরা আজ তিন মাস পরে এসে জুটেচে। এখন আর পাগল নেই, সেরে গিয়েচে ! তাকে নেবে বলে আমায় বললে—আপনি এক মাস ছুটির দরখাস্ত করুন—

—আপনি করে দিলেন ?

—দিতে হলো। হেড়মাস্টার নিজে আমার টেবিলে এসে বলে লিখুন দরখাস্ত। লিখলাম। কি আর করি। তখুনি মঞ্জুর করে দিলে। এখন দেখুন বিপদ। ঘরে নেই চাল, তার ওপর নেই চাকরি। কি আমি এখন করি। বাড়ীসুদ্ধ যে না খেয়ে মরে। তাই ভাবলাম যাই আপনার কাছে। একটা পরামর্শ দ্যান। আর তো কেউ নেই যে তাকে দুঃখের কথা বলি।

গঙ্গাচরণ মনে মনে বললে—দুঃখের কথা একবার ছেড়ে একশো বার বলো। কিন্তু বাড়ী যেতে চাও যদি, তবেই তো আসল মুশকিল। দীনু ভট্চাযের মতলবখানা যে কি, তা গঙ্গাচরণ ধরতে না পেরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। ছেলে দুটির চাল জোটানো যাচ্চে না, বউটার জন্যে কত কেঁদেককিয়ে এক সের আটা নিয়ে আসা, এই সময় দীনু ভট্চায যদি গিয়ে ঘাড়ে চাপে, তবে চোখে অন্ধকার দেখতে হবে যে দেখচি। স্ত্রীও এমন নির্বোধ, যদি ও গিয়ে হাজির হয় আর কাঁদুনি গায় তার সামনে, তবে আর দেখতে হবে না। মুখের ভাত বেড়ে দেবে। নিজে না খেয়ে ঐ বুড়োটাকে খাওয়াবে।

নাঃ, কি বিপদেই সে পড়েচে।

এখন মতলবখানা কি বুড়োর ?

বসে বসে গঙ্গাচরণ আকাশপাতাল ভাবতে লাগলো।

যদি ছুটির পরে দীনু ভট্টচায তার সঙ্গে তার বাড়ী যেতেই চায় তবে?

না, ও চলবে না। একটা কিছু ফন্দি বার না করলেই চলবে না। এমন কিসের খাতির দীনু ভট্টচাযের সঙ্গে যে নিজের স্ত্রী-পুত্রের মুখ বঞ্চিত করে ওকে খেতে দিতে হবে?

দীনু ভট্‌চায বলে—ছুটি দেবেন কখন?

—ছুটি? এখনও অনেক দেরি।

—সকাল বিকেল করেন না এক বেলাই?

—এক বেলা।

গঙ্গাচরণ তামাক সেজে খাওয়ালে নিজের হাতে দীনুকে।

দীনু তামাক খেয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হুঁকোটি গঙ্গাচরণের হাতে দিয়ে বললে—এখন বড় যে বিপদে পড়ে গেলাম। চাকরি নেই, হাতে একটা পয়সা নেই—আপনার কাছে বলতে কি, আজ দু'দিন সপরিবারে না খেয়ে খিদের জ্বালায় ছুটে এলাম, বলি কোথায় যাই? আর তো কেউ নেই কোথায়? মা-ঠাকরুণ দয়া করেন, মা আমার, অন্নপুন্নো আমার। তাই—

এর অর্থ সুস্পষ্ট। দীনু ভট্‌চায বাড়ীই যাবে। সেজন্যেই এখনো ওঠে নি, বসে বসে তামাক খাচ্চে। দুদিন খায় নি, সে যখনই আসে, তখনই বলে দুদিন খাই নি, তিনদিন খাই নি। কে মশায় তোমাকে রোজ রোজ খাওয়ায়—আর এই দুর্দিনে? লোকের তো একটা বিবেচনা থাকা উচিত।

কি মতলব ফাঁদা যায়? বলা যাবে কি ও বাপের বাড়ী গিয়েছে? কিংবা ওর বড্ড অসুখ? উঁহু, তাহলে ও আপদটা সেখানে দেখতে যেতে পারে।

গঙ্গাচরণ আকাশপাতাল ভেবে কিছুই পেলে না। ছুটির সময় এল। পাঠশালার ছুটি দিয়ে গঙ্গাচরণ যেমন বাড়ীর দিকে চলবে, ও অমনি চলবে গঙ্গাচরণের সঙ্গে। সোজাসুজি কথা বললে কেমন হয়? না মশাই, এবার আর সুবিধে হবে না আমার ওখানে। বাড়ীতে অসুখ, তার ওপর চালের টানাটানি।

কিন্তু পরবর্তী সংবাদের জন্যে গঙ্গাচরণ প্রস্তুত ছিল না।

বেলা যত যায়, দীনু ভট্‌চায মাঝে মাঝে পাঠশালা থেকে নামে আর রাস্তার ওপর গিয়ে দাঁড়িয়ে সেখহাটি-মণিরামপুরের বিলের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখে।

দু'তিনবার এ রকম করবার পরে গঙ্গাচরণ কৌতূহলের সুরে বললে—কি দেখচেন?

—এত দেরি হচ্চে কেন, তাই দেখচি।

—কাদের দেরি হচ্চে? কারা?

—ওই যে বললাম। বাড়ীর সবাই আসচে কিনা। আমার স্ত্রী, মেয়েটা, আর দুটি ছেলে। সব না খেয়ে আছে যে। আর কোনো উপায় তো দ্যাখলাম না। বলি, চলো আমার অন্নপুন্নো মার কাছে। না খেয়ে ষোল-সতেরো বছরের মেয়েটা বড্ড কাতর হয়ে পড়েচে। দিশেহারা মত হয়ে গিয়েছে মশাই। তা আমি দুটো কলাইসেদ্ধ খেলাম মণিরামপুরের নিধু চক্কত্তির বাড়ী এসে। তাদেরও সেই অবস্থা। গোয়ালার বামুন, এ দুর্দিনে কোনো কাজকর্ম নেই, পায় কোথায় বলুন। চাল একদানা নেই তাদের ঘরে। নিধু চক্কত্তির বুড়ো মা বুঝি জরে ভুগচে আজ দুমাস। ওই ঘুসঘুসে জ্বর। তারই জন্যে দুটো পুরনো চাল যোগাড় করা আছে। তিনি খান। ওরা খেতে বসেচে সিদ্ধকলাই। সব সমান অবস্থা। আমি বলি আমি এগিয়ে গিয়ে বসি পণ্ডিত মশায়ের পাঠশালায়, তোমরা এসো।

সর্বনাশের মাথায় পা!

দীনু ভট্‌চায গুষ্টিসমেত এ দুর্দিনে তারই বাড়ী এসে জুটচে তা হলে! মতলব করেচে দেখচি ভালোই।

এখন উপায়?

সোজাসুজি বলাই ভালো। না কি?

এমন সময়ে রাস্তা থেকে বালিকা-কণ্ঠে শোনা গেল—ও বাবা—

—কে রে ময়না? বলেই দীনু বাইরে চলে গেল।

গঙ্গাচরণ বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে একটি ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে পাঠশালার সামনে পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটিকে নিয়ে অল্প একটু পরেই দীনু পাঠশালায় ঢুকে বললে—এই আমার মেয়ে ময়না, ভালো নাম হৈমবতী। প্রণাম করো মা—

কি বিষম মুশকিল।

হৈমবতী এগিয়ে এসে প্রণাম করলে সলজ্জভাবে। বেশ সুন্দরী মেয়ে। ওই রোগা পটকা, দড়ির মত চেহারা দীনু ভট্‌চায়ের এমন সুন্দর মেয়ে!

দীনু ভট্‌চায বললে—ওরা সব কৈ?

হৈমবতী বললে—ওই যে বাবা গাছতলায় বসে আছে মা আর খোকারা। আমি ওদের কাছে যাই বাবা। বোঁচকা নিয়ে মা হাঁটতে পারচে না।

গঙ্গাচরণের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েচে। এদের তাড়ানো আর তত সহজ নয়। এরা বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে আহারের সন্ধানে দেশত্যাগ করে যখন রওনাই হয়েচে। বিশেষ করে মেয়েটিকে দেখে গঙ্গাচরণের মন নরম হয়েচে। অমন সুন্দরী মেয়ের অদৃষ্টে কি দুঃখ। খেতে পায় নি আজ দুদিন। আহা!

স্নেহে গঙ্গাচরণের মন ভরে উঠলো।

একটু পরে পাঠশালার ছুটি দিয়ে গঙ্গাচরণ সদলবলে বাড়ীর দিকে রওনা হলো।

এরপর দিনকতক কেটে গেল। গঙ্গাচরণের বাড়ীতে দীনু ভট্চাযের পরিবারবর্গ পাকাপোক্তভাবে বসেচে। অনঙ্গ-বৌ নিজে খেতে না পেয়ে চিঁ চিঁ করচে অথচ সে কাউকে বাড়ী থেকে তাড়াবে না। ফলে, সবাই মিলে উপোস করচে।

এর মধ্যে ময়না বড় ভাল মেয়ে, গঙ্গাচরণ ক্রমে লক্ষ্য করলে। কোন খাবার জিনিস যোগাড় হলে ময়না আগে নিয়ে আসে অনঙ্গ-বৌকে খাওয়াতে। বলে—ও কাকীমা, এটুকু খেয়ে নাও তো!

ময়নার মা আবার কড়া সমালোচক। সে বলে—যা, ও তোর কাকীমাকে দিতে হবে না। ওর শরীর খারাপ, ও তোমার ওই ময়দার গোলা এখন খেতে বসুক। যা, ও নিয়ে যা—

দীনু ভট্চায কোথায় সকালে উঠে চলে যায়। অনেক বেলা করে বাড়ী ফেরে। কিছু না কিছু খাবার জিনিস প্রায়ই আনে। চাল আনতে পারে না বটে কিন্তু আনে হয়তো একটা নারকেল, একটা মানকচু, দুটো বিরি কলাই, নিদেন দুটো বড়ি।

এসব আনে সে ভিক্ষে করে।

আজকাল দীনু ভিক্ষে করতে শুরু করেছে।

তবে তার ভিক্ষেটা ঠিক আর পাঁচজন ভিক্ষুকের মত নয়, ওরই মধ্যে একটু কায়দা আছে। সেদিন দুপুরে দীনু গিয়ে হাজির এ গ্রামেরই কাপালীপাড়ায়। নিধু কাপালীর বাড়ীর দাওয়ায় উঠে বললে—একটু তামাক খাওয়াতে পার?

নিধু কাপালী ব্রাহ্মণ দেখে শশব্যস্ত হয়ে বললে—আসুন, বসুন, ঠাকুরের কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

—আমার বাড়ী কামদেবপুর, আমি আছি এই গঙ্গাচরণবাবুর বাড়ী।

—আপনার কেউ হন? জামাই নাকি?

—না না, আমার স্বজাতি ব্রাহ্মণ। এমনি এসে আছি ওর ওখানে।

—আপনার কি করা হয়?

—কিছুই না। বাড়ীতে জমিজমা আছে। দুটো গোলা ছিল ধানভর্তি, তা শোনলাম ধান রাখতে দেবে না গবর্নমেণ্টের লোক। বিশ মণ ধানের বেশি নাকি রাখতে দেবে না—সব বিক্রি করে ফেললাম।

বলা বাহুল্য এসব কথা সর্বৈব মিথ্যা।

নিধুর কিন্তু খুব শ্রদ্ধা হয়ে যায়, দুগোলা ধানেব মালিক যে ছিল এ বাজারে, সে সাধারণ লোক নয়, হতেই পারে না। আঠার টাকা করে ধানের মণ। দুগোলায় অন্তত সাত-আট শো মণ ধান ছিল। মোট টাকা রয়েছে ওর হাতে।

দীনু তামাক টানতে টানতে বলে—বাপু হে, ঘরে চিঁড়ে আছে, দুটো দিতে পার? এ গাঁয়ে তোমাদের দেখছি খাদ্যখাদকের বড় অভাব।

—আজ্ঞে, এখানে খাদ্যখাদক মেলেই না—চিঁড়ে ঘরে নেই ঠাকুবমশায়। বড় লজ্জায় ফেললেন—

—না না, লজ্জা কি? তোমাদের এ গ্রামে বাপু এই বকমই কাণ্ড। খাদ্যখাদক কিছু মেলে না। কদিন থেকে ভাবছি দুটো চিঁড়ে ভাজা খাব। তা এ যোগাড করতেই পারলাম না—অথচ আমার গোলায় এক পৌটি দেড পৌটি ধান ছিল এই সেদিন।

নিধু কাপালী কাঁচুমাচু হয়ে গেল। এত বড লোকেব সামনে কি লজ্জাতেই সে পড়ে গেল।

দীনু বললে—যাক গে। আমসত্ত্ব আছে ঘরে?

—আজ্ঞে না, তাও নেই। ছেলেপিলেরা সব খেয়ে ফেলে দিয়েচে।

—পুরনো তেঁতুল?

—আজ্ঞে না।

—বড অরুচি হয়ে গেছে মুখে কিনা। তাই দুটো চিঁড়ে ভাজা, পুরনো তেঁতুল একটু এই সব মুখে—বুঝলে না? আরে মশায়, লড়াই বেধেচে বলে মুখ তো মানবে না? এই চালকুমড়ো তোমার?

সামনে গোলার ওপরে চালকুমড়ো লতায় বড বড চালকুমড়ো সাদা হয়ে গিয়েচে পেকে। সারি সারি অনেকগুলো আড হয়ে আছে গোলার চালে। নিধু কাপালী বিনীতভাবে বললে—আজ্ঞে, আমারই।

—দাও একখানা ভাল দেখে। বড়ি দিতে হবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এখুনি—

নিধু হাঁ হাঁ করে ছুটে গেল এবং একটা বড় পাকা চালকুমড়ো পেড়ে নিয়ে এল গোলার চাল থেকে। দীনু ভট্‌চায সেটি হাতে ঝুলিয়ে গঙ্গাচরণের বাড়ীর দিকে রওনা হলো হৃষ্টমনে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—ওটা কি হবে জ্যাঠামশাই?

—নিয়ে এলাম মা, আনলেই কাজ দেয়। খাবার জিনিস তো? বড়ি দিও।

—কলাই খেয়ে প্রাণ বেঁচে আছে, বড়ি আর কি দিয়ে দেবো জ্যাঠামশাই?

—আচ্ছা রও, কলাইয়ের ব্যবস্থা করে ফেলচি কাল থেকে।

—না, জ্যাঠামশাই আপনি আমাদের বাড়ী এসেচেন, আর বেরুতে হবে না লোকের বাড়ী চাইতে। যা জোটে তাই খাবো।

—কি জান মা, ব্রাহ্মণের উপজীবিকা হলো ভিক্ষা। এতে লজ্জা নেই কিছু। আমার নেই, আমি ভিক্ষা করবো। লড়াই বেধেচে বলে পেট মানবে?

—না জ্যাঠামশাই, আপনার পায়ে পড়ি ওতে দরকার নেই।

—আচ্ছা, তুমি চুপ করে থাক। সে ব্যবস্থা হবে।

দীনু ভট্‌চায গঙ্গাচরণকে সন্ধ্যাবেলা বললে—একটা পরামর্শ করি। চাষাগাঁয়ে জ্যোতিষীর ব্যবসা বেশ চলে। কাল থেকে বেরুবেন? ওদেরই হাতে আজকাল পয়সা।

—সে গুড়ে বালি। আগে চলত, এখন আর চলবে না। চাল ডাল কেউ দিতে পারবে না। পয়সা হয়ত দেবে কিন্তু চাল দেবে কে? কিনবেন কোথায়?

—ধান যদি ছ্যায়?

—কোথাও নেই এদেশে। সে যার আছে, লুকিয়ে রেখেচে, বের করলে পুলিসের হাঙ্গামা। ভয়ে গাপ করে ফেলচে সব। চাষা-গাঁয়ের হালচাল আমাকে শেখাতে হবে না।

—তাহলেও কাল দুজনে বেরুই চলুন। নয়ত না খেয়ে মরতে হবে সপরিবারে।

—যার জমি নেই এ বাজারে, তাকে উপোস করতেই হবে। জমি না চষে পরের খাবে, এ আর চলবে না। চাষা লাঙ্গল ধরে চাষ করে, আমরা তার উপর বসে খাই, এ ব্যবস্থা ছিল বলেই আজ আমাদের এ দুর্দশা।

গঙ্গাচরণ একটু দম নিয়ে আবার বললে—নাঃ, ও জ্যোতিষ-টোতিষ নয়,

এবার যদি নিজের হাতে লাঙ্গল ধরে চাষ করতে হয় তাও করব—একটু জমি পেলে হয়।

দীনু হেসে বললে—জমির অভাব নেই এদেশে। নীলকুঠির আমল থেকে বিস্তর জমি পড়ে। আমারই বাড়ীর আশপাশে দুবিঘে জমি জঙ্গল হয়ে পড়ে রয়েচে। আমার ভিটে-জমির সামিল সে জমি।

—আপনি করেন না কেন?

—কি করবো তাতে?

—যা হয়, রাঙা আলু করলেও পারতেন। তাই খেয়েও দুমাস কাটত। আমাদের ভদ্রলোকদের কতকগুলো মস্ত দোষ আছে। পরের পরিশ্রমে আমরা খাব। আপনি আমি এমন কি দুশো টাকার চাকরি করিনে, অথচ জমি করব না। এবার টের পাচ্ছি মজা।

দীনু ভট্‌চায ওসব বোঝে না। সকলেই চাষ করবে নাকি? মজার কথা। ও হলো বৈশ্যের কাজ, ব্রাহ্মণে বৈশ্যের কাজ করবে? তা কালে তাও হবে; তিনি শুনেচেন শহরে নাকি কোন বামুনের ছেলে জুতোর দোকান করেছে, জুতোর দোকান, ভেবে ছ্যাখ। ব্রাহ্মণের আর কি হতে বাকি রইল?

কাপালীদের বড়-বৌ এসে অনঙ্গ-বৌকে ফিস্ ফিস্ করে বললে—কাল থেকে ছোট-বৌকে পাওয়া যাচ্ছে না।

অনঙ্গ-বৌ বললে—সে কি কথা?

—তারে তো জান বামুন-দিদি? ক্যামন স্বভাব ছেল তার। ইটখোলার সেই এক ব্যাটার সঙ্গে—তুমি সতীনক্ষি, সেসব তোমার সঙ্গে বলব না। এখন কাল বিকেল থেকে আর বাড়ীতে দেখছি নে। ঘরের বৌ, গেল কোথায়? জাত যে যায় এখন!

—যাক, কারো কাছে বলো না।

—কার কাছে আর বলতে যাচ্ছি দিদি? বলে কাটা কান চুল দে ঢাকো, তবুও তো লোকে জিজ্ঞেস করবে বৌ কোথায় গেল? সদু জেলেনী এখুনি ঢোকবে এখন বাড়ীতে। সে রটাবে এখন সারা গাঁয়ে। কি দায়েই আমি পড়িচি।

দু'দিনের মধ্যে ছোট-বৌয়ের টিকি দেখা গেল না। খোঁজাখুঁজি যথেষ্ট করা হয়েচে। কালীচরণ নিজেও আশপাশের গ্রামে সন্ধান করেচে।

অনঙ্গ-বৌ রাত্রে বললে—কি হলো ?

গঙ্গাচরণ হেসে বললে—কি আর হবে। সে পালিয়েচে সেই যদু-পোড়ার সঙ্গে—সেই ঠিকাদার ব্যাটা, ভয়ানক ধড়িবাজ।

—ওমা, সে কি সব্বোনাশ! হ্যাগা কি হবে ওর ? ছুট্‌কির ?

—ওকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে শখ মিটে গেলে। তখন নাম লেখাতে হবে শহরে গিয়ে, নয়ত ভিক্ষে করতে হবে।

চতুর্থ দিন অনেক রাত্রে কে এসে ডাকলে ঘরের বাইরে থেকে—

—ও বামুন-দিদি—

ময়না জেগে উঠে বললে—কে ডাকচে বাইরে, ও দিদি বলে—

সে উঠে দোর খুলে দিতে ছোট-বৌ ঘরে ঢুকল। পরনে নতুন কোরা লালপেড়ে শাড়ী, গায়ে সাদা ব্লাউজ, হাতে নতুন কাঁচের চুড়ি।

অনঙ্গ-বৌ বিস্ময়েব ও আনন্দের স্বরে বললে—কি রে ছোট-বৌ ?

ছোট-বৌ মেঝের ওপব বসে পড়ল। একটুখানি চুপ করে থেকে ফিক্ করে হেসে ফেলল। ময়নাব মাও ততক্ষণ উঠেচে। ছোট-বৌয়ের কাণ্ড সব শুনেছে এ কদিনে। ময়নাব মা ছিল কামদেবপুর গাঁয়ের মধ্যে সকলের চেয়ে নিরীহ মেয়েমানুষ। কখনো কারো কথায় থাকে না, গরীব-ঘরের বৌ—দুঃখ-ধান্দার মধ্যেই চিরকাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো মানুষ করে এসেচে। সে শুধু চুপ করে ওর দিকে চেয়ে রইল। এমন অবস্থায় আবার লোকের মুখে হাসি বেরোয় ? ময়নার মা এই কথাই ভাবছিল।

অনঙ্গ-বৌ রাগের স্বরে বললে—হাসি কিসের ?

ছোট-বৌ মুখ চুন করে বললে—এমনি।

—ও পুঁটুলি কিসের ?

—ওতে চাল। তোমার জন্যি এনিচি।

—ঝাঁটা মারি তোর চালের মাথায়। নিয়ে যা এখান থেকে। আমি কি করব তোর চাল ?

—রাগ কোর না বামুন-দিদি, পায়ে পড়ি। তুমি রাগ কল্লি আমি কনে যাব ?

এবার ছোট-বৌয়ের চোখ দুটো যেন জলে ভরে এল। সত্যিকার চোখের জল।

অনঙ্গ-বৌয়ের মনটা নরম হলো। খানিকটা স্নেহের স্বরে বললে—

বদমাইশ কোথাকার। ধাড়ি মেয়ে, তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই, কি কাজ করতে কি কাজ করে বসো তোমার জ্ঞান হয় না? আজ বাদে কাল কোথায় গিয়ে জবাবদিহি করতে হবে সে খেয়াল হয় না তোমার? সতের ঝাঁটা মারি তোমার মাথায় তবে যদি এ রাগ যায়।

অজ্ঞান পাপীকে ভগবানও বোধ হয় এমনি সস্নেহ অনুযোগের সুরে তিরস্কার করেন। ছোট-বৌ মুখ চুন করে মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল।

এরই মধ্যে একদিন মতি মুচিনী অতি অসহায় অবস্থায় এসে পৌছলো ওদের গাঁয়ে।

সকালে হাবু এসে বললে—মতি দিদিকে দেখে এলাম মা, কাপালীদের বাড়ী বসে আছে। ওর চেহারা বড় খারাপ হয়েছে। অনঙ্গ-বৌ বললে—কি রকম দেখে এলি?

—রোগা মত।

—জর হয়েছে?

—তা কি জানি! দেখে আসবো?

হাবু আবার গেল, কিন্তু মতিকে সেখানে না দেখে ফিরে চলে এল।

আর দুদিন ওর কথা কারো মনে নেই, একদিন সকালে মতি হাবুদের বাড়ীর সামনে একটা আমগাছের তলায় এসে শুয়ে পড়লো। ওর হাত-পা ফুলেছে, মুখ ফুলেছে, হাতে একটা মাটির ভাঁড়। সারা দুপুর সেখানে শুয়ে জ্বরে ভুগেছে, কেউ দেখে নি, বিকেলের দিকে গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরবার পথে ওকে দেখে কাছে গিয়ে বললে, কে?

ওকে চিনবার উপায় ছিল না।

মতি অতি কষ্টে গেঙিয়ে গেঙিয়ে বললে—আমি দাদাঠাকুর—

—কে, মতি? এখানে কেন? কি হয়েছে তোর?

—বড্ড জর দাদাঠাকুর, তিন দিন খাই নি, দুটো ভাত খাবো।

—তা হয়েচে ভালো। তুই উঠে আয় দিদি, পারবি?

উঠবার সামর্থ্য মতির নেই। গঙ্গাচরণ ওকে ছোঁবে না। সুতরাং মতি সেখানেই শুয়ে রইল। অনঙ্গ-বৌ শুনতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো কিন্তু সেও অত্যন্ত দুর্বল। উঠে মতির কাছে যাওয়ার শক্তি তারও নেই।

বললে—ওগো মতিকে কিছু খেতে দিয়ে এসো—

—কি দেবো ?

—দুটো কলাইয়ের ডাল আছে ভিজানো। এক মুঠো দিয়ে এসো।

—ও খেয়ে কি মরবে ? তার জ্বর আজ কতদিন তা কে জানে। মুখ-হাত ফুলে ঢোল হয়েচে। কেন ও খাইয়ে নিমিত্তির ভাগী হবো ?

—তবে কি দেবো খেতে ? কি আছে বাড়ীতে ?

খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো অনঙ্গ। কিন্তু অন্য কিছুই ঘরে নেই। কি খেতে দেওয়া যায়, এক টুকরো কচু ঘরে আছে বটে কিন্তু তা রোগীর খাদ্য নয়। হাবু পুব পাড়ার জঙ্গলের মধ্যে থেকে ওই কচুটুকু আজ দুদিন আগে তুলে এনেছিল, দুদিন ধরেই এক এক টুকরো সিদ্ধ করে খেতে খেতে ওই এক ফালি অবশিষ্ট আছে।

ভেবেচিন্তে অনঙ্গ-বৌ বললে—হ্যাগা, কচু বেটে জল দিয়ে সিদ্ধ করে দিলে রুগী খেতে পারে না ?

—তা বোধ হয় পারে, মানকচু ?

—জঙ্গুলে মানকচু।

—তা দ্যাও।

সেই অতি তুচ্ছ খাদ্য ও পথ্য একটা কলার পাতায় মুড়ে হাবু মতির সামনে নিয়ে গেল। অনঙ্গ-বৌ অতি যত্ন নিয়ে জিনিসটা তৈরী করে দিয়েছে। হাবুকে বলে দিয়েছে ওকে এখানে নিয়ে আসবি, বাইরের পিঁড়েতে বিচুলি পেতে পুরু করে বিছানা করে দিলেই হবে। আমতলায় শুয়ে থাকলে কি বাঁচে ?

হাবু গিয়ে ডাকলে,—ও মতি-দিদি, এটুকু নাও—

মতি ক্ষীণ স্বরে বললে—কি ?

—মা খাবার পাঠিয়েচে—

—কে ?

—আমার মা। আমার নাম হাবু, চিনতে পারচো না ?

মতি কথা বলে না। খানিকক্ষণ কেটে গেল।

হাবু আবার বললে—ও মতি-দিদি ?

—কি ?

—খাবার নাও। মা দিয়েচে পাঠিয়ে।

—শালিক পাখী শালিক পাখী, ধানের জাওলায় বাস—

—ও মতি-দিদি ? ওসব কি বলচো ?

—কে তুমি ?

—আমি হাবু। ভাতছালায় আমাদের বাড়ী ছিল, মনে পড়ে ?

—বিলির ধারের পদ্মফুল,

নাকের আগায় মোতির দুল,—

—ও রকম বোলো না। খেয়ে নাও, গায়ে বল পাবে।

—কি ?

—এই খাবার খেয়ে নাও—

—কে তুমি ?

—আমি হাবু, আমার বাবার নাম গঙ্গাচরণ চক্রবর্তী, পণ্ডিত মশাই ছিলেন; মনে পড়ে না ?

—হুঁ।

—তবে এই নাও খাবার! মা পাঠিয়েচে।

—ওখানে রেখে যাও—

—কুকুরে খেয়ে ফেলবে। তুমি খেয়ে নাও, নিয়ে আমাদের বাড়ী চলো, মা যেতে বলেচে।

—কে তুমি ?

—আমি হাবু। আমার বাবার নাম—

মতি আর কথা বললে না। যেন ঘুমিয়ে পড়লো। হাবু ছেলেমানুষ, আরও দুতিনবার ডাকাডাকি করে কোনো উত্তর না পেয়ে সে কচু বাটাটুকু ওর শিয়রের কাছে রেখে চলে এলো।

অনঙ্গ-বৌ বললে—কিরে, মতি কই ? নিয়ে এলি নে ?

—সে ঘুমুচ্ছে মা। কি সব কথা বলে, আবোল-তাবোল, আমার তো ভয়ই হয়ে গেল। খাবার রেখে এসেচি তার শিয়রে।

—আর একবার গিয়ে দেখে আসবি একটু পরে।

—বাবাকে একটু যেতে বলো, বাবা ফিরলে।

—তুই আর একটু পরে গিয়ে খাবারটুকু খাইয়ে আসবি—

আরও কিছুক্ষণ পরে হাবু গিয়ে দেখে এল মতি সেই একভাবেই মুখ গুঁজে পড়ে আছে। উঠলোও না, বা ওর সঙ্গে কোনো কথাও বললে না। কচুবাটা সেইভাবে ওর শিয়রের কাছেই পড়ে। হাবু অনেক ডাকাডাকি করলে, ও মতি-দিদি—ও মতি দিদি সন্ধ্যা হয়ে এল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘ দেখা দিলে, বোধ হয় জল হবে। হাবু খুব ব্যস্ত হয়ে

পড়লো। বিষ্টিতে ভিজবে এখানে বসে থাকলে। মতি-দিদি ও এখানে শুয়ে থাকলে ভিজে মরবে। এখন কি করা যায়?

মাকে এসে ও সব কথা বললে।

অনঙ্গ-বৌ বললে, ময়নাকে নিয়ে যা, দু'জনে ধরাধরি করে নিয়ে এসে বাইরের পিঁড়েতে শুইয়ে রেখে দে—

ময়না হাসিখুশি-প্রিয় চঞ্চলা মেয়ে।

—সে বললে—আমরা আনতে পারবো? কি জাত কাকীমা?

—মুচি।

ময়না নাক সিঁটকে বললে— ও, মুচিকে ছুঁতে গেলাম বই কি এই ভরসন্দে বেলা? আমি পারবো না, আমি না বামুনের মেয়ে? বলেই হাসতে হাসতে হাবুর সঙ্গে বেরিয়ে চলে গেল।

দুজনে গিয়ে দেখলে মতি সেইভাবেই শুয়ে আছে, সেই একই দিকে ফিরে। ওর মাথার শিয়রে সেই কচুবাটা, পাশে একটা মাটির ভাড়।

ময়না গিয়ে ডাকলে, ও মতি—

কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

ময়না হাবুর চেয়ে বয়সে বড়, বুদ্ধিশুদ্ধি তার আরও একটু পেকেচে, সে আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখে বললে, কাকাবাবু বাড়ী থাকেন তো ডেকে নিয়ে আয় দিকি!

হাবু বললে—কেন?

—আমার যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে হাবু, একজন কোনো বড় লোককে ডেকে নিয়ে আয় দিকি!

এমন সময়ে দেখা গেল কাপালীদের ছোট বৌ সে পথে আসচে। ময়না বললে—ও মাসি, শোনো ইদিকে—

—কি?

—এসে দেখে যাও মতি-দিদি কথাবার্তা বলচে না, এমন করে শুয়ে আছে কেন?

ছোট-বৌ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ভাল করে দেখলে।

মতি মারা গিয়েচে। সে আর উঠে কচুবাটা খাবে না, ভাঁড়েও আর খাবে না জল। তার জীবনের যা কিছু সঞ্চয়, তা পথের ধারেই ফেলে রেখে সে পরপারে চলে গিয়েচে।

ছোট-বৌ আর ময়নার মুখে সব শুনে অনঙ্গ-বৌ হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

গ্রামে থাকা খুবই মুশকিল হয়ে পড়লো মতি মুচিনীর মৃত্যুর পরে। অনাহারে মৃত্যু এই প্রথম, এর আগে কেউ জানত না বা বিশ্বাসও করে নি যে অনাহারে আবার মানুষ মরতে পারে। এত ফল থাকতে গাছে গাছে, নদীর জলে এত মাছ থাকতে, বিশেষ করে এত লোক যেখানে বাস করে গ্রামে ও পাশের গ্রামে, তখন মানুষ কখনো না খেয়ে মরে? কেউ না কেউ খেতে দেবেই। না খেয়ে সত্যিই কেউ মরবে না।

কিন্তু মতি মুচিনীর ব্যাপারে সকলেই বুঝলে না খেয়ে মানুষে তাহলে তো মরতে পারে। এতদিন যা গল্পে-কাহিনীতে শোনা যেতো, আজ তা সম্ভবের গণ্ডির মধ্যে এসে পৌঁছে গেল। কই, এই যে একটা লোক মারা গেল না খেয়ে, কেউ তো তাকে খেতে দিলে না? কেউ তো তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারলে না? সকলের মনেই একটা বিষম আশঙ্কার সৃষ্টি হলো। সবাই তো তা হলে না খেয়ে মরতে পারে।

দীনু ভট্‌চায সেদিন দাওয়ায় বসে মতি মুচিনীর মৃত্যুদৃশ্য দেখলে। মনে মনে ভাবলে, এবার আমার এতগুলো ছেলেমেয়েকে খেতে দেবে কে? এদের ঘরে তো খাবার নেই, কোনোদিন এক খুঁচি কলাইয়ের ডাল, কোনোদিন বা একটা কুমড়ো, তাই সবাই মিলে ভাগ করে খাওয়া। দীনু ভট্‌চায বুড়ো মানুষ, ওর তাতে পেট ভরে না। পেটে খিদে লেগেই আছে, খিদে কোনদিন ভাঙে না। দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়চে। এমন ভাবে আর কদিন এখানে চলবে?

মতির মৃতদেহ আমতলাতেই পড়ে আছে। কত লোক দেখতে আসচে। দূর থেকে দেখে ভয়ে ভয়ে চলে যাচ্চে। আজ যা ওর হয়েচে, তা তো সকলেরই হতে পারে! ও যেন গ্রামের লোকের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেল। একটি মূর্তিমান বিপদের সংকেত স্বরূপ ওর মৃতদেহটা পড়ে রয়েচে আমগাছটার তলায়। অনাহারে প্রথম মৃত্যুর অশনি-সংকেত।

দীনু ভট্‌চায বললে—তাই তো ভায়া, এখন কি করা যায়?

গঙ্গাচরণ সন্তুষ্ট ছিল না ওর ওপর। একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে ঘাড়ে বসে খাচ্চে এই বিপদের সময়। স্ত্রীর ভয়ে কিছু বলতেও পারা যায় না।

বিরক্ত স্বরে বললে—কি আর করা যাবে, সকলের যা দশা, আমাদেরও তাই হবে—

—না খেয়ে আব কড়া দিনই বা চলবে তাই ভাবচি। একটা হিল্লে না হলি যাই বা কোথায় ?

—একটা হিল্লে কি এখানে বসে হবে, চেষ্টা করে দেখতে হবে।

অনঙ্গ-বৌ কাপড়ের ছোট্ট এতটুকু একটা পুঁটুলি হাতে ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে বললে—এতে কি আছে বলো তো ? জ্যাঠামশাই বলুন তো এতে কি ?

—কি জানি কি ?

—এতে আছে শসার বীজ, নাউয়ের বীজ আর শাঁকআলুব বীজ। কাপালীদেব ছোট-বৌ দিয়ে গিয়েচে। এ পুঁতে দেবো আমাদের উঠানে।

গঙ্গাচরণ বললে—সে আশায় এখন বসে থাক। কবে তোমার নাউ শসা ফলবে আর তাই খেয়ে দুঃখু এবার ঘুচবে। সবাইকে মরতে হবে এবার মতির মত।

অনঙ্গ-বৌ বললে—হ্যাগা, মতির দেহটা ওখানে পড়ে থাকবে আর শেয়াল কুকুরে খাবে ? ওব একটা ব্যবস্থা কর।

—কি ব্যবস্থা হবে ?

—ওর জাতের কেউ এ গাঁয়ে নেই ?

—থাকলেও কেউ আসবে না। কেউ ছোঁবে না মড়া।

—না যদি কেউ আসে, চলো আমবা সবাই মিলে মতির সৎকার করি গে। ওকে ওভাবে ওখানে পড়ে থাকতে দেবো না। ও বড ভালবাসতো আমায়। আমারই কাছে মরতে এলো শেষকালে। ভালবাসতো বড্ড যে হতভাগী—

অনঙ্গ-বৌ আঁচলেব ভাঁজ দিয়ে চোখ মুচলে।

হৃদয় সকলের থাকে না, যার থাকে তার আনন্দও যত, কষ্টও তত। অনঙ্গ-বৌ ছটফট করচে মতির মৃতদেহটা ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে। কিছুতেই ওর মনে স্বস্তি পাচ্চে না। তার নিজের যে সে অবস্থা নয়, তাহলে সে আর ময়না দুজনে মিলে মৃতদেহটার সৎকার করে আসতো।

দীনু ভট্‌চায বললে—চলো ভায়া আমরা দুজনে ডেকে নিয়ে ওটির ব্যবস্থা করে আসি।

গঙ্গাচরণ একটু অবাক হয়ে গেল। দীনু ভট্‌চাযের মুখে এত পরোপকারের কথা! কিন্তু কার মধ্যে কি থাকে বোঝা কি যায় ? সত্যিই সে তা করলেও শেষ পর্যন্ত। দীনু ভট্‌চায আর গঙ্গাচরণ আর কাপালীদের ছোট-বৌ।

আরও দু'দিন কেটে গেল।

শোনা গেল গ্রাম ছেড়ে অনেক লোক পালাচ্চে।

রাত্রির মধ্যে অর্ধেক লোক চলে গিয়েচে কাপালীপাড়া থেকে।

কাপালীদের ছোট-বৌ সকালে এসে জানালে অনঙ্গ-বৌকে, সেও চলে যাচ্চে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—কোথায় যাবি রে?

—সবাই যেখানে যাচ্চে—শহরে! সেখানে গেলে গোরমেণ্টো নাকি খেতে দেচ্চে।

—কে বললে?

—শোনলাম, সবাই বলচে।

—কার সঙ্গে যাবি? তোর স্বামী যাবে?

—সে তো বাড়ী নেই। সে আজ দিন পাঁচ-সাত বেগুন বেচতে গিয়েচে শহরের হাটে। আর আজও তো ফিরল না।

—কোথায় গেল?

—তা কি করে বলবো? তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে।

—তুই যেতে পারবি নে। আমার কথা শোন্ ছুট্‌্কি, তোর অল্প বয়েস, নানা বিপদ পথে মেয়েমানুষের। আমার কাছে থাক তুই। আমি যদি খেতে পাই তুইও পাবি। আমার ছোট বোনের মত থাকবি। যদি না খেয়ে মরি, দুজনেই মরবো।

কাপালী-বৌ সাতপাঁচ ভেবে চুপ করে রইল। অনঙ্গ-বৌ বললে—কথা দে, যাবি নে।

—তুমি যখন বলচো দিদি, তোমার কথা ঠেলতে পারি নে। তাই হবে।

—যাবি নে তো?

—না। দাঁড়াও দিদি, আমি চট করে এক জায়গা থেকে আসি। এখুনি আসচি।

ইটখোলার পাশে অশথতলায় যদু-পোড়া অপেক্ষা করচে। বেলা আটটার বেশি নয়। ওকে দেখে বললে—এই বুঝি তোমার সকাল বেলা? ইটখোলার কুলিদের হাজরে হয়ে গেল, বেলা দুপুর হয়েচে। ওবেলা কখন গাড়ী নিয়ে আসব? সন্দের সময়?

ছোট-বৌ বললে—গাড়ী আনতে হবে না।

যদু-পোড়া আশ্চর্য হওয়ার সুরে বললে—আনতে হবে না গাড়ী ? তার মানে কি ? হেঁটে যাবে ? পথ তো কম নয়—

ছোট-বৌ হাত নেড়ে নেড়ে বেশ ভঙ্গি করে কৌতুকের সুরে বললে—হাঁটবোও না, যাবোও না—

—যাবে না মানে ?

—মানে, যাবো না।

যদু-পোড়া রাগের সুরে বললে—যাবে না তবে আমাকে এমন করে নাচালে কেন ?

—বেশ করিচি।

কথা শেষ করেই কাপালী-বৌ ফিরে চলে আসবার জন্যে উদ্যত হয়েচে দেখে যদু-পোড়া দাঁত খিঁচিয়ে বললে—না খেয়ে মরছিলে বলে ব্যবস্থা করছিলাম। না যাও, মরো না খেয়ে।

কাপালী-বৌ কোনো উত্তর না দিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল।

যদু-পোড়া চেঁচিয়ে ডাক দিলে—শুনে যাও, একটা কথা আছে—

কাপালী-বৌ একবার দূর থেকে চেয়ে দেখলে পিছন ফিরে। একটু ইতস্ততঃ করলে। তারপর একেবারেই চলে গেল।

ফকির

ইচু মণ্ডলের আজ বেজায় সর্দি হয়েছে। ভাদ্রমাসের বর্ষণমুখর শীতল প্রভাত। তালি দেওয়া কাঁথা, ওর বৌ, তার নাম নিমি, শেষরাত্রে গায়ে দিয়ে দিয়েছিল। এমন সর্দি হয়েছে যেন মনে হচ্ছে সমস্ত শরীব ভারী। ইচু শুয়েই পা দিয়ে চালের হাঁড়িটা নেড়ে দেখলে, সেটা ওর পায়েব তলার দিকেই থাকে, হাঁড়িটাতে সামান্য কিছু চাল আছে মনে হল তার।

ইচু বললে--আজ আর জনে যাব না। একটু পান দে দিকি।

ওর বৌ বললে—জনে যাবা না তবে চলবে কিসি?

—কেন, চাল তো রয়েছে তোর হাঁড়িতি, সজনে শাক-মাক সেদ্দ কর আর ভাত। নুন আছে?

—এট্টু অমনি পড়ে আছে মালাটাব তলায।

—তবে আর কি? পানি দে—নমাজ করি।

ইচু জল দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ওজু শেষ করে ফজরেব নমাজে বসে গেল। এটি তাব জীবনের অতি প্রিয় কাজ বাল্যকাল থেকেই। মজুরি করতে না যেতে পাবে সে, কিন্তু নমাজ না করে সে দিনেব কাজ কখনও আবম্ভ করে নি।

নিমি বললে—উঠেছ যখন, তখন জনে যাও। আজকাল যুদ্ধের বাজারে দশ আনা করে জন, অন্য সময় তিন আনা হত যে। হাঁড়িতে যদি চাল থাকতি দেখলে, তবে আর জনে যাবা না। ও ভাল না।

ইচু বললে—নমাজের সময় ঘ্যান ঘ্যান করিস নে বাপু, একটু চুপ কর।

নমাজ শেষ করে ইচু দা হাতে বেরিয়ে যেতে গিয়ে একটু থেমে বললে —খিদে পেয়েছে। কি আছে বে?

—কিছু নেই।

—দেখ না হাঁড়িটা—বড্ড খিদে পেয়েছি।

—দুটো কটা পানি দেওয়া ভাত পড়ে আছে, আর কিছু নেই।

—তাই দে। বেনবেলা না খেয়ে গেলি দুপুর বেলা এমন খিদে পায়, দা ধরতি হাত কাঁপে। কাজ করতি পারি নে।

শাইনিপাড়া গ্রামের পাশ দিয়েই বেল লাইন চলে গিয়েছে।

রেল লাইন পার হয়ে ফাঁকা মাঠ একদিকে, মাঠের মধ্যে বিল, ভরা ভাদ্রের

বর্ষায় থৈ থৈ করছে তার জল, ধারে ধারে কাশ বনে সবে ফুল ফুটতে শুরু হয়েছে, জলে কলমিলতা জালের মত বিস্তৃত হয়ে আছে। বনখেজুর গাছের মাথায় তেলাকুচো লতার দুলুনি। টুকটুকে লাল তেলাকুচো ফল সবুজ পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছে। ফিঙে পাখী ঝুলছে রেলের তারে।

রামা গোয়ালা জন-মজুর নিয়ে ধান কাটছে তার নিজের জমিতে। ইচুকে দেখে বললে—যাবা কোথায় ?

—সনেকপুরের বিলি ধান কাটতি।

—কত করে জন দেচ্ছ ?

—সাত সিকে করে বিঘে। তামাকের আগুন দেবা ?

—নিয়ে যাও, ওই বেনা ঝোপের ধারে মালসা আছে।

—ভাত খেয়েই চলে আলাম, হাফ জিরুতে পারি নি। তামাক না খেলি কাজে মন বসে ?

মালসা থেকে আগুন নিয়ে তামাক খেতে খেতে চলল ইচু।

ইচুর গ্রাম থেকে দু'মাইল দূরে সনেকপুরের বিলে দেড়-শ দু-শ বিঘে জমিতে ভাদুই ধান পেকে গাছ শুয়ে পড়েছে। যেমন বর্ষা নেমেছে, দু'পাঁচ দিনে বিলের জল বেড়ে পাকা ধান ডুবিয়ে দেবে, তাই এবার মজুরির রেট এদিকে খুব বেশি। তার ওপর আছে একবেলা খোরাকি মজুরদের।

ইচুর বড় ভাল লাগে আল্লার কথা শুনতে। পায়রাগাছির ফকির এ অঞ্চলের মধ্যে নামজাদা সাধু। একবার ইচু তাঁকে দেখেছিল। বাল্যকাল থেকে ইচুর ঈশ্বরের দিকে কেমন এক টান। পায়রাগাছির ফকির সে টান আরও বাড়িয়ে দেন ওর। ইচু যেন কেমন হয়ে গিয়েছে তার পর থেকে। সংসারে মন দেয় না, মজুরি করে পয়সা রোজগারের দিকে বা খাওয়া-দাওয়ার দিকেও মন নেই। কাস্তে হাতে জমির ধান কাটতে কাটতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। অনেকে ওকে তা নিয়ে খেপায়। বলে —ও ইচু, শেষকালে ফকির হবা নাকি গো ? ইচু মুখে কিছু বলে না, চুপ করে থাকে। সে নিতান্ত ভাল-মানুষ, কারও কোন কথার প্রতিবাদ সে করতে পারে না।

মজুরির রেট নিয়ে দরাদরি করতে পারে না বলে অনেকে ওকে ঠকিয়ে কাজ আদায় করে। বিনি মজুরিতে অনেক সময় খাটিয়ে নেয়।

—ও ইচু, আমার বাড়ির চালকুমড়োর মাচাটা তুমি থাকতে নষ্ট হয়ে যাবে ?

—কেন, কি হয়েছে চাচা ?

—খুঁটিগুলো সব পড়ে গিয়েছে।

—ওবেলা এসে করে দেবানি চাচা।

ইচু কথা ঠিক রাখত নিজের। যাকে যা বলবে, তা সে রাখবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করবে এটা সকলেই জানে। মহাজনে দু'তিন বিশ ধান মুখের কথায় ওকে দিয়ে দিত, এ পর্যন্ত সে কারও টাকা বা ধান মেরে দেয় নি।

একবার পাশের গ্রামের মুখুজ্যেদের জমির ধান সে ভুল করে কেটে ফেলেছিল—বেশি নয়, কাঠাখানেক জমির পাকা ধান। মুখুজ্যেদের জমির পাশে তখন ওর নিজের ওটবন্দি জমি ছিল দু'বিঘে। মুখুজ্যে মশায় যখন জানতে পারলেন তাঁর জমির ধান কে কেটে নিয়েছে তখন খুব হৈ চৈ জুড়ে দিলেন। কে ধান কেটেছে সন্ধান করতে পারলেন না কারণ সবারই তখন ধান কাটবার সময়, সকলেরই বাড়িতে ধান—কার ধান তিনি গিয়ে ধরবেন ? দিন-দুই পরে ইচু গিয়ে সন্ধ্যাবেলা তাঁর বাড়ি হাজির হল।

মুখুজ্যে মশায় বললেন—কি রে ইচু, কি মনে করে ?

ইচু বললে—সালাম বাবু ! একটা বড্ড ভুল করে ফেলিছি !

—কি রে ?

—আপনার জমির ধানডা কাঠাখানেক কেটে ফেলে ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলেলাম। তা বাবু, দেড়া সুদ দিয়ে সেই ধানডা আপনারে ফেরত দিতি আলাম।

—ওঃ, তোর কাজ ইচু ! আমি আকাশ-পাতাল হাতড়াচ্ছি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। সেদিন বড্ড বর্ষা, জমির আল ঠিক করতি পারলাম না। তার পর পরম্পর শুনলাম আপনার জমির ধান কে চুরি করেছে বলে আপনি খোঁজ করছেন। তখন ভাবলাম বাবুরে বলে আসি। ক্ষতি লোকসান যখন অজান্তে করে ফেলেছি, তখন দেড়া বাড়ি সুদ দেব আপনারে।

মুখুজ্যে মশায় বিশ্বাস করলেন ওর কথা। ইচুকে অন্তত চোর বলে কেউ সন্দেহ করবে না। ইচু জন খেটে খায় বটে, কিন্তু আশেপাশে চার পাঁচ গ্রামের লোক ওকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে। মুখুজ্যে মশায় বললেন, তোকে সুদ দিতে হবে না ইচু, আমার ধান যা কেটেছিস ও আর ফিরিয়েও দিতে হবে না। ও তোকে দিলাম। ভুলে করে ফেলেছিস তা আর এখন কি হবে।

ইচু হাতজোড় করে বললে—তা হবে না মুখুজ্যে মশায়, ও ধান নিতি পারব না, মাপ করবেন। ও ধান আমার গলা দিয়ে নামবে না। আল্লা যা আমায়

হাতে তুলে দেবেন, তাই খেয়ে পরান বেঁচিয়ে রাখব—যা না দেবেন সে আমার হারাম।

মুখুজ্যে মশায় জানতেন ইচুকে। খুশি হয়ে বললেন—যাক, দুটো চিঁড়ে নিয়ে যা, বাড়ির মধ্যে তোর কাকীমার কাছ থেকে চেয়ে নে।

সনেকপুরের বিলে পৌছে ইচু দেখলে, জন-মজুর এখনও কেউ এসে পৌছয় নি। এটা পছন্দ করে না সে। বেশি রেটে মজুরি নেব অথচ কাজে আসব দেরি করে, মালিকের কাজে ফাঁকি দেব, এ তার ভাল লাগে না। ধান কাটে ঘড়ির কাঁটার মত। এ কাজে তার ফাঁকি নেই।

পথ-চলতি লোকে জিগ্যেস করে—কি ধান এটা গো ?

—বেনাঝুপি।

—এবার ফসল কেমন ?

—আড়াই বিশ থেকে তিন বিশ পড়তা হতি পারে।

—বিঘেয় ?

—বিঘেয় না কি কাঠায় ?

ইচু হা হা করে হাসে পথিকের অজ্ঞতায়। পথিকের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে —কাঠায় আড়াই বিশ ধান ফলন হলি কি আমরা জন খেটে খাতাম গো কর্তা ? হা—হা—হা—

—বাড়ি কোথায় তোমার ?

—শাইলেপাড়া।

—নাম ?

—ইচু মণ্ডল।

বেলা আড়াইটের গাড়ি দূরের রেল লাইন দিয়ে গড় গড় করে চলে গেল। জনমজুরদের জন্যে জমির মালিক খাবার পাঠিয়েছে, একজন লোক বাঁকে ঝুলিয়ে আধক্রোশ দূরবর্তী সেনপুকুর গ্রাম থেকে কাঁসরের জামবাটিতে সাজিয়ে এনেছে গরম ভাত, কুমড়োর ঘন্ট ও কুচো চিংড়ি ভাজা। এ সময় ভাল খেতে দিয়ে মন খুশি করা মানে বেশি কাজ আদায় করা ওদের কাছ থেকে। জমির মালিকেরা তা জানে। আখের মণ্ডল খেতে খেতে বলে—আজ একটু সকাল সকাল যাব। মোর ঘরে নুন নেই—বাজার থেকে নুন না নিয়ে গেলি বাচ-কাচ খেতি পাবে না।

—নুন কনে পাবা ? বাজারে কালও খোঁজ করিছি, নুন মেলে না।

—ওমা আলুনি খেয়ে মুখি তো পোকা পড়ে গেল।

—আর অন্ধকারে খেয়ে খেয়ে চকি ঢ্যালা বেরুল। কেরাচিন্নি তেলের মুখ দেখি নি কতকাল।

—কুমড়োর ছালডা করেছে বেশ। সনেকপুরের এরা খেতি দেয় ভাল, পেটটা ভরি দেয়। কেরাচিন্নি পাবা কোথায় ?

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আখের মণ্ডল দা-কাটা তামাক সাজলে কলকেতে। বেশ করে আগুন ধরিয়ে প্রবীণ রমজান মণ্ডলের হাতে দিয়ে বললে—হ্যাদে ধর চাচা।

ইচু বললে—চাচা, তোমার বয়স হল ক' কুড়ি ?

—তা যেবার জোড়া বন্যে হয়েল সেবার আমি গরু চবাতে পারি, তিরিশ কি চল্লিশ হল পেরায়—

কেউ বিশেষ বুঝতে পারলে না। জোড়া বন্যা কত বৎসর পূর্বে কোন্ সালে হয়েছিল কেউ জানে না। রমজানের বয়স কম হলেও সত্তর ছাড়িয়েছে। যখন সে গরু চরায় তখন এরা কেউ জন্মায় নি। সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান এদের নিতান্তই সীমাবদ্ধ।

বেলা যায় যায়। পাঁচটার গাড়ি গড গড করে মাদলাব বিলেব উপর দিয়ে চলে গেল। ঝিঙের ক্ষেতে ফুল ফুটেছে সনেকপুরেব মাঠে। নোয়ালি সর্দার জাতে বুনো, সনেকপুরের মধ্যে অবস্থাপন্ন, গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রাম্যপথ ধরে। ইচু সন্ধ্যার নমাজ শেষ করে উঠতেই বেড়ার ধার থেকে নোয়ালি সর্দার বললে—ও ইচু, কাল আমায় জন দিতি পারবা ?

—না গো।

—কেন ?

—সনেকপুরওয়ালাদের বিলির ধান কাটা হচ্ছে।

—চল আমার বাড়ি, তামুক খেয়ে যাবা।

রমজান মণ্ডলকে ইচু ডাক দিলে।—ও চাচা। সর্দারের বাড়ি তামুক খাবা চল।

নোয়ালি সর্দারের তামুক খাওয়ানোর আসল উদ্দেশ্য মজুরির রেট সম্বন্ধে দরদস্তুর করা। ইচু রমজানের পুত্রের বয়সী—সুতরাং দরদস্তুর সম্বন্ধে রমজান নেতা হয়ে কথাবার্তা চালালে।

—সাত সিকের কম পারব নি গো, এতে তুমি রাগ ক'রো না সর্দার।

—রমজান চাচা, তার চেয়ে আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল না কেন ?

—অনেয্য তো কিছু বলছি নে।

—অনেয্য নয় চাচা ? যা ছেল চোদ্দ আনা তাই সাত সিকে ? এট্টা ভেবে চিন্তে কথা বল। পাঁচ সিকে কর, আর চাল ডাল মাছ পেটিয়ে দেবানি তোমরা রান্না করে খেয়ো। মোদের রান্না তো তোমরা খাবা না। আমার পুকুরি এবার এই এত বড় চ্যাং মাছ—

নোয়ালি সর্দার হাত দিয়ে কাল্পনিক মৎস্যের দৈর্ঘ্য নির্দেশ করলে, যদি লোভ দেখিয়ে এদের কাজে টানা যায়।

রমজান ঘাড় নেড়ে বললে—ও হবে না সর্দার। সাত সিকের কম করলি—

—আর এক কলকে ধরাও চাচা। হ্যাদে, গাছের জালি শসা গোটাকতক নিয়ে যাও। দুজনে খেয়ো।

—শসা পুঁতেছিলে ? মাচার শসা, না মেঠো ?

—মেঠো কোথায় পাব চাচা, এই উঠোনটাতে মাচা করে দিয়েলাম—সিম বরবটি শসা—কিনে খাবার তো ক্ষ্যামতা নেই মোদের, তরিতরকারির আগুন দাম।

—সে কথা আর ব'লো না। হাটে বাগুন কেনতাম পয়সায় দু' সের তিন সের—তাই এখন বলে আট আনা সের। খাদ্য-খাদক উঠে গেল। ঝিঙে আছে ?

—তা তোমার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে—দুটো কটা দেবানি তুলে, খেয়ো।

—যাক গে, পাঁচ সিকেই দিও সর্দার, কারও কাছে পেরকাশ ক'রো না যেন এ কথা।

ইচু ও রমজান তামাক খেয়ে ঝিঙে ও শসা নিয়ে উঠে চলে এল। নোয়ালি সর্দারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। সে জানে রমজান জন-মজুরের নেতা, ওর কথায় দরদস্তুর ঠিক হয়। ওকে খুশি রাখলেই হল।

ইচুর বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল। নিমিকে বললে—ভাত রেঁধিছিস ?

—এ বেলা শরীরডে খারাপ। পানি দেওয়া ভাত আছে, খাও।

—তরকারি ?

—কিছু নেই।

—এই ঝিঙে কটা রেঁধে দে।

—রাঁধব কি দিয়ে, তেল কনে ? পাঁচ পলা ধার করে এনেলাম আছিরন

বিবির কাছ থে। এখনও শোধ দিতি পারি নি—আবার কি ধার করতি ছোটব ?

—পোড়া ?

নিমি খিল খিল করে হেসে উঠে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে—ও মা, মুই কনে যাব গো ! ঝিঙে পোড়া কেউ কখনও খায় শুনি নি। খেতি পারবা না।

—পারব পারব। দে তুই।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হল পাকাটির আলো জেলে। তেল নেই। অন্ধকার ঘরদোর। কে আসে, কে যায়, কিছু বোঝা যায় না। কচুঝাড়ে কেঁয়োঝাঁকার ঝোপে জোনাকি জলছে, উঁচু-নীচু—উঁচু-নীচু। দেবতা ঝিলিক মারছে, রাত্রে বৃষ্টি হবে বোধ হয়। ভাদ্রের গুমট গরম। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে ইচু যেমন মাদুর পেতে শুয়ে পড়েছে তখনই রাজ্যের ঘুম এসেছে ওর চোখে। আর জ্ঞান নেই।

কতক্ষণ পরে সে জানে না, লোকজনের গোলমালে ইচু শেখের ঘুল ভাঙল। অনেক লোকের গলা বাইরে। ওরই বাড়ির উঠোনে।

—ব্যাপারখানা কি ?

পাড়ার মোড়ল হাফেজ বুড়োর গলা—ও ইচু বাড়ি আছ ?

বছিরদ্দি শেখ ডাকছে—ও ইচু, বলি ওঠ, শোন ইদিকি।

সবে ভোর হয়েছে। পাক-পক্ষী ডাকতে শুরু করেছে। ইচু ধড়মড় করে উঠে বসে চোখ মুছলে। ফজরের নমাজের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এত লোক ওর উঠোনে কেন ? তাকে ডাকাডাকিই বা কিসের এত সকালে ? বাইরে এসে ঘুমচোখে উঠোনের দিকে চেয়ে ও অবাক হয়ে গেল। পাড়াশুদ্ধ মানুষ সব ওর উঠোনে। সে বিস্মিত সুরে বললে—কি হয়েছে গা মোড়লের পো ?

বুড়ো হাফেজ মণ্ডল বলল—ইদিকি এস।

—আগে নমাজটা করে নিই—দেরি হয়ে গিয়েছে উঠতে।

ইচু ঘরের পেছনের দাওয়ায় নমাজ সেরে নিয়ে আবার সামনে এল। সবাই ওর দিকে একসঙ্গে এগিয়ে এল। সবাই মিলে যেন একসঙ্গে ওকে কি বলতে চায়। ইচু ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে, ওর বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করছে। ভয়ও হয়েছে ওর, নিমি এ সময়ে কোথায় গেল ? হয়েছে কি ?

অন্ত সবাইকে থামিয়ে দিয়ে হাফেজ বললে—এস মোর সঙ্গে।

ইচু শেখ ওদের পেছনে পেছনে কলের পুতুলের মত চলল। রেল লাইনের দিকে সকলেই যাচ্ছে। নাবাল ক্ষেতের একহাঁটু জল পার হয়ে সবাই লাইনে উঠল। একটা খেতুর ঝোপের আড়ালে রেল লাইনের ওপর উঠে সবাই দাঁড়াল থমকে। হাফেজ ডেকে বললে—এখানে এস।

কি ব্যাপার? ইচু এগিয়ে গিয়ে যা দেখলে তাতে তার মাথা ঘুরে গেল, সে নিজেকে পড়তে পড়তে সামলে নিলে। রেল লাইনের ওপরে একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ—গলা সামনের দিকে গভীরভাবে কাটা, দেহের সঙ্গে একটি অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করে চিৎ হয়ে পড়ে আছে।

মৃতদেহ নিমির।

তার পর তার ভাল কিছু মনে পড়ে না। গ্রামের লোকে মিলে তাকে কত কিছু প্রশ্ন করতে লাগল। সে কোথায় ছিল, নিমি কতক্ষণ ঘরে ছিল, নানা প্রশ্ন। নিমি রেলে গলা দিয়ে মরে নি তাকে নাকি খুন করে টেনে এনে রেলে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। ইচু বুঝতে পারলে তার ওপর অনেক সন্দেহ এসে পড়েছে। পাশের গাঁয়ে দফাদারদের সংবাদ দিতে লোক যাবে এখুনি, তার আগে ইচুকে একবার জিগ্যেস করা দরকার, সে কোথায় ছিল তা জানা দরকার, সেইজন্যেই গ্রামের লোক তার বাড়িতে গিয়ে ডাকাডাকি করছিল।

ইচু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বললে- মুই কিছু বলতি পারি নে চাচা, আল্লা জানে। মুই মড়ার মত ঘুমুতি নেগেলাম।

—বউরি কিছু বলেলে? ঝগড়া হয়েল?

—কিছু না চাচা।

—বউ ঘরে শুয়েল?

ইচুর মনে একটা ভয়ানক সন্দেহ উঁকি মারলে। এ প্রশ্ন করে কেন লোকে? বছিরদ্দি শেখ এগিয়ে এসে ওকে উঠিয়ে বললে—মোর কথা সবাই শোন। ইচু সে রকম লোক নয়। চল এখুনি বনগাঁয়ে ওকে নিয়ে মোক্তার বাবুদের কাছে। বিহিত কথা তাঁরা বলবে, তাদের পরামর্শটা লেওয়া দরকার। এখানে থাকলি এখুনি দফাদার এসে ওকে বাঁধবে। তার আগে চল মোরা ছ'সাত জন ওরে নিয়ে বনগাঁয়ে যাই। পরামর্শ লিয়ে ফেলি। পুলিশ গ্রেপ্তার করবার আগেই। কে কে যাবা?

দেখা গেল সকলেই যেতে চায়।

ইচু ভগ্নস্বরে বলে—কিন্তু উকিল মোক্তার বাবুদের ট্যাকা মুই কন থে দেব? মোর হাতে একটা ট্যাকা আছে কালকার জনের দরুন। তাতে হবে?

হাফেজ বললে—ট্যাকার জন্যি তোমার ভাবনা হচ্ছে কেন? তোমার জান যদি বাঁচে কত ট্যাকা হবে। সে ভাবনা মোদের। তুমি চল দিনি। কি বল বছিরদ্দি?

বছিরদ্দি বললে- তা নিচ্চয়। টাকার জন্যি তুমি ভেবো না। সে মোরা ছাখব।

হাফেজ বললে—রেল লাইন ধরে চল যাওয়া যাক। সোজা রাস্তা দিয়ে গেলি পুলিশি ধরবে।

বেলা সাড়ে সাতটার মধ্যেই ওরা বনগ্রামের বড় মোক্তার রামলাল চাটুজ্যে মশায়ের বাসায় পৌছে গেল। রামলালবাবু বেশিক্ষণ ওঠেনি, সেরেস্তায় বসেই চা খাচ্ছেন, এবং মুহুরী তুলাল চক্রবর্তীকে বিলম্ব করে আসার জন্যে তিরস্কার করছেন - কাল চলে গেলে কাছারি থেকে বাড়ি, জামিননামা তুটো সই করাতে হবে, তোমার সে খেয়াল থাকে না। এখন এলে আটটার সময় —এমন করলে কি করে আমি কাজ চালাই? ওদের দরখাস্তের নকল নেওয়া হয়েছে?

—আজ্ঞে, নকলের জন্যে দরখাস্ত করা হয়েছে। কাল বিনয়বাবু সকাল সকাল চলে গিয়েছিল, দেখা পাই নি।

—সকালে কাছারিতে গিয়ে আজ নকল তু'খানা বার করে ফেল আগে— নইলে জেরাই হবে না।--কে? কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

হাফেজ মণ্ডল এগিয়ে এসে নীচু হয়ে ডান হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে বললে—সালাম বাবু।

—কি ব্যাপার? বাড়ি কোথায়?

হাফেজ মণ্ডল বললে—বিপদে পড়ে অ্যালুম বাবুর কাছে। বড্ড বিপদে পড়ে গিয়েছি। খুনের ফ্যাসাদ।

রামলালবাবু প্রবীণ মোক্তার। মোক্তারী ব্যবসায় চুল পাকিয়েছেন—শক্ত কেসে লোক যখন পড়ে, তখন দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে পয়সা খরচ করে, ধীরভাবে সে পয়সা আদায় করতে হয়। সুতরাং একটা সিগারেট ধরিয়ে (প্রবীণ

হলেও রামলালবাবু তামাক খান ·না, সিগারেটখোর) আরাম করে টান দিয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন—খুন ? কি রকম খুন ?

হাফেজ ইচুর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—এই লোকের বৌ গলা কাটা অবস্থায় কাল রাতে রেল লাইনে পাওয়া গিয়েছে।

—ওর নাম কি ?

—ইচু।

—ও রাত্রে কোথায় ছিল ?

—বাড়িতেই শুয়ে ছিল বাবু।

—বৌএর স্বভাবচরিত্র কেমন ?

হাফেজ চুপ করে রইল। সে প্রবীণ লোক, গ্রামের মোড়ল—তার মুখ দিয়ে আর ও কথা বার হয় কেন ? বছিরদ্দি শেখ পাশ থেকে ঈষৎ গলা খাঁকারি দিয়ে নিয়ে বললে—বাবু, ভাল না।

ইচু অবাক হয়ে বছিরদ্দির মুখের দিকে চেয়ে রইল। নিমির স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না ? কই, একদিনও তো সে কিছু জানে না। সে নিমির স্বামী, সে-ই কেবল জানে, আর সবাই জানে !

হাফেজ চুপ করেই রইল। বছিরদ্দি বলে যেতে লাগল—বাবু, এ লোক বড্ড ভালমানুষ—নিরীহ ভালমানুষ। ও কিচ্ছু জানে না এসব কথা। খুনও ও করে নি।

রামলাল মোক্তার বাধা দিয়ে ধমকের সুরে বললেন—তুমি কি করে জানলে ? তোমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে লোকে খুন করবে নাকি ? যা তুমি জান তাই বল ; যা জান না তা নিয়ে জ্যাঠামি ক'রো না। যাও, বস ওখানে।

পরে হাফেজের দিকে চেয়ে বললে—তুমি কি জান বল মোড়ল।

বছিরদ্দির অবস্থা-বিপর্যয়ে হাফেজ একটু ভয় খেয়ে গেল। সমীহ করে সংযত হয়ে বললে—আজ্ঞে বাবু যা বলছেন, অতি লেহ্য কথা। তবে ইচু আমাদের লোক ভাল। সবাই এ কথা জানে। আপনি সব লোককে জিগ্যেস কর, সবাই একথা বলবে।

রামলালবাবু সিগারেটে টান দিয়ে বললে—ঘটনা বল।

হাফেজ ঘটনা বর্ণনা করলে। ইচু মণ্ডলের মুখে যা সে শুনেছে। জন খেটে এসে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, সবাই গিয়ে ডেকে ওর ঘুম ভাঙায়। ও বলেছিল, রাত্রে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল, কি হয়েছে না হয়েছে কিছু

জানে না। শোবার আগে ওর স্ত্রী ওকে ভাত খেতে দিয়েছিল। ঝগড়া-বিবাদ হয় নি।

—আত্মহত্যা নয়?

—না বাবু। গলায় অস্তরের দাগ দেখলিই বোঝা যায়। গলা কেটে রেল লাইনি ফেলে রেখেছিল।

রামলালবাবু বললেন—অন্তত তাই প্রিজামশন হবে। পুলিশও তাই বলবে। লাশ দেখে কে আগে?

—বাবু, মোর ভাই আর নবি শেখ সকালে রেল লাইনির ধারে নালায় মাছ ধরতি যাচ্ছিল, তারাই দেখতি পায়। পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমারে খবর দেখ। মুই তখুনি দৌড়লাম লাইনির ধারে।

—আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি, থাক। সুরতহাল আগে হয়ে যাক, তার পরে দেখা যাবে। গ্রামে দফাদারকে খবর দিয়ে এসেছ ত? বেশ করেছ। বড্ড শক্ত কেস। সন্দেহ গিয়ে ইচু মণ্ডলের ওপরই পড়বে। বৌএর স্বভাবচরিত্র খারাপ ছিল। ভালমানুষ লোক হঠাৎ রেগে উঠলে এসব ক্ষেত্রে ভয়ানক হয়ে ওঠে কিনা। তোমরা লুকিয়ে চলে এসেছ?

—হ্যাঁ বাবু।

—একটা কথা শিখিয়ে দিই। ইচু?

ইচু এগিয়ে গিয়ে সেলাম করে দাঁড়াল। তার পা-দুটো ঈষৎ কাঁপছে।

—বলি শোন। তুমি খুন করেছ কি না করেছ তা আমি তোমায় জিগ্যেস করব না। আমাদের তা কাজ নয়। আমরা ধরে নেব তুমি খুন কর নি। কিন্তু পুলিশে তা শুনবে না। তোমাকে আজ সম্ভব রাস্তায় যেতে যেতেই গ্রেপ্তার করবে। তোমায় স্বীকার করাবার জন্যে নানারকম চেষ্টা হবে। কিন্তু কিছুতেই তুমি ব'লো না যে তুমি খুন করেছ। স্বীকার কিছুতেই করবে না। করেই থাক বা না-ই করে থাক। বুঝলে? যাও, সাবধানে যাও।

হাফেজ বললে—বাবু, পুলিশি ধরলি রাখবে কনে ওরে।

—রাখবে হাজতে। যতদিন না বিচার শেষ হয়। তবে ওখানে শেষ বিচার হবে না—দোষী প্রমাণ হলে দায়রায় চালান হবে যশোরে। সেখানে জজসাহেব বিচার করবেন। বাড়ি গিয়ে পয়সা-কড়ি যোগাড় কর গিয়ে—বড্ড ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছ—অনেক টাকার খেলা।

হাফেজ ও বছিরদ্দি সব শুনে যেন মাটির মধ্যে বসে গেল। বনগাঁর

মোক্তারবাবুর টাকাই জোগাড় হয় না, আবার যশোর জেলার কোর্টের উকিলবাবুদের টাকা গরিব গ্রামের লোকের চাঁদায় কি জোগাড় হয়ে উঠবে? ইচুকে বাঁচানো মুশকিল হয়ে উঠল।

এতক্ষণ পরে ইচু কথা বললে। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলে নি, এইবার সে হাত জোড় করে বললে—বাবু, মোর একটি কথা বলবার আছে!

ওর মুখের দিকে সবাই চাইলে। মোক্তারবাবও চাইলেন। এইবার বোধহয় সব প্রকাশ করতে চাইছে লোকটা। এই রকম ভাবেই বলে, তিনি জানেন। হাফেজ ও বছিরদ্দি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। কি জানি ওর পেটে কি আছে। মানুষকে সব সময়ে বাইরে থেকে চেনা যায় না।

রামলাল মোক্তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলেন। ভাবটা এই রকম—বলে ফেল বাপু যা আছে পেটে। অমন অনেক ঘুঘুই আমরা দেখলাম, তুমি এখন বাকি আছ।

ইচু রামলালবাবুর পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বললে—বাবু মোর একটা দরবার আছে। যাতে হয় আপনি তা দেখবেন—মুই গরিব লোক, জন খেটে খাই, আপনার পয়সা হয়তো মুই দিতে পারব না, গরিব বলে দয়া করে একটা আবদার রাখবেন মোর—আল্লা, দিনদুনিয়ার মালিক, আপনার ভাল করবে।

—আহা-হা, পা ছুঁয়ো না—কি—কি বল—

—বাবু, যেখানে মোরে রাখে, যা করে ক্ষেতি নেই। কিন্তু বাবু, আপনি এইটে তাদের বলে দেবেন, ব্যবস্থা করে যেন পাঁচ-ওক্ত নমাজ আমি সেখানে পড়তি পারি—আর কিছু আমার বলার নেই বাবু।

রামলালবাবুর সেরেস্তায় বজ্রপাত হলেও লোকে অতটা চকিত হত না (সেকালের নভেলের বর্ণনা অনুযায়ী)। হাফেজ ও বছিরদ্দি আবার পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। ঘুঘু মোক্তার রামলাল চাটুজ্যে হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এ রকম কথা এ সময় তিনি সামান্য একজন গ্রাম্য লোকের মুখ থেকে আশা করেন নি, যে খুনের দায়ে আজ পথেই হয়তো পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হবে, আজ বাদে কাল যাকে দায়রায় চালান দেওয়া হবে—শত অসুবিধা, অর্থনাশ, নির্যাতন যার সামনে, আর আইনের খাঁড়া যার মাথার ওপর ঝুলছে—নিষ্ঠুর নিয়তির হৃদয়হীন রক্তাক্ত ইঙ্গিতের মত।

রামলালবাবুই সেদিন বার লাইব্রেরিতে গিয়ে গল্প করেছিলেন—সত্যি

অবাক হয়ে গেলাম ভায়া, যখন লোকটা ও কথা বললে। আজ যাকে পথেই অ্যারেস্ট করবে পুলিশে, কাল পুরবে হাজতে, যার সব যেতে বসেছে—সে যে ওই ধরনের রিকোয়েস্ট করতে পারে তা আমার মাথায় আসে নি। আমি আগে ভেবেছিলাম বুঝি কনফেস করবে। সামান্য একজন লোক—আমার চোখে জল এসে পড়ল ভায়া।

ওরা সব চলে গেল। ইচু শেখকে ওরা বাজার থেকে পেটভরে তেলেভাজা সিঙাড়া কচুরি আর মুড়ি খাওয়ালে। হাফেজ বললে—ওরে চাড্ডি হোটেলের ভাত খাইয়ে নিলি হত। পুলিশি ধরলি কোথায় নিয়ে যাবে, আজ খাওয়া হবে কি না ঠিক তো নেই।

কিন্তু অত সকালে হোটেলে ভাত পাওয়া গেল না।

রাস্তা চলতে লাগল সবাই। দুপুরের কিছু দেরী আছে, ইচু পথের পাশে এক বটতলার ছায়ায় নমাজ পড়তে বসল। আর কোন কথা ওর মনে থাকে না। ঝিরঝিরে হাওয়ায় আজ পথের ধারের গাছতলায় অপূর্ব আনন্দ ও শান্তি নেমে আসে প্রাণে নমাজের সময়। সে সব ভুল যায়। চোখে যেন জল আসে। নিমি কত ভাত রেঁধে দিয়েছে—কত আদর-যত্ন করেছে। তার চরিত্র খারাপ ছিল? সে কিছু জানে না। নিমির জন্যে বুকের মধ্যে একদা বেদনা। নিমিকে সে খুন করবে? কাউকে কখনও খুন করার কথা তার মনে আসে নি। আল্লা সাক্ষী আছেন সব কাজের। ভয় কি? মালিক যা করবেন তাই হবে।

রাস্তায় ওকে পুলিশে ধরলে না. বেলা দুটোর সময় বাড়ি ফিরে ওরা দেখলে পুলিশ দফাদার অপেক্ষা করছে ওদের পাড়ার বড় মোড়লের বাড়ি। লোক গিজগিজ করছে। ডাকহাঁক, সাক্ষীর জবানবন্দি হতে বিকেল হয়ে গেল। শাইলিপাড়া গ্রামের সবাই একবাক্যে দারোগার সামনে বললে, ইচুর দ্বারা এ খুন হয়েছে তারা কেউ বিশ্বাস করে না। জবানবন্দিতে আরও প্রকাশ পেল—ইচুর স্ত্রী নিমি প্রায়ই রাত্রে স্বামীকে ঘুম পাড়িয়েই বাড়ি থেকে বেরুত। গ্রামের মধ্যে তার প্রেমিকের অভাব ছিল না। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলত। দারোগা ইচুকে সামনে ডাকিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করলেন। শেষে বললেন—তুমি কিছু জানতে না যে, তোমার স্ত্রীর চরিত্র খারাপ?

—না, দারোগাবাবু। কিছু জানি নে মুই।

—জান এতে চালান দিলে তোমার ফাঁসি হতে পারে ?

—আল্লার ঝদি তাই মর্জি হয়, মোর মনে এতটুকু খেদ থাকবে না দারোগা-বাবু—তেনার ঝা মর্জি তাই তিনি করুক। মুই খুশি ছাড়া অখুশি হব না।

বুড়ো হাফেজ মণ্ডল এগিয়ে এসে দৃঢ়কণ্ঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে—কাকে কি বলছেন বাবু ? আল্লার কথা উঠলি ওর চোখ দিয়ে পানি পড়ে। অমন লোক এ দিগরে নেই।

দারোগাবাবু বললেন—তুমি কাল রাত্রে কোথায় ছিলে ?

—ঘরেই শুয়ে ছেলাম। মড়ার মত ঘুম এসেছে চকি, সনেকপুরের বিলি জন খাটেলাম সারাদিন। ওনারা ডাকলে সকালবেলা, তখন মুই ঘুম ভেঙে উঠি।

দারোগাবাবু অভিজ্ঞ লোক, পুলিশের চাকরি অনেকদিন করছেন। কে সাধু কে বদমাইস চেনেন, ইচুর দ্বারা এ কাজ হয় নি ওর মুখের দিকে চেয়ে তখনই বিদ্যুতের লেখা বাণীর মত তাঁর মনের মধ্যে এ সত্য উদয় হল।

সেই সন্ধ্যায় ইচু নমাজ সেরে ভাঙা খালি ঘরে ঢুকতেই ওর প্রাণটা হা হা করে উঠল।

—নিমি, ও নিমি, মোরে ভাত এনে দে !

—সে আপন মনেই ডাকল। নিমিকে সে কত ভালবাসত, যে যা বলে ওসব সে বিশ্বাস করে না। বিচার করবার সে কেউ নয়। নিমিকে সে ক্ষমা করেছে।

—নিমি, ও নিমি, মোরে ভাত এনে দিলি নে ?

পরদিন গ্রামের লোক সকালে উঠে ইচুকে আর তার ঘরে দেখতে পেলে না। সে একবস্ত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছে কখন। গৃহস্থালীর কলসী, হাঁড়িকুড়ি, নারকেলের মালা, দু'একখানা পিতলের ঘটিবাটি সব ফেলে রেখে গিয়েচে।

খলসেখালি গ্রামের প্রান্তে নদীতীরে তেঁতুলগাছের তলায় পর্ণকুটিরে একজন ফকির কোথা থেকে এসেছে। সন্ধ্যায় আকাশের নীলপটে মেঘের রচনার সঙ্গে সঙ্গে সে খেজুরচটা বিছিয়ে নদীর ধারে যখন নমাজ পড়ে, তখন লোকে সবিস্ময়ে তার মুখে দেখেছে এক অদ্ভুত আলো, প্রভাতী তারার মৃদু জ্যোৎস্নার মত। এক সন্ধ্যা ভিক্ষাই তার উপজীবিকা। সবাই ওকে মানে, ভক্তি করে। নাম ওর ইচু ফকির।

সুলোচনা

সন্ধ্যা হইয়াছে, সুকিয়া স্ট্রীট দিয়া যাইতেছি। ডাক্তারখানা খুলিতে দেরি হইয়া গিয়াছে, সময় হইয়া আসিল, সুতরাং হন হন করিয়াই চলিয়াছি—এমন সময়ে বাড়িঘরের থামের ছায়ার আলো-আঁধারির মধ্যে একটি স্ত্রীলোককে দেখিয়াই আমি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম।

এ যেন সেই সুলোচনার মা না? অবিকল সেই রকম দেখিতে, যদিও বহুকাল দেখি নাই। কিন্তু তাও কি সম্ভব? এতকাল পরে সুলোচনার মা বাঁচিয়া থাকিবে এবং কলিকাতা শহরেই থাকিবে?

একটু জোর গলার ডাক দিলাম—শুনছেন? শুনছেন? বলি শুনছেন—এই যে? যে বৃদ্ধাটি ফিরিয়া দাঁড়াইল আমার ডাক শুনিয়া এবং হয়তো বা তাহাকেই কেহ ডাকিতেছে মনে করিয়া—বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম সে সুলোচনার মা-ই বটে।

সুলোচনার মা কাছে আসিল। প্রথমে চিনিতে পারিল না, পরে পরিচয় দিতেই দন্তহীন মুখে এক গাল হাসিয়া বলিল—ও তুমি যদু! আহা কতকাল দেখিনি তোমাদের!—ইত্যাদি বা ঐ ধরনের কোন উক্তি।

আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের যবনিকা হঠাৎ সরিয়া গেল। গত মহাযুদ্ধেরও কয়েক বৎসর পূর্বের কলিকাতা···ঘোড়ার ট্রাম সবে মাত্র বন্ধ হইয়াছে···তখনকার আমলের অতি সুন্দরী আধুনিকাদের মধ্যে যে আমার চোখে সর্বপ্রধান সুন্দরী এবং সবচেয়ে আধুনিকা ছিল, কিছুকাল পরে যাহাকে জীবনের জনসমুদ্রে একদম হারাইয়া ফেলি, এ সেই মেয়েটির মা।

তখনকার মেয়েদের চুল বাঁধিবার রীতি বা কাপড়-চোপড় পরিবার ধরন একালের মত ছিল না বটে, কিন্তু সত্যিকার সুন্দরী যে হয়, তাহাকে যে কোন সাজে, যে-কোন ঢঙে, যে-কোন ভঙ্গিতে মানায়, এবং সুলোচনা ছিল সেই ধরনের সুন্দরী মেয়ে। তাহার সেই দীর্ঘ ঋজু চম্পকগৌর যৌবনদীপ্ত দেহ, লম্বা টানা কালো কালো ডাগর চোখ, কালো কোঁকড়া চুলের রাশি, নিটোল সুগঠিত বাহু দুটি, সুন্দর মুখশ্রী কলিকাতার পথে পথে গলির আড়ালে আবডালে, পথের বাঁক হঠাৎ ফিরিয়াই, কিংবা কোন নির্জন পার্কে পাদচারণরত অবস্থায়

কত দিন কল্পনানেত্রে দেখিতাম; দেশে ফিরিয়া কত বর্ষণমুখর শ্রাবণ বা ভাদ্র রজনীতে এক-ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া প্রথম-যৌবনের রঙিন নেশায় যাহার মুখ কতবার মনে পড়িত—সেই সুলোচনার কোন খবর পাই নাই আজ এত বছর, ধীরে ধীরে কবে সে বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল··· আবার পুরানো যুগের সেই মেয়েটি ১৯৩০ সালের কলিকাতায় কোথা হইতে ফিরিয়া আসিল!

একটি প্রেমের কাহিনী। তবে সে-প্রেমের নায়ক আমি নই, গোড়াতেই কথাটা বলিয়া রাখা ভাল। সব যুগেই মেয়েরা যেমন ভালবাসে, ভালবাসিয়া কষ্ট পায়, মুখ বুজিয়া সহ্য করে, তিলে তিলে নির্বোধের মত নিজের দেহ ক্ষয় করে দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায়···অত রূপ লইয়াও সুলোচনা সে-দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই জানিতাম, তাই পরবর্তী সময়ে মেয়েদের যখন ভাল করিয়া জানিয়াছিলাম ও বুঝিয়াছিলাম তখন সেকালের তরুণী প্রেমিকা সুলোচনার জন্য মাঝে মাঝে মনটা কেমন করিয়া উঠিত।

যাক এখন সে-সব কথা। বর্তমানের কথাই আবার বলি।

সুলোচনার মা অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছে, আজ দেখিয়াই বুঝিলাম। কিন্তু সুলোচনার মা ভিক্ষা করিতেছে কেন? সুলোচনা কোথায়? কারণ ভিক্ষাই সে করিতেছিল। থামের পাশে দাঁড়াইয়া রাস্তার লোকের কাছে দু-একটি পয়সা চাহিতেছিল আমি লক্ষ্য করিয়াছি।

আমাকে পূর্বপরিচিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধা একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহার সে ভাবটা কাটাইয়া দিবার জন্য বলিলাম—এখানেই কোথাও বাসা বুঝি? দোকানে জিনিস কিনতে এসেছিলেন?—ভাল আছেন?

—আর বাবা, ভাল আর মন্দ! তুমিও যেমন!

কথাটা ভাল লাগিল না, সুতরাং যে প্রশ্নটি এতক্ষণ করিতে বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল, সেটা করিয়া ফেলিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম, সুলোচনার বয়স এখন হিসাবমত প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ—সুতরাং তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতে সংকোচের কারণ কি আছে? সে এখন আর ব্রীড়াবনতা সুন্দরী কিশোরী প্রণয়িনী নয় কারও।

—ইয়ে,—গিয়ে—সু—আপনার মেয়ে কোথায়?

—তাই তো বলছি বাবা, সে কি আর আছে? সে থাকলে আমার আজ এই···বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি এ উত্তরের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। অপ্রতিভের মত বলিলাম—ও!...

দু-জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। পরে আমিই বলিলাম—আজকাল আছেন কোথায়?

—রাস্তায়—গবর্নমেণ্টের রাস্তায়।

সবই বুঝিলাম। বড় কষ্ট হইল এ-কথা বলিলে ঠিক কথা বলা হইবে না। কষ্ট হইলেও বুড়ির জন্য হয় নাই। বুড়িকে কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিব ভাবিতেছি এমন সময়ে সে বলিল—তোমার সঙ্গে দেখা হল বড় ভাল হল বাবা। আমার ঘাড়ে সব ফেলে দিয়ে হতভাগী তো পালাল, এখন তার দুটি ছেলে, একটির বয়েস যোল আর একটি চোদ্দ, এদের নিয়ে আমার কি দুর্দশা ভাব দিকি এ বয়সে! একটা ঘরে আছি—এখনই ভাড়া দিতে না পারলে তাড়িয়ে দেবে বলেছে। তাই বলছি রাস্তা ছাড়া তখন যাব কোথায়?

—স্থলোচনা কত দিন মারা গিয়েছে?

—এই চোদ্দ বছর। ঐ কোলের ছেলেটি যখন দু-মাসের—সেই থেকে মানুষ করছি।

আমার হঠাৎ একটি কথা মনে হইল। স্থলোচনাকে আমি জানিতাম বটে, কিন্তু তার আসল ইতিহাস আমার কাছে রহস্যাবৃত ছিল। আমি খানিকটা বুঝিতাম, খানিকটা বুঝিতাম না—তাহার আর একটা কারণ, আমার বয়সও তখন কম ছিল। রূপসী স্থলোচনা আমার কাছে চিরদিন নারীত্বের গহন রহস্যের প্রতীক হইয়া আছে। এই উত্তম স্থযোগ। বড় কৌতূহল হইল উহার মায়ের মুখে তাহার ইতিহাস সব শুনিব।

বৃদ্ধাকে বলিলাম—আপনি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বসে থাকবেন কাল বিকেল পাঁচটার সময়—আমি আসব। বাড়িভাড়ার ব্যবস্থা যা হয় করা যাবে।

বুড়ি ছাড়িল না, তাহার বাসা দেখিতে হইবে এখনই। অগত্যা গেলাম। বাসা দেখিয়া মনে হইল, তেমন ঘরে মানুষ থাকিতে পারে না, গরু থাকিলেও কষ্ট পায়। একতলায় ছোট্ট অন্ধকূপের মত ঘর, একটি মাত্র দোর, যেটা দিয়া ঢুকিতে হয়—দ্বিতীয় দরজা বা জানালা নাই। এই পচা ভাদ্রে কি ভীষণ গুমট ঘরের মধ্যে।

স্থলোচনার ছেলেরা একটু পরে আসিল। বড় স্থন্দর ছেলে দুটি। স্থলোচনার মুখচোখ ভুলিয়া গিয়াছিলাম; ইহাদের—বিশেষ করিয়া ছোট

ছেলেটিকে দেখিয়া আবার সুলোচনাকে স্পষ্ট মনে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, যাত্রাদলে কৃষ্ণ সাজে একটি, অপরটি গান গায়।

হায় অভাগী সুলোচনা!...

তখনকার কালের শৌখীন মেয়ে, তখনকার কালের আধুনিকা স্মার্ট মেয়ে সুলোচনার মা ও ছেলেদের এ কি গৃহ, একি গৃহসজ্জা?...ছেঁড়া চটের বিছানা, চটের মধ্যে বিচুলির কুচিপোরা বালিশ, ভাঙ্গা কলাইচটা এক-আধখানা সানকি, একটা মাটির কলসী আর দড়ির আলনায় অতি মলিন খান দুই-তিন কাপড় ও জামা। একখানা কেওড়া কাঠের হাত-দুই চওড়া তক্তপোশ আছে—ছেলে দুটি তাতে শোয়, বুড়ি শোয় মেজেতে। তাও এই ঘরে আশ্রয় মিলিতেছে কই? এই আস্তাবল হইতেও বাড়িওয়ালা নাকি ইহাদের তাড়াইয়া দিবে বলিতেছে।

এই কাহিনীটি আর বেশীদূর অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইবার পূর্বে সুলোচনা কে ছিল, তাহার সহিত আমার কি ভাবে আলাপ—ইহা বলিব। নতুবা গল্পের অংশ ভয়ানক খাপছাড়া ঠেকিবে।

২

১৯০৬ সালে দেশের ইস্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিয়াছি। বেচু চাটুজ্জের স্ট্রীটে আমারই স্বগ্রামস্থ এক বন্ধুর বাবা ছেলেপুলে লইয়া বাসা করিয়া থাকিতেন, সেইখানেই উঠিয়াছি। আমার বন্ধুটির দাদা তখন বি-এ পড়েন এবং তাঁরই সঙ্গে দেখা করিতে প্রকাশচন্দ্র বসু নামে তাঁহারই এক বন্ধু বাসায় ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন। এই প্রকাশবাবু বড় অদ্ভূত লোক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মনেপ্রাণে যোগ দেওয়ার ফলে পুলিশের হাতে গুরুতর প্রহার খাইয়া নাকি কিছুদিন হাসপাতালে এবং কিছুদিন জেলে ছিলেন। তিনি নিজে হাতে কাহাকেও বোমা মারিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই—কিন্তু আলিপুর বোমার মামলার সময় পুলিশ দিনকতক তাঁহার পিছু পিছু ঘুরিয়াছিল। খুব বলিষ্ঠ, দীর্ঘ চেয়ারা, মুখের ভাবে বুদ্ধিমত্তা ও মননশীলতার ছাপ অতি সুস্পষ্ট। প্রেসিডেন্সি কলেজের বি-এ ক্লাসের ছাত্র, ছাত্র হিসেবেও যথেষ্ট মেধাবী।

আমরা প্রকাশদাকে যথেষ্ট খাতির করিয়া চলিতাম। তিনি বাড়িতে

আসিলে বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত খুশি হইয়া উঠিতেন। প্রকাশের জন্য এ-খাবার করা, প্রকাশের জন্য ও-খাবার করা; চা কোথায়, চেয়ারের উপর পাতিবার কুশন কোথায়; মিনি তাহার হাতের উলের কাজ দেখাইতে ছুটিতেছে; ডলি পড়া বলিয়া লইবার ছুতা করিয়া প্রকাশদার সঙ্গে দুটি কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছে—প্রকাশদার কাছে যেন বাড়িসুদ্ধ লোকের মন বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিবার অধিকার ছিল না বাড়িতে, তাহা হইলে সকলেই একসঙ্গে তুমুল প্রতিবাদ তুলিবে।

প্রকাশদার সঙ্গে মাঝে মাঝে সতীশ রায় বলিয়া তাহার এক বন্ধু আসিতেন, মেডিকেল কলেজের ছাত্র, খুব বড় বড় চোখ, শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা। ইহারা সবাই খুব স্ফূর্তিবাজ আমুদে ধরনের লোক—আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি মাতাইয়া তুলিতেন হাসি গল্পে গানে। মাঝে মাঝে আবার কয় বন্ধুতে ঘরে খিল দিয়া কিসের পরামর্শ করিতেন—তখন আমাদের জানালা দিয়া উঁকিঝুঁকি মারাও নিষেধ ছিল।

কৌতূহল চাপিতে না পারিয়া একদিন বন্ধু শরৎকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওরা ঘরে দোর দিয়ে কি করে রে?

শরৎ চুপিচুপি বলিল—কাউকে বলিস নি ভাই, ওরা সব অ্যানার্কিস্ট।

—তোর দাদাও?

—হ্যাঁ। ওরা দাদাকে দলে নিয়েছে।

শুনিয়া মনের মধ্যে একটা কৌতূহল ও উত্তেজনা অনুভব করিলাম। অ্যানার্কিস্টদের সঙ্গে এক বাসায় আছি ভাবিয়া ভয়ও হইল।

এইখানে একদিন প্রথম দেখিলাম সুলোচনার মাকে। নিজের ঘরটিতে বসিয়া পড়িতেছি, একটি প্রৌঢ়া বিধবা স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিল—প্রকাশ এখানে কবে এসেছিল জান? আজ আসবার কথা আছে?

দেখিলাম স্ত্রীলোকটির পরনে শাদা থান, বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশি নয়, গায়ের রং খুব ধপধপে ফরসা, বয়স হইলেও মুখশ্রী দেখিতে ভাল। আমার মুখে প্রকাশবাবুর আসিবার সম্ভাবনা আছে শুনিয়া আমারই ঘরে সে বসিল। আমায় বলিল—তুমি কি কর ছেলে?

—পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে।

—এটা তোমাদের বাড়ি?

—আমার বন্ধুর বাড়ি, আমি এখানে থাকি। বাড়িতে মেয়েরা আছেন—চলুন না বাড়ির মধ্যে, এখানে কেন বসে থাকবেন?

এইভাবে স্থলোচনার মার সঙ্গে বাড়ির মেয়েদের আলাপ হইয়া গেল। স্থলোচনার মা কিন্তু প্রকাশদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ছাড়া অন্য কার্যে কখনও আসে না, একদিন আমার এক কথা মনে হইল। বাড়ির মধ্যে মেয়েরাও এ-কথা বলিতে শুরু করিল। স্ত্রীলোকটি যে প্রকাশবাবুর কাছে টাকা লইতে আসে, তাহাও সকলে জানিয়া গেল। ক্রমে আমাদের সামনেই সে প্রকাশবাবুকে বলিত—ও প্রকাশ, বাবা এ-মাসে আর দশটা টাকা না দিলে মেয়ের বই হবে না। ক্লাসে তাকে বকে, বই না-কিনে ইস্কুলে যাবে কি করে?

আমার বন্ধুকে একদিন বললাম—ওঁর মেয়ে আছে তা তো এতদিন শুনি নি। ওঁরা প্রকাশদার কেউ হন? প্রকাশদা টাকা দেন কেন ওঁদের?

বন্ধু বলিল—জানি ওঁর এক মেয়ে এখানে স্কুলে পড়ে। আমি শুনেছি মেয়েটি সধবা, কিন্তু তার স্বামীর কাছে থাকে না। মা ও মেয়ে কোথায় যেন বাসা করে থাকে, প্রকাশদা আর সতীশদা দুজনে খরচ দেন। দাদা এ-সব গল্প সেদিন মার কাছে করেছিল।

—তা প্রকাশদা আর সতীশদা টাকা দেন কেন?

—ওঁরা অ্যানার্কিস্ট কিনা, দেশের আর দশের সেবা ওঁদের কাজ, বিশেষ করে প্রকাশদার। দাদা বলে, প্রকাশদা বাড়ি থেকে যে টাকা পান, তার বেশির ভাগ ওদের দিয়ে দেন, নিজে অনেক সময় টাকা ধার করতে আসেন দাদার কাছে। দুটো টিউশনি করেন, সে-টাকাও ওদের দিয়ে দেয়।

আমার ক্রমে মনে হইল বুড়ি প্রকাশদার কাছে নানা রকম ফন্দি ও ছুতায় টাকা আদায় করতে আসে। আর সব সময়েই মেয়ের অজুহাতে। আজ আমার মেয়ের এ নাই, আজ আমার মেয়ের তা নাই, একটা না একটা ছুতা বুড়ির লাগিয়াই আছে। প্রকাশদাও যেন কল্পতরু, 'না' বলিতে শুনিলাম না কোনদিন। বুড়ির উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলাম। বুড়ি বলিলাম বটে কিন্তু স্থলোচনার মা সে-যুগে বুড়ি ছিল না।

কত বার ভাবিতাম প্রকাশদাকে বলি, উহারা ফাঁকি দিয়া আপনার কাছে টাকা লইতেছে, যা চায় আপনি তা দেন কেন? কিন্তু প্রকাশদাকে শ্রদ্ধা-সম্মান করিতাম, কখনও সাহস করিয়া কথাটা বলিতে পারি নাই।

৩

এখানে একদিন সুলোচনা আসিল তাহার মায়ের সঙ্গে।

দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। রূপসী বটে। পাড়াগাঁ হইতে কয়েক মাস মাত্র আসিয়াছি, অমন রূপ কখনও দেখি নাই। বছর ষোল কি সতের বয়েস, পিঠে দীর্ঘ কালো চুলের বিনুনি দোলানো, যেমন চোখ তেমন ধপধপে গায়ের রং তেমনই নিটোল স্বাস্থ্য, অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী।

বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে স্বভাবতই তার যথেষ্ট ভাব হইয়া গেল। তার পর প্রায়ই আসিতে লাগিল। বিশেষ করিয়া প্রকাশদার আসিবার সময়টাতেই আসে এবং বেশির ভাগ কথাবার্তা বলে প্রকাশদার সঙ্গেই। প্রকাশদা উপস্থিত থাকিলে সেই যে তাহার চেয়ারের পিছনটি ধরিয়া দাঁড়ায়, তিনি যতক্ষণ এ-বাড়িতে থাকেন, বড় একটা অন্য কোথাও নড়িতে দেখি নাই।

প্রকাশদা উঠিয়া চলিয়া গেলে সুলোচনা আমাদের বড় বিরক্ত করিত। হয়তো বা আমাদের সে মানুষ বলিয়াই মনে করিত না, কে জানে। টেবিলে বসিয়া পড়িতেছি, সুলোচনা হঠাৎ আসিয়া বইখানা টানিয়া লইয়া গেল, নয়তো পিছন হইতে আসিয়া দুই হাত দিয়া চোখ চাপিয়া ধরিল, নয়তো ভূতের গল্প শুনিবার আবদার ধরিয়া বসিল। পড়িতে দিবে না কিছুতেই ; পড়া থাক, তাহার সঙ্গে ছাদে কে যাইবে? ডলির পুতুলের শুভ-বিবাহ এখনই ছাদে অনুষ্ঠিত হইবে তাহার পুতুলের সহিত—ইত্যাদি। এক-এক দিন এক-এক রকমের ব্যাপার।

কিন্তু প্রকাশদা থাকিলে সুলোচনা এ রকম করিত না। তখন তার অন্য মূর্তি। ধীর, স্থির, বেশি হাসিত না, বেশি বকিত না, কেমন যেন সলজ্জ, সকুণ্ঠ চোখমুখের ভাব, কতদিন দেখিয়াছি।

প্রকাশদা সুলোচনাকে 'সু' বলিয়া ডাকিতেন বলিয়া আমরাও সবাই তাকে 'সু' বলিতাম। একদিন সুলোচনা তাহাতে আপত্তি করিল। শরৎকে বলিল—প্রকাশদা যা বলেন, তোমরাও তাই বলবে কেন? ও নামে ডেকো না, কানে ভাল লাগে না। আমার বড় রাগ হইল। সুলোচনার চাল-দেওয়া ধরনের কথাবার্তা আমার সহ্য হইত না—আমার মনে হইত মেয়েটি অত্যন্ত গর্বিতা ও চালবাজ। রাগের ঝোঁকে বলিলাম—তাহলে তুমিও

আমাদের সঙ্গে মিশতে এসো না। সুলোচনার সহিত আমাদের এ ধরনের খুঁটিনাটি ঝগড়া প্রায়ই চলিত। তবে সে যে সব সময়ে আমাদের বাসায় আসিত তা নয়, মাসের মধ্যে দশ-বার দিনের বেশি না। প্রকাশদা এখানে যে-যে দিন আসিবেন, এমন দিন ছাড়া সুলোচনার এখানে আসা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিতাম। সতীশদার প্রতি সুলোচনা যেন তেমন সন্তুষ্ট নয়, অথচ সতীশদা সুলোচনা বলিতে অজ্ঞান ছিলেন। আমার বন্ধু শরৎ বলিত সুলোচনাদের কলিকাতার বাসাভাড়া ও বাসার সমস্ত খরচ নাকি সতীশদা দিতেন। কিন্তু সুলোচনা সতীশদাকে কেন যে দেখিতে পারিত না তাহা কি করিয়া বলিব?

একদিনের কথা বলি। সেদিন সতীশদা আসিবার কিছু পরে সুলোচনা তাহার মায়ের সঙ্গে আসিয়া হাজির। সুলোচনার মা বলিল—সতীশ, আমাকে দক্ষিণেশ্বর ঘুরিয়ে আনবে বাবা? সুলোচনাও বলিল—হ্যাঁ মামা (সতীশ-বাবুকে সুলোচনা মামা বলিয়াই ডাকিত), চল আমিও যাব।

সতীশদা হাতে যেন স্বর্গ পাইয়াছেন, তাঁহার চোখমুখের খুশির ভাব দেখিয়া তাহাই মনে হইল। উৎসাহের সহিত বলিলেন—হাঁ হাঁ। বরং চল দক্ষিণেশ্বর থেকে আমরা বরানগরের স্বামী অবধূতানন্দের আশ্রম দেখে আসব—সেও বড় চমৎকার জায়গা গঙ্গার ধারে।

সুলোচনার মা বলিলেন—তাহলে অমনি পেনেটির দ্বাদশ শিবের মন্দিরও দেখে আসি চল না?

সুলোচনাও বলিল—বড্ড মজা হয় মামা। একখানা গাড়ি ডাক। সতীশদা গাড়ি ডাকিতে গিয়াছেন, এমন সময় প্রকাশদা আসিয়া পড়িলেন। সুলোচনা তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিল তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য। তিনি কেন যাইতে চাহিলেন না তাহা আমি জানি না, সঙ্গে সঙ্গে সুলোচনাও তাহার মাকে বলিল—সে কোথাও যাইবে না, মায়ের ইচ্ছা থাকিলে তিনি একাই যাইতে পারেন। সতীশদা ইতিমধ্যে গাড়ি আনিয়া উপস্থিত করিলেন কিন্তু ঘটনার নূতন পরিস্থিতি দেখিয়া বড় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। প্রকাশদাও সুলোচনাকে যাইবার জন্য যথেষ্ট বলিলেন, এমন কি শেষে রাগও করিলেন, সুলোচনা কিন্তু কিছুতেই গেল না। অবশেষে বেচারী সতীশদার শুধু সুলোচনার মাকে লইয়াই যাইতে হইল। অবশ্য আমার বন্ধু বাড়ির

মেয়েরা কেউ কেউ সঙ্গে গেলেন—এতগুলি মেয়ে গেল, তবুও সুলোচনা এক পাও নড়িতে চাহিল না।

বছর দুই এইভাবে নানা সুখদুঃখের ঘটনার মধ্য দিয়া কাটিয়া পরে ১৯০৮ সালে আমাদের বাসা উঠিয়া গেল। আমি কলেজের হোস্টেলে আশ্রয় লইলাম। সুলোচনাদের সহিত সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল। আমার ছাত্রজীবনের বাকি বৎসরগুলির মধ্যে সুলোচনা বা তার মায়ের সঙ্গে চোখের দেখাও নাই একদিনের জন্য। সতীশদাকেও আর কখনও দেখি নাই। ইহাদের না দেখিবার কারণও যথেষ্ট ছিল, পুলিশের চাপেই বাসা উঠাইতে হইয়াছিল।

তবে প্রকাশদার সম্বন্ধে বিশেষ ঘটনা এই যে, আমার ছাত্রজীবনের তৃতীয় বৎসরে প্রকাশদা অদ্ভুতভাবে নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। আর কেহ কোনদিন তাঁহাকে দেখে নাই; পূর্ববঙ্গের কোথাও স্বদেশী ডাকাতি করিতে গিয়া পুলিশের গুলিতে মারা পড়িয়াছেন, কয়েক বছর পরে বিশ্বস্তসূত্রে এ কথা শুনিয়াছিলাম।

বছর পাঁচ-ছয় পরের কথা। কলেজ হইতে বাহির হইয়া কলিকাতার বাহিরে চাকুরি করি। কি একটা ছুটি উপলক্ষে হাওড়া স্টেশনে নামিয়া শেয়ালদ' দিয়া বাড়ি ফিরিতেছি। তখনকার আমলে শেয়ালদহ নর্থ স্টেশন হয় নাই—যেখানে আজকাল নর্থ স্টেশনের সম্মুখের ভাড়াটে গাড়ির আড্ডা, ওখানে অনেক চা পান শরবৎ ইত্যাদির দোকান ছিল। একটি দোকানে শরবৎ খাইতে গিয়াছি, দেখিলাম একটি ছোকরা এবং তাহার সহিত একটি সুবেশা রূপসী তরুণী সেখানে দাঁড়াইয়া ভাঁড়ে করিয়া শরবৎ খাইতেছে। দু-এক বার গোপনে মেয়েটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম—বয়েস বাইশ-তেইশ হইবে—চোখ যেন ফিরানো যায় না তাহার দিক হইতে। না, অপূর্ব রূপসী বটে মেয়েটি। আমিই শুধু চাহিয়া নাই, আশপাশের অনেকেরই দেখিলাম আমার দশা।

হঠাৎ আমাকে ভীষণ চমকিত ও আশ্চর্য করিয়া দিয়া তরুণী আমার একেবারে সামনে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—আরে যদু-দা যে!

বলিয়াই সে আমার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। চিনিতে অবশ্য বিলম্ব হইল না, বলিলাম—সুলোচনা যে! কোথা থেকে? তোমার মা কোথায়? কি করছ এখন?

সুলোচনা এ-সব কথার কোন উত্তর না দিয়া সর্বপ্রথম আমায় প্রশ্ন করিল—প্রকাশদার কোন খবর পেয়েছ?

প্রকাশদার মৃত্যুসংবাদ তখন আমি শুনিয়াছি, কিন্তু সেকথা বলিলাম না।

সুলোচনা আমায় ছাড়িতে চায় না, তখনকার পরিচিতদের মধ্যে এ কেমন আছে, ও কেমন আছে, আমার বন্ধু শরৎ এখন কোথায়, তাহার দাদা বিনোদ কি করে, তাহাদের বিবাহ হইয়াছে কিনা—নানা মেয়েলি প্রশ্ন। আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—অনেকদিন পরে দেখা, খাওয়াও দেখি, চল তো রায়মশায়ের হোটেলে!

সেই পুরানো দিনের মতই নিঃসংকোচ ব্যবহার সুলোচনার; মেয়েমানুষ হইয়াও ছেলের মত ব্যবহার, ধরন-ধারন, সেই সবই বজায় আছে অবিকল। তবে তাহার পরনে চওড়া জরিপাড় ফিকে নীল-শাড়ী ও ব্লাউজের বাহার, গলায় চিকচিকে সরু চেন ও পেনডেন্ট, পায়ে রূপালি ব্রোকেডের জুতা, সুগঠিত পেলব সুগৌর হাতে সোনার চুড়ির সঙ্গে সরু-ফিতা-বাঁধা হাতঘড়ি প্রভৃতি দেখিয়া মনে হইল সুলোচনার অবস্থা ফিরিয়াছে। সুলোচনার সৌখিনতার প্রতি স্নেহ হইল—এমন সুন্দরী মেয়েরা বেশভূষা না করিবে, সেণ্ট-পাউডার না মাখিবে—তবে সেসব সৃষ্টি হইয়াছে কাহাদের জন্য? সুলোচনার অঙ্গে শাড়ি ব্লাউজ অলংকার উঠিয়া নিজেরাই ধন্য হইয়া যায় নাই কি?

আমি বলিলাম—আরে ছাড় ছাড়, হাত ধরে ও রকম টানাটানি ক'রো না! —রায়মশায় কেন, চল ট্রামে ন্যাশনাল হোটেলে যাই কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। কিন্তু সঙ্গের ছোকরাটি বাদ সাধিল, নতুবা সুলোচনাকে লইয়া যাওয়া কষ্টকর হইত না।

ঘড়ি দেখিয়া বলিয়া বসিল—ট্রেনের দেরী নেই, কোথায় যাবে এখন বৌদি? এস চল—ধাঃ—! এমন কি, মনে হইল যে ছোকরা যেন সুলোচনার উপর জোর খাটাইতেছে। রাগ হইল—কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছ বাপু! সুলোচনাকে আমরা ছেলেবেলা হইতে জানি, তুমি তখন জন্মাও নাই। আজ আসিয়াছ আমাদের সামনে সুলোচনাকে ঘড়ি দেখিয়া টাইম বলিয়া দিতে! সুলোচনা যে খুব ভাল মেয়ে নয়, এ ধারণা আমার পূর্ব হইতেই ছিল, এখন সে-ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল। বেচারী প্রকাশদা! মেয়েদের ভালবাসার এই তো মূল্য। অন্তত সুলোচনার মত মেয়েদের। মনটা অশ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া গেল। সুলোচনাকে লইয়া ছোকরা স্টেশনের দিকে চলিয়া গেল।

সুলোচনা যাইতে যাইতে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—দমদমায় বাসা আজকাল। যেও একদিন—মা আছেন বাসায়। বিস্কুটের কারখানার পেছনে নরেশ পালের বাগানবাড়ি—

বলা বাহুল্য, দমদমার নরেশ পালের বাগানবাড়ি খুঁজিয়া সেখানে যাইবার সুবিধা ও সময় আমার হইয়া উঠে নাই।

বছরখানেক পরে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ববৎসর ১৯১৩ সালে আমি সন্ধ্যার দিকে এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে ট্রাম ধরিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় একখানি ট্রাম আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ দেখিলাম প্রথম শ্রেণীর কামরায় একখানি বেঞ্চিতে সুলোচনা একা বসিয়া আছে। আমি তখনই বিন্দুমাত্র না ভাবিয়া ট্রামখানাতে উঠিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িলাম। সুলোচনা প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়াছিল, পরে আমাকে দেখিয়া ও চিনিতে পারিয়া ভারি খুশি হইয়া উঠিল। বলিল—উঃ, যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে! আমি বলি কে এসে ঝুপ করে বসে পড়ল রে বাবা!—ভাল? কতদিন দেখা হয় নি—সেই শেয়ালদ' স্টেশনে সেবার—দাঁড়াও প্রণামটা করি।

কথাবার্তা বলিতে বলিতে চাঁদনির মোড়ে ট্রাম আসিল। সুলোচনা বলিল—নাম এখানে যদু-দা, কুরুশ-কাঁটা কিনব আর ছেলেটার জন্যে হর্লিক কিনব। আমি উহার মুখের দিকে আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া আছি দেখিয়া সুলোচনা সলজ্জমুখে বলিল—আজকাল আমার স্বামী এসেছেন যে আজ প্রায় বছরখানেক। এখন যে রোজকার করছি দু'পয়সা, আসবে বৈকি, এতদিন কেউ খোঁজও নেয় নি।

—আজকাল কি কর?

—যা রে, আজকাল তো ক্যাম্বেলে নার্সগিরি করি। এতদিন নার্সদের হোস্টেলে ছিলাম—এখন স্বামী ফিরে আসাতে বাসা করেছি দমদমাতে। সেই আর বছর যখন তোমার সঙ্গে দেখা তখন থেকে দমদমায় বাসা। এস না আজ, চল—আমার খোকাকে দেখে আসবে এখন—

—না আজ থাক, আর একদিন হবে। চল—চা খাবে সুলোচনা?

—শোন বলি। তুমি গিয়ে খোকার মামা, শুধু হাতে যেন যেও না। ওকে একটা হার কিনে দাও না?

আমার বড় রাগ হইল। দম দিয়া টাকা আদায় করিয়া লইতে সুলোচনা মায়ের মতোই পটু হইয়া উঠিয়াছে। আপন মামা হইলেও আজকালকার

বাজারে শুধু টাকা দিয়া মুখ-দেখা সারে, আর আমি কোথাকার কে, হার কেন দিতে যাইব? বলিলাম—এখন যাব না তোমার বাসায়। বড় ব্যস্ত আছি।

ট্রাম হইতে নামিয়া আমরা একটা গ্যাসপোস্টের তলায় দাঁড়াইয়াছি, গ্যাসের আলোয় সুলোচনাকে দেখিয়া সত্যই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। এ রকম রূপসী মেয়েকে লইয়া কোন চায়ের দোকানে ঢুকিতে সংকোচ মনে হয়—বিশেষত মনে রাখিবেন, ১৯১৩ সালের কলিকাতা, তখনকার দিনে মেয়েরা পথেঘাটে খুব কমই বাহির হইত। হইলও তাই, চায়ের দোকানসুদ্ধ লোক হাঁ করিয়া একদৃষ্টে সুলোচনার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার উপর সুলোচনার মুখে খই ফুটিতেছে কথার। সে চুপ করিয়া থাকিতে জানে না, আমি বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

আমায় বলিল—যাবে না বই কি, ইঃ! ভাগ্‌নের মুখ দেখ নি, দেওয়ার ভয়ে বোনের বাড়ি যাবে না—লজ্জা করে না বলতে? যেতেই হবে, আমি নেমন্তন্ন করছি, সামনের শনিবার যাবে, ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

ইহার সব ব্যাপারই রহস্যাবৃত; কোথায় এতদিন ইহার স্বামী ছিল, কোথা হইতে বা আবার আসিল, এ-সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইলেও চাপিয়া গেলাম। তবে সুলোচনা কখনও মিথ্যে বলে না ইহা আমি জানিতাম। পূর্বেও দেখিয়াছি এমন সব অবস্থায় সত্য কথা বলিত, যেখানে সত্য বলিলে তাহার নিজেরই ক্ষতির সম্ভাবনা। কাজেই সুলোচনার কথায় আমার অবিশ্বাস হয় নাই।

চা খাওয়া ও উলবোনার কাঁটা কেনার পরে আমি তাহাকে গাড়িতে উঠাইয়া দিতে আসিলাম। গাড়ির কামরায় বসিয়া সে তাহার পাশের বেঞ্চিতে হাত চাপড়াইয়া বলিল—এস, বস যদু-দা!

বলিলাম—আজ নয় সুলোচনা—মাপ কর। কাজ আছে।

সুলোচনা অভিমানের সুরে বলিল—না, থাক কাজ। এস—আসতেই হবে। কত কথা আছে তোমার সঙ্গে—রাস্তায় দেখা, কি কথাই বা হল! পুরোনো দিনের কথা আর কার সঙ্গে কইব?

পরে হঠাৎ আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, প্রকাশদার আর কোনও খবর পাওনি?

বলিলাম—নাঃ, কই আর। মনে মনে ভাবিলাম—সে-কথা জেনে তোমার লাভই বা কি এখন।

—বেঁচে নিশ্চয়ই আছেন, তবে পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে আছেন বলে মনে হয়। তাঁর কথা যে কই, এমন আর লোক কই এক তুমি ছাড়া ?

—কেন, সতীশদা কোথায় ?

—মামা ? মামা বিয়ে-থা করে দেশে দিব্যি সংসারী হয়ে বসেছে। তার মত মানুষে আর এর বেশী কি করবে! প্রকাশদার মত কি সবাই ?

গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা দিল। সুলোচনা বিস্ময়ের সুরে বলিল—সত্যি, আসবে না নাকি যদু-দা ? এস বস।

বলিয়া আমার হাত ধরিতে গেল।

কিন্তু আমার যাওয়া হইল না। যাইবার প্রবৃত্তি হইল না। তা ছাড়া সেই রাত্রেই আমাকে কর্মস্থানে ফিরিতে হইবে—সুলোচনার সঙ্গে গেলে ট্রেন ফেল করি। চাকরি বজায় রাখিয়া তবে অন্য কথা।

তখন কি জানি সুলোচনার সহিত এই শেষ দেখা !

সতের আঠার বৎসর পূর্বের কথা এ-সব।

৪

সুলোচনার মা পার্কে আসিল।

তাহাকে বাড়িভাড়ার টাকা মিটাইয়া দিয়া বলিলাম—এখন বলুন তো, আমি অনেক কথাই জানতাম না আপনাদের সম্বন্ধে। যা জানি ভাসা-ভাসা ভাবে জানি। সবটা বলুন।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। পার্কে ছেলেমেয়েরা দোলনায় দুলিতেছে, চেঁচামেচি করিতেছে, ঘুগনি চানাচুর কিনিতেছে।

সুলোচনার মায়ের নিকট হইতে নানারূপ জেরা করিয়া যে তথ্যটি উদ্ধার করিয়াছিলাম সেদিন, তাহা যেমন করুণ, জীবনের গভীর অনুভূতির দিক হইতে তেমনই অপূর্ব। কিন্তু তাহা বৃদ্ধার কথায় বলিলে ঠিকমত গুছাইয়া বলা হইবে না। তাই নিজে খানিকটা গুছাইয়া বলিবার চেষ্টা করিলাম।—

সুলোচনার মা অল্প বয়সে মেয়েটিকে লইয়া বিধবা হন।

ওদের বাড়ি বর্ধমান জেলায়। সুলোচনার যখন আট বছর বয়স, তখন

বিবাহ হয় পাশের গ্রামে। স্বামীর বয়স তখন ত্রিশ-বত্রিশ, স্বামীর চেহারা ভাল ছিল না বলিয়া ছেলেমানুষ মেয়ে তার কাছে বড় একটা যাইতে চাহিত না। স্বামী ছিল মূর্খ ও গোঁয়ার প্রকৃতির লোক, আট বছরের স্ত্রীর উপর মারধর ও নানা রকম অত্যাচার শুরু করে। ফলে, ওর মা দেশের জায়গা জমি বিক্রয় করিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া কলিকাতায় আসিল—তখন সুলোচনার বয়স দশ বৎসর। উদ্দেশ্য, মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইয়া স্বাধীনভাবে থাকিবার কোন সুবিধা করিয়া দিবে।

কিন্তু তখনকার কালে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা বা স্বাধীন জীবিকা উপার্জন প্রভৃতিকে লোকে ভাল চোখে দেখিত না। মা মেয়ের হাত ধরিয়া নানা জায়গায় বেড়াইল। হাতের পয়সা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া গেল—কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। এদিকে আরও নূতন উপসর্গ, মেয়ে অপূর্ব রূপসী, দশ বছরের হইলে কি হয়, তাহাকে দেখায় তের-চৌদ্দ বছরের মত—দুষ্ট লোকের চোখ পড়িল মেয়ের উপর।

এক দিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরিয়া মা মেয়েকে বলিল—চল আজ গঙ্গায় ডুবে মরব দুজনে—এখানে আর কোনও সুবিধে নেই—এবার মান যাবে। গরিবের কেউ নেই।

মেয়ে তৎক্ষণাৎ রাজি হইল।

রাত নটার সময় মেয়ে বলিল—কখন আমরা ডুবব মা? অন্নপূর্ণার ঘাটে চল যাই।

মা বলিল—এখনও সব ঘাটে লোক। এখন না, দেরি কর—

রাত দশটার সময় মা মেয়ের হাত ধরিয়া বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাটে সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিতেছে—হ্যাঁ রে, পারবি তো? বল আগে থেকে, পারবি তো?

মেয়ে এতটুকু ভয় খায় নাই। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—তুমি সঙ্গে থাকলে মা ঠিক পারব।

সেই সময় যামিনী ঘোষ বলিয়া একটি ছোকরা, অফিসের কেরানী, ঘাটের কাছেই কোথায় বসিয়া হাওয়া খাইতেছিল। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনারা এত রাত্রে এখানে কেন? আর ব্যাপারই বা কি? কি বলাবলি করছেন আপনারা? বাসা কোথায় আপনাদের?

যামিনী ঘোষের প্রশ্নের স্বরে বালিকা থতমত খাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মা সব খুলিয়া বলাতে সে-রাত্রে যামিনী মা ও মেয়েকে নিজের বাসায় লইয়া গেল।

দিন পনের কাটিল মন্দ নয়। যামিনী ছেলেটি খুব ভাল, কিন্তু ইহার এক বন্ধু সম্ভবত যামিনীর মুখে ইহাদের ইতিহাস শুনিয়া একবার দেখিতে আসিল। সেই যে আসিল, আর সে বাড়ি ছাড়িতে চায় না। তার আসা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াইয়া গেল। সুলোচনাও সকলের সামনে চিরকাল বাহির হয়, তখন তো আরও ছেলেমানুষ।

ছোকরা মাথার পিছন দিকে চুল ফিরাইত বলিয়া সুলোচনা আড়ালে মার কাছে তার নাম রাখিয়াছিল—কাকাতুয়া। একদিন মেয়ে মাকে বলিল—মা, কাকাতুয়া ভারি দুষ্টু। আমাকে গহনার বাক্স দেখিয়ে বলে কিনা—আমার সঙ্গে যাবি? তোকে এই সব গহনা দেব—আমি ওর সামনে আর বেরব না।

মা বলিল, হতচ্ছাড়া মেয়ে, তুই বা যাস কেন সকলের সামনে? বাড়ির মধ্যে থাকবি, যার-তার সামনে বেরনো, গল্প করা কি ভাল? আমরা গরিব লোক, আমাদের কত বিপদ জানিস?

যামিনীর আর এক বন্ধু ছিল সতীশ রায়। সতীশ মা ও মেয়ের দুঃখ শুনিয়া তাহাদের নিজের বাসায় লইয়া আশ্রয় দিল বটে কিন্তু দিনকতক পরে সেখানেও গোলযোগ বাধিল। সতীশ সুলোচনাকে দেখিয়া পাগল হইল। এমন কি, সতীশের মা সুলোচনা বিবাহিতা জানিয়াও ছেলের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। সুলোচনার মায়েরও অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু সুলোচনা একেবারে বাঁকিয়া বসিল। মাকে বলিল—মেয়েমানুষের ক-বার বিয়ে হয়? তোমাদের সব মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে—আমায় আর লেখাপড়া শেখাতে হবে না তোমার—তুমি আমাকে আমার শ্বশুরবাড়ি রেখে এস, সেখানে বাঁচি আর মরি। ঢের হয়েছে!

এখানে এই সময় একদিন আসিলেন প্রকাশদা।

প্রকাশদা সতীশের বন্ধু এবং ছাত্রমহলে নাম-করা। স্বদেশী। অ্যানার্কিস্ট বলিয়া খ্যাতিও তাঁহার যথেষ্ট রটিয়াছে তখন পুলিশের কৃপায়। প্রকাশদা সুলোচনার ইতিহাস সব শুনিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় সুলোচনা বেথুন স্কুলে ভর্তি হইল। প্রকাশদা মাঝে মাঝে তাহার পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করিতে আসিতেন।

এদিকে সতীশ বড় বিরক্ত করিয়া তুলিল। একই বাড়িতে থাকা, সর্বদা

দেখা-সাক্ষাৎ, সামনে না আসিয়া উপায় নাই। নানারকম দামী জিনিসপত্র কিনিয়া দিতে আরম্ভ করিল—সেণ্ট, সাবান, কাপড়-জামা ইত্যাদি। সুলোচনা বলিত—মামা, এ-সব কেন দিস? তুই বড় স্বার্থপর। এ-সব আমি নেব না।

মাকে বলিত—মা, অনেক মানুষ দেখলাম এ বয়সে, প্রকাশদার মতন মানুষ এ পর্যন্ত আর দেখি নি। অন্য ধাতের একেবারে। উনি মানুষ না দেবতা তাই ভাবি।

সতীশ দিত দামী দামী কাপড়, একবার পূজায় একখানা ভাল বেনারসী শাড়ি দিল। প্রকাশদা দিলেন একজোড়া মোটা স্বদেশী তাঁতের শাড়ি। সুলোচনার কি আহ্লাদ প্রকাশদার দেওয়া সেই মোটা শাড়ি পরিয়া! সতীশদার দেওয়া ভাল শাড়ি সে কদাচিৎ ব্যবহার করিত, কিন্তু মোটা তাঁতের শাড়ি দুখানা পরিয়া রোজ স্কুলে যাইত।

একদিন সে প্রকাশদাকে সতীশের ব্যবহার সব খুলিয়া বলিল। প্রকাশদা বলিলেন—এখানে তোমাদের আর থাকা উচিত নয়। তোমার লেখাপড়া এখানে থাকলে কিছু হবে না, অন্য জায়গায় বাসা কর, খরচ যা হয় আমি তার ব্যবস্থা করব।

সুলোচনার এক দূরসম্পর্কের ভগ্নীপতি কানাই ধরের গলিতে সস্ত্রীক বাসা করিয়া থাকিত। সুলোচনারা সেই বাসায় উঠিয়া আসিল। আসিবার সময় সুলোচনা প্রকাশদার দেওয়া মোটা শাড়ি পরিয়া, সতীশের দেওয়া দামী কাপড়-জামা সেখানেই রাখিয়া আসিল। সতীশ এই ব্যাপারে দিনকতক নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা করিয়া প্রকাশদার সঙ্গে পর্যন্ত দেখা-সাক্ষাৎ ছাড়িয়া দিল। মা মেয়েকে বলিল—কেন সতীশকে অমন করে চটিয়ে দিলি? ওর মনে কষ্ট দেওয়া হল না?

সুলোচনা বলিল—কষ্ট না পেলে মামার জ্ঞান হবে না মা? তা ছাড়া, দেখছ না, আমাদের জন্যে ও সর্বস্বান্ত হতে বসেছিল, ওর দেওয়া জিনিস আর নেব না।

তা সত্ত্বেও সতীশ ওদের নূতন বাসায় যাতায়াত করিত, জিনিসপত্রও দিতে ছাড়িত না। সুলোচনা বলিত—মামা, আবার কেন আসিস? তুই বড় স্বার্থপর—স্বার্থের জন্যে সব করিস বলে আমার ভাল লাগে না। দেখ দিকি প্রকাশদাকে?

একদিন সতীশ বলিল—আচ্ছা, আমি কি করলে তুই খুশি হবি স্থলোচনা? বল, আমি তাই করব।

স্থলোচনা বলিল—তুই বিয়ে কর মামা। খুব খুশি হব তাহলে। আমায় যদি সন্তুষ্ট করার তোর ইচ্ছে থাকে, খুব শীগ্গির একটি ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেল।

নূতন বাসায় প্রকাশদা কিন্তু বেশি আসিতেন না এবং আসিতেন না বলিয়াই আমাদের বাসায় যেদিন প্রকাশদার আসিবার কথা থাকিত, সেদিন স্থলোচনা এখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করিত।

এই সময় আলিপুরের বোমার মামলা আরম্ভ হইল। কি করিয়া প্রকাশদা ইহার মধ্যে জড়াইয়া পড়েন সে-কথা স্থলোচনার মা আমায় বলিতে পারে নাই। প্রকাশদা দীর্ঘদিন অনুপস্থিত রহিলেন। স্থলোচনা বড় ব্যস্ত হইয়া ছটফট করিত বলিয়া তাহার মা একদিন কলেজে খোঁজ করিতে গিয়া জানিল, কলেজেও প্রকাশদা বহুদিন যাবৎ অনুপস্থিত।

ছ'মাস পরে প্রকাশদা হঠাৎ একদিন এক হাঁড়ি রসগোল্লা হাতে ওদের বাসায় হাজির। স্থলোচনা তো খবর পাইয়াই ছুটিতে ছুটিতে বাহিরের ঘরে আসিল। বলিল—কোথায় ছিলে প্রকাশদা এতদিন? চেহারা এমন হয়েছে কেন তোমার?

প্রকাশদা বলিলেন—সে কথা জিগ্যেস করিস নে 'স্থ'। তা ছাড়া, এই শেষ। আমি স্বদেশীর আসামী, পুলিশ পেছনে ঘুরছে—আর আসতে হয়তো পারব না। যাবার সময় একটা কথা জিগ্যেস করে যাই—হয়তো আর দেখাই হবে না—স্থ, তুই আমায় কখনও ঘৃণা করবি নে বল্?

স্থলোচনা বলিল—তোমাকে অনেক ভালবাসি প্রকাশদা। যদি স্বামী না থাকত, তবে তোমার আরও নিকটে আসতুম। পা ছুঁয়ে বলছি—তা না হলে তোমার এই বিপদের সময়ে তোমার সঙ্গে চলে যেতুম—একলা যেতে দিতুম না—

বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

স্থলোচনার মা আমায় বলিল—মেয়ে আমার কখনও কাঁদত না। এই অনেকদিন পরে কাঁদলে। যাবার সময় প্রকাশকে কড়ার করিয়ে নিলে বিপদ উদ্ধার হলেই আবার ফিরে এসে সকলের আগে ওর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু প্রকাশ এই যে গেল, আর কখনও ফিরে আসেনি।

আমি বলিলাম—তারপর? আপনাদের কি হল?

তারপর প্রকাশ তো চলে গেল। শোন সব কথা, বিশ্বাস করবে না হয়তো। এই কলকাতা শহরে সেই পোড়ারমুখী মেয়ের আগুনের মত রূপ নিয়ে সে কি কষ্ট, কি বিপদ গিয়েছে আমাদের! দেখেছিলে তো তাকে।

দেখিয়াছিলাম বই কি। আবার এই প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর পরে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অপরাহ্ণের মৃদু স্তিমিত রৌদ্রালোকে সুলোচনার সেই অপূর্বসুন্দর কিশোরীমূর্তি স্পষ্ট মনের চোখে ফুটিয়া উঠিল। তার সেই ডাগর ডাগর চোখ, ঘন কালোচুলের রাশি···কথার সেই ভঙ্গি···চমৎকার মুখের হাসি···সর্বোপরি তার অনিন্দ্য মুখশ্রী···

তখন সুলোচনাকে বুঝি নাই, চিনি নাই—অভিজ্ঞতার অভাবের দরুণ সুলোচনাকে সে সময় চরিত্রহীনা, উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মেয়ে বলিয়া ভাবিয়াছি। শুধু আমি নই, আমার বন্ধুর বাসায় মেয়েরা সুলোচনা সম্বন্ধে এই মন্তব্যই হৃদয়ঙ্গম করিত। আমিও বিশ্বাস করিতাম। মনে মনে পরলোকবাসিনীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

সুলোচনার মা বলিল—মেয়ে রোজ কাঁদে প্রকাশ চলে যাওয়ার পরে। জানালা খুলে চেয়ে থাকে। সতীশকে দু'চোখে দেখতে পারে না। এদিকে যে বাসায় আমরা ছিলাম, তারা ঠিকমত টাকা দিতে না পারাতে আমাদের রাখতে চাইলে না। কালীঘাটে আমরা উঠে গিয়ে ছোট্ট একটি খোলার ঘরে আশ্রয় নিলাম। একদিন সেখানে এল কোথাকার রাজার ম্যানেজার—দশ হাজার টাকার লোভ দেখালে। মেয়ের গা সোনায় মুড়ে দেবে। মেয়ে বললে—মা, চুলগুলো কেটে ফেলি, নয়তো আর পারিনে! আমি বাড়ি নেই, গুণ্ডার দল বাড়ি ঘিরে ফেলেছে—বললে বিশ্বাস করবে না—এই কালীঘাটে, ইংরেজ রাজত্বের মধ্যে! মেয়ে মাথায় কেরোসিন তেল ঢেলেছে—চুলে আগুন জেলে মরছে। এমন সময় আমি গিয়ে পড়লাম—লোক ডাকাডাকি করলাম, গুণ্ডার দল পালাল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—সতীশদা যেত না বাসায়?

যেত, টাকা দিয়ে আসত আমার হাতে মেয়েকে লুকিয়ে। মেয়েও বড্ড নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে সতীশের সঙ্গে। একটা মুখের ভাল কথাও ইদানীং বলত না। আগে আগে ওর চিঠি এক-আধখানার উত্তর দিত—শেষে তাও বন্ধ করে দিলে। আমায় বলত—না মা, ওকে আসতে দিও না।

এ যে সর্বস্বান্ত হল আমাদের দিয়ে। কুকুরের মত আমরা ওর টাকা খাচ্ছি কেন? ও বিয়ে-থাওয়া করবে না আমাদের না ছাড়লে।

সেই সময় পাড়ার এক সহৃদয় প্রৌঢ় ডাক্তার নিজে চেষ্টা করিয়া সুলোচনাকে মেডিকেল কলেজে নার্সের কাজ শিখিবার জন্য ভর্তি করিয়া দিলেন—পাশ করিয়া প্রথমত সেই ডাক্তারের ডাক্তারখানাতেই কাজ পায়। কিছুদিন সেখানে কাজ শিখিবার পরে একদিন মাকে আসিয়া বলিল—মা, এ জগতে সব সমান। ওখানে আর আমার কাজ করা চলবে না। ছেড়ে দিয়ে এলুম।

মাস-দুই পরে ক্যাম্বেল হাসপাতালে কাজ জুটিল। তখন ওদের পটলডাঙায় বাসা। মা ক্যাম্বেলের গেট থেকে রোজ রাত এগারটার সময় মেয়েকে বাসায় আনে সঙ্গে করিয়া। তাহার মধ্যে বহু বিপদ গেল। ক্যাম্বেলের নার্স সুলোচনার রূপের খ্যাতি তখন চারিদিকে ছড়াইয়াছে, ছাত্রমণ্ডলীর অনেকের বাসন্তী প্রেমের-স্বপ্ন সে—কত প্রলোভন তাহাকে যে প্রতিদিন এড়াইয়া চলিতে হইত। গুণ্ডার হাতে পড়িতে পড়িতে কতদিন বাঁচিয়া গিয়াছে। একদিন মাকে বলিল—প্রকাশদা ফিরে এসে এ রকম দেখে খুশি হবে না। সে দেখে অসন্তুষ্ট হয় এমন কাজ কখনও করব না। তুমি আলাদা ছোট বাসা কর—আমি ক্যাম্বেলে নার্সদের হোস্টেলে যাই।

তাহাই হইল। হোস্টেলে দু'জনের নাম দিল যারা দেখা করিতে পারিবে—স্বামীর ও প্রকাশদাব। আশা ছিল প্রকাশদা একদিন হঠাৎ আসিয়া পড়িবেই।

সুলোচনার মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা, কখনও এব পরে প্রকাশদার পত্র-টত্র আসত না?

বুড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কখনও না। মেয়ে প্রকাশদা বলতে অজ্ঞান। ভাবত, প্রকাশ আসবে ফিরে। আমায় কতদিন বলেছে এ-কথা। প্রকাশ দেখে খুশি হবে বলেই তো দমদমায় অতিথিশালা খোলা হল ওর স্বামীকে নিয়ে এসে।

আমি অবাক হইয়া বলিলাম—অতিথিশালা! সে কি রকম?

—মেয়ের খেয়াল। এদিকে প্রকাশের নাম ক্যাম্বেলের হোস্টেলে লেখানো, ওদিকে দমদমার অতিথিশালা খোলা প্রকাশকে খুশি করবার জন্যে—প্রকাশ তখন মরে ভূত হয়ে গিয়েছে।

—ওর স্বামীকে আনলেন বুঝি আবার?

—আমরা আনি নি বাবা। ক্যাম্বেলে একজন রুগী এসেছিল সুলোচনার

শ্বশুরবাড়ির গাঁ থেকে। সে গিয়ে খবর দিলে স্বামী এসে পড়ল, মাপ চাইলে—আমরাও জায়গা দিলাম এই ভেবে যে স্বামী ভিন্ন বাহিরে পদে পদে বিপদ। স্বাধীন হয়েও রূপ নিয়ে সর্বদা সশঙ্কিত। কেউ মিত্র নেই, সবাই শত্রু। আজ যে বন্ধু, কাল সে শত্রু। ওর স্বামীকে নিয়ে দমদমায় বাসা করা গেল। যে যায় সেই খায়, তাই নাম হল অতিথিশালা।

আমার সঙ্গে এই সময়েই সুলোচনার দেখা হইয়াছিল। সে-কথাও আমি বৃদ্ধাকে বলিলাম।

বৃদ্ধা বলিল—তোমার কথা বলেছিল এখন আমার মনে হচ্ছে বাবা। তার পর ও চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্র্যাকটিস করতে লাগল। বেশ দু-পয়সা আয় হল। দুটি ছেলে হল। জামাইএর এককাঁড়ি দেনা ছিল দেশে, সব ও শোধ দিলে। সেই সময় একদিন কে এসে বললে দমদমার বাসায়—প্রকাশ মারা গিয়েছে। শুনেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল—সেই থেকে হল বুকের রোগ। তাতেই শেষে মারা গেল। খবরটা শোনার পর ছ'মাস বেঁচে ছিল।

দু'জনেই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

বৃদ্ধা অন্যমনস্কভাবে বলিল—সন্ন্যিসি হয়ে যাব বলে আপদ বিদেয় করবার জন্যে আট বছর বয়সে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। সে কোথায় চলে গিয়েছে আজ, আমি এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সে এখনও ভুগছি বন্ধনে। সে স্বামীকে ভাল করলে, তাকে মদ ছাড়ালে, মানুষ করলে—করে মরে গেল। জামাইও মারা গিয়েছেন। এখন আমি যদি মরে যাই ছেলে দুটো নিরুপায়। কোথায় দাঁড়াবে? রাস্তায়—গভর্নমেণ্টের রাস্তায়!

আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ইদানিং আমার বড় সুখ হয়েছিল। সে তুমি দেখনি। খাট, পিকচার, বাসন,—সুলোচনা প্রাকটিসে বেশ রোজগার করত—টাকা জমিয়ে এ-সব করেছিল। শৌখিন ছিল খুব, সে তুমিও তো দেখেছ। ময়লা কি কুশ্রী জিনিস দু-চোখে দেখতে পারত না। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ল—জামাই-এর হাতে অনেক টাকা পড়ল মেয়ে মারা যাওয়ায় পরে। জামাই তেজারতি করতে গিয়ে হাওড়ায় জমি বন্ধক রেখে দু' হাজার টাকা ধার দিয়েছিল—তারপরে সেও তো মরে গেল। হ্যাণ্ডনোটখানা এখনও আছে, হ্যাঁ বাবা তাতে কিছু হয়?

বুড়িকে বলিলাম, চোদ্দ বছর পরে সে হ্যাণ্ডনোটে আর কিছু হবে না। রাখিয়া ঘরের জঞ্জাল বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন সার্থকতা তার নাই।

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়িল। বলিলাম—আচ্ছা, ওর সঙ্গে একটা ছোকরাকে বেড়াতে দেখেছিলাম একবার। সে কে জানেন?

বুড়ি বলিল—শ্যামবর্ণ একহারা চেহারা তো? বছর বাইশ বয়েস? ও তো তার দেওর। পুন্নর জ্যাঠতুত ভাই—দমদমার বাসায় থেকে পড়ত।

আমার কতদিনের ভুল ভাঙিয়া গেল। কি অবিচার করিয়াছি সুলোচনার প্রতি।

সুলোচনা যে-যুগে বাহিরে চলাফেরা করিত, সে যুগে মেয়েদের অমন ভাব কেহ পছন্দ করিত না বলিয়াই তাহার নামে নানা কথা উঠিয়াছিল। সেই তরুণীর সচেতন অন্তরাত্মা যাহাকে ভালবাসিয়াছিল, তাহারই একনিষ্ঠ ধ্যানে সে দিনের পর দিন বৃথা অপেক্ষা করিয়া মরিত আশার কুহকে।

ক্যাম্বেলের সামনে দিয়া ট্রামে যাতায়াত করিবার সময় অভাগী সুলোচনার কথা আজকাল বড় মনে পড়ে।

ছায়াছবি

এক বন্ধুর মুখে এ গল্প শোনা।

আমার বন্ধুটি অনেক দেশ বেড়িয়েচেন, লোক হিসেবে অমায়িক, রসিক ও শিক্ষিত। কলকাতাতেই থাকেন।

যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন গল্পে-গল্পে অনেক সময় সারারাত কেটে যায়।

প্রকৃতপক্ষে ঠিক মনের মত লোক পাওয়া বড় দুষ্কর! অনেক কষ্টে একজন হয়তো মেলে। অধিকাংশ লোকের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়, সে সম্পূর্ণ মৌখিক। তাদের সঙ্গে আমাদের হয়তো ব্যক্তিগত অভ্যাসে, চরিত্রে, মতে, ধর্মবিশ্বাসে, বিদ্যায় যথেষ্ট তফাত। কিন্তু একই অফিসে কি কলেজে কি কোর্টে একসঙ্গে কাজ করতে হয়, দু-বেলা দেখা হয়—দাদা কিংবা মামা বলে সম্বোধন করতে হয়, কৌটাস্থ পানের খিলির বিনিময়ও হয়তো হয়ে থাকে—কিন্তু ওই পর্যন্ত। মন সায় দিয়ে বলে না তার সঙ্গে দু-বেলা দেখা হোলে গল্প করে বাঁচি। কোনো নিরালা বাদলার দিনে অফিসের হরিপদ-দার সঙ্গ খুব কাম্য বলে মনে হবে না।

আমার বন্ধুর নাম—থাক গে, নামের দরকারই বা কি? আবার লোকে তাঁকে বিরক্ত করবে। কৌতূহলী লোকের সংখ্যা সর্বত্রই বেশি। কোনো কাজ নেই—গিয়ে আনন্দ করবে আর বকবক বকাবে। তিনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং একজন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী। হাতে পয়সা এবং কলকাতায় বাড়ি আছে। বাড়ির গ্যারেজে মোটর গাড়ি থাকবার অন্য কোনো বাধা ছিল না, কিন্তু আমার বন্ধু আড়ম্বর ও বিলাসিতা পছন্দ করেন না।

ভূমিকা এই পর্যন্ত।

সে দিন খুব বর্ষার দিন। একা বাড়ি বসে বসে ভালো লাগলো না। একখানা ট্রেন ধরে কলকাতায় পৌছালাম। ভীষণ বর্ষায় ট্রাম বন্ধ। বাস কচিৎ দু-একটা চলচে। জল ভেঙে হেঁটে বন্ধুর বাড়ি গিয়ে পৌছুলাম।

বন্ধু আমায় দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন বলাই বাহুল্য। তখনি গরম চা খাবারের ব্যবস্থা হলো। পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসার ভদ্রতা বাদ গেল না।

তাঁর বৈঠকখানার গদি-আঁটা আরাম কেদারায় ততক্ষণে বেশ হাত-পা এলিয়ে বসে পড়েছি।

সন্ধ্যার পরে আবার সজোরে বৃষ্টি নামলো। বেশি ঠাণ্ডাবোধ হওয়াতে পাখা বন্ধ করতে হলো।

বন্ধুর আতিথেয়তা আমার সুপরিচিত। তিনি বললেন—ঘরে স্টোভ আছে, চলুন দোতলার ঘরে। এই বৃষ্টিতে আর কেউ আসবে না। খিচুড়ি চড়িয়ে দিই। ডিম আছে, আলু আছে—

—চমৎকার।

—মাছ দেখতে পাঠাবো রঘুয়াকে?

—কোনো দরকার নেই। আমাদের ওতেই হয়ে যাবে।

—চলুন ওপরের ঘরে। রাতে এখানে খাবেন এবং থাকবেন।

—নইলে আর যাচ্ছি কোথায়?

—যেতে চাইলেও যেতে দেওয়া হবে না।

ওপরের বসবার ঘরটিতে বন্ধুর লাইব্রেরী। দেওয়ালের গায়ে সারি দেওয়া কাঁচের আলমারি, সাধারণতঃ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বইয়ে ভর্তি। দেওয়ালে বড়-বড় অয়েল-পেন্টিং—প্রতিকৃতি নয়—সবই ল্যাণ্ডস্কেপ। ভাল চিত্রকরের হিমালয় অঞ্চলের দৃশ্য। আমার বন্ধু হিমালয়কে অত্যন্ত ভালবাসেন। হিমালয় অঞ্চলের ভৌগোলিক তত্ত্ব তাঁর নখদর্পণে। অনেকদিন রাতে হিমালয় ভ্রমণের নানা মনোরম গল্পে কখন রাত্রি কেটে গিয়েচে, টেরও পাই নি।

ওপরের ঘরে যখন গিয়ে বসলুম, তখন টেবিলের ওপর একখানা ছবিওয়ালা বই খোলা পড়ে আছে। বন্ধু হাতে নিয়ে বললেন—এখানা দেখেছেন? হিমালয়ান জর্ন্যাল। সেভেন হেদিনের ভ্রমণবৃত্তান্ত বেরিয়েচে।

—কোথাকার?

—কাশ্মীর।

—এমন শৌখিন স্থানে সেভেন হেদিন বেড়াতেন বলে জানতাম না। কোথায় তাকলা মাকান্, কোথায় কারাকোরম—এ সব দূর দুর্গম স্থান ছাড়া তিনি—

—না। চমৎকার দৃশ্যের বর্ণনা করেচেন, এ লেখাটায় দেখবেন।

—দেখবার চোখ ছিল ভদ্রলোকের—যা সকলের থাকে না।

—একশো বার সত্যি।

তারপর আমাদের গল্প আরম্ভ হলো প্রধানত কাশ্মীর নিয়েই। কাশ্মীর আমার বন্ধুটির জীবনের একটি তীর্থক্ষেত্র—অনেকবার তিনি ক্লান্ত নাগরিকের মন ও চক্ষুকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্ত দেশ-বিদেশে ভ্রমণে বিরুতেন আমি জানি। কাশ্মীরেও গিয়েচেন অনেকবার। কাশ্মীরের কথায় সাধারণতঃ তিনি পঞ্চমুখ হয়ে পড়েন। এবার কিন্তু একটা নতুন বিষয় নিয়ে তিনি কথা পাড়লেন। সেটা হলো তাঁর একটি অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা, যেটা কাশ্মীরের পথেই ঘটেছিল।

বন্ধু বললেন :

সেবার পূজোর পরে আমার বাল্যসুহৃদ রতিকান্ত মৈত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে তারই মোটরে দু-জনে কাশ্মীর যাত্রা করা গেল। রতিকান্ত প্রতিবৎসর নিজের মোটর নিয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে কোথাও না কোথাও যাবে। এবার আমারই কথায় সে কাশ্মীর রওনা হলো। পথের আনন্দ ও কষ্ট ভোগ করতে-করতে আমরা দিল্লী দিয়ে পৌছুলাম। সেখানে দিন দুই বিশ্রাম করে আমরা আবার মোটর ছাড়লুম।

বাকি পথটুকু বেশ কাটলো। সে বর্ণনা বিস্তৃতভাবে করবার কোনো আবশ্যক দেখি না।

কোহালায় পৌছুলাম দিল্লী থেকে রওনা হবার তিন দিন পরে সন্ধ্যার দিকে। মোটর থামিয়ে কোহালার বাজারে একটি চায়ের দোকানে চা পান করতে বসলাম দু-জনে। গাড়িতে রইল ক্লিনার রামদীন ও ভৃত্য নাথু বাগ। শেষোক্ত ব্যক্তির নামটি অবাঙালীর মত শোনালেও প্রকৃতপক্ষে ওর বাড়ি মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় এবং সে বাংলা ছাড়া অন্য প্রদেশের ভাষা জানে না।

চা পানের সময় দোকানদারকে আমাদের রাত্রির জন্তে একটু বিশ্রামস্থানের সন্ধান দিতে বললাম। সে দু-একটা সন্ধান দিলে। বড় পরিশ্রান্ত ছিলাম সেদিনটা। রাত্রিতে একটু ভাল ঘুমের দরকার ছিল। নাথুকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে (কারণ তার দ্বারা এ বিষয়ে কোনো সাহায্যই পাওয়া সম্ভব নয়) রামদীন ক্লিনারকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বাসার সন্ধানে বার হই।

রতিকান্ত বললে—গাড়ির একটা আস্তানাও তো খুঁজতে হবে?

আমি বললাম—খুঁজে পেলে ভাল হয়। বাইরে বেজায় ঠাণ্ডা। নাথু তো শীতে জমে যাবে গাড়িতে থাকলে বাইরে।

—রামদীন বরং পারে।

রামদীন বললে—হামারা ওয়াস্তে কই পরোয়া নেহি হুজুর—

কিন্তু বাসা কোথাও পাওয়া গেল না। কোহালা বড় জায়গা নয়। বাজারের সরাইগুলো পাঞ্জাবী ড্রাইভারের ভিড়ে পরিপূর্ণ। একখানা দোকানের পেছন দিকে একটা ঘর আছে বটে, দোকানদার দেখালে।—কিন্তু সে ঘর এত অপরিষ্কার ও আলোবাতাসহীন যে, সে ঘরে রাত্রি কটোনো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া সে ঘরে বিশ্রাম করতে গেলে মোটর বাইরে পড়ে থাকে। রামদীন মুখে বলেছে বলেই তাকে হিমবর্ষী রাত্রে বাইরে শুইয়ে রাখা যায় না।

রতিকান্ত বললে—উপায়?

আমি এর আর কি উপায় বলবো!

পরামর্শ করা গেল, সেই চায়ের দোকানীর কাছে আবার যেতে হবে। তাকে গিয়ে এমনভাবে ধরা হলো যেন এই পার্বত্য দেশে সে-ই আমাদের একমাত্র-রক্ষক ও অভিভাবক। তারই মুখ চেয়ে আমরা বাড়ি থেকে এক দু-হাজার মাইল রাস্তা অতিক্রম করে এসেচি।

দোকানদার লোক ভালো। সে বলে দিলে বাজারের পেছন দিয়ে যে পথটা ছোট্ট পাহাড়টা ডিঙিয়ে চলে গেছে, ওরই ওপারে এক বৃদ্ধ জাঠের বাড়ি। সে বাড়িতে অনেক সময় লোকজনদের আশ্রয় দেয়।

আমরা দু-জনে দোকানদারের কথামত সেখানে গেলাম।

বাড়িখানা কাঠের দোতলা। দেখে মনে হয়, একসময়ে বাড়ির মালিকের অবস্থা ভালই ছিল।

আমাদের ডাকাডাকিতে একজন বৃদ্ধ দাড়িওয়ালা লম্বা সুপুরুষ ব্যক্তি দোর খুলে রুক্ষস্বরে জিগ্যেস করলে—কিস লিয়ে হল্লা মচাতে হো? কৌন হায় তুম্ লোক?

আমরা বিনীতভাবে আমাদের আসবার কারণ ব্যক্ত করলাম। আমরা নিরীহ পথিক, কোনো গোলমাল করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

বৃদ্ধ বললে—কোথা থেকে আসচ তোমরা?

অবশ্য হিন্দীতেই বলেছিল কথা।

আমরা বললাম কলকাতা থেকে।

—ঘরভাড়া আমি দিই না।

—মেহেরবানি করে একটু জায়গা দিতেই হবে।

—কে বললে এখানে জায়গা আছে ?

—বাজারে শুনলাম।

—আমি ঘর ভাড়া দিই না।

—ভাড়া না দেন, একটু আশ্রয় দিন।

—বৃদ্ধ একটুখানি কি ভেবে বললে—ক-জন লোক ?

—চার জন। তবে একজন মোটরে শুয়ে থাকবে বাজারে।

—একখানা ঘরের বেশি দিতে পারবো না।

—তাই আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করবো।

আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম লোকটি আমাদের নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগলো। বাড়িতে কোন স্ত্রীলোক আছে বলে আমাদের মনে হলো না। সিঁড়ির বাম দিকের কোণের ঘরে সে আমাদের নিয়ে গিয়ে বললে—এই ঘরটা আমি দিতে পারি। আর ঘর নেই। কারপেটখানা পেতে নেবেন। বাইরের টবে জল আছে। গরম জল দিতে পারবো না—

কিন্তু—বলেই লোকটা চুপ করে গেল।

আমাদের ভয় হলো পাছে সে আবার মত বদলায়।

আমরা উভয়েই জোর করে বললাম—আপনার খুব মেহেরবানি। চমৎকার ঘরটি।

—জিনিস পত্র কোথায় ?

—মোটরেই আছে। আরও দু-জন লোক মোটরে আছে। তাদের একজনকে নিয়ে আসি।

—কি খাবেন রাত্রে ? এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা হবে না।

কোনো দরকার নেই। আমরা দোকান থেকে আনিয়ে নেবো। চলুন, আমরাও নিচে যাই। বাজারে যাবো।

আধ ঘণ্টা পরে আমরা আবার এসে বিছানাপত্র পেতে নিলাম। রামদীন মোটরেই রইলো। রতিকান্ত অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল। তারই অনুরোধে আমি আলো নিবিয়ে দিয়ে ওর শোবার ব্যবস্থা করে দিলাম, তারপর আমি নিজে এসে বারান্দায় দাঁড়ালাম।

বাজারের রাস্তা সামনের ছোট পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে যে উপত্যকায় নেমেছে, তারই এপারে, এই ছোট্ট দোতলা কাঠের বাড়িটি। অল্প অল্প জ্যোৎস্না

উঠেচে, সামনের নিম্নভূমি অর্থাৎ উপত্যকার বেঁটে ওক, চেনার ও সরল গাছের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার কী অপূর্ব শোভা! বাতাস বেশ শীতল। আমার যেন চোখে ঘুম আসচে না, এই সুন্দর বনাবৃত উপত্যকার শান্ত কুটিরখানি সারারাত্রি জেগে ভোগ করি এই যেন আমার মনের গূঢ় বাণী। কিন্তু শরীর মানলো না। পথক্লান্ত দেহ এলিয়ে পড়তে চাইছিল শয্যায় অগত্যা আশ্রয় করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি জেগে উঠে বিছানার ওপরে বসলাম। কি একটা শব্দ যেন আমি ঘুমের ঘোরে শুনেছি, তাই ঘুম ভেঙেচে। শব্দটা তখনও হচ্চে, আমি বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরে গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ গিয়ে পড়লো নিম্নের উপত্যকার বনভূমির দিকে। এমন একটি দৃশ্য আমার চোখে পড়লো যাতে আমি পাথরের পুতুলের মত আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। চাঁদ হেলে পড়েচে পশ্চিম আকাশে, তারই সুস্পষ্ট আলোতে দেখি একটি নারীমূর্তি আমার সামনে কি একটা গাছের ডালে দোল্না বেঁধে দোল খাচ্ছে।

ভাল করে চেয়ে দেখলাম। হ্যাঁ, নারীই বটে, সুন্দরী নারী। বাইশ-তেইশের মধ্যে বয়েস।

কিন্তু মেয়েটির দোল খাওয়ার স্থান—বিশেষ করে সময়, আমার কাছে বড় আশ্চর্য বলে মনে হলো। কাশ্মীরের দিকে কখনো আসি নি। এখানকার মেয়েরা এই হিমবর্ষী রাত্রের শেষ প্রহরে বনে এমন ভাবে দোলনা টাঙিয়ে দোল খায় নাকি?...

দৃশ্যটা যদি শুধু সুন্দর হতো—সুন্দর সন্দেহ নেই—তাহোলে আমি এত অস্বস্তি বোধ করবো কেন? আমার যেন মনে হলো এই দৃশ্যের মধ্যে একটি জিনিস আছে—যা অশিব, যা নিয়মের বিপরীত, যা অমানুষী!—

তাড়াতাড়ি রতিকান্তকে ডাকলুম। সেও যখন বাইরে এল, তখনও মেয়েটি দোল খাচ্ছে।

রতিকান্তকে বললাম—ও কে ভাই?

সে অবাক হয়ে গিয়েছে। চোখ রগড়ে বললে—তাইতো।

—এখানকার মেয়েরা ওরকম করে নাকি?

—তা কি জানি?

হঠাৎ রতিকান্ত বলে উঠলো—ওকি! দোলনায় দড়ি কই? গাছে টাঙিয়েচে

কি দিয়ে ? ভাল করে চেয়ে দেখলাম সত্যই তো, দোলনার দড়ি এত অস্পষ্ট যে চন্দ্রালোকে দেখা যাচ্ছে না। সরু তার হোলেও দেখা যাবে এ আলোতে। কিন্তু তার বা দড়ি কিচ্ছু নেই—শূন্যে ঝুলচে দোলনা ! আরও একটা ব্যাপার যা এতক্ষণ পরে লক্ষ্য করে দেখলাম—আমাদের দিকে অল্প দূরেই গাছটার তলায় এ ব্যাপার ঘটছে, অথচ কোনো রকম শব্দ আমাদের কানে আসচে না। সবসুদ্ধ মিলিয়ে যেন একটা ছবি।

রতিকান্ত বললে—ভাই, বাড়িওয়ালাকে ডাকবো ?

—ডাকো।

—আবার এরই কেউ না হয়—তাহোলে হয়তো চটে যাবে।

—তুমি ডাকো। যা হয় হবে।

কথা বলতে বলতে একটু অন্যমনস্ক হয়েই পড়েছিলাম দু-জনে। বোধ হয় কয়েক সেকেণ্ড। পরক্ষণেই সামনের দিকে চেয়ে দেখি কোথায় সেই দোদুল্যমান তরুণী নারীমূর্তি ! কিছুই নেই সে গাছের তলায়। ওই তো সেই বাঁকা ডালটা, জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেচে গাছটার শুভ্র কাণ্ড ; পাশেব বেঁটে ওক গাছটা তেমনি দেখা যাচ্চে—কিন্তু কেউ কোথাও নেই, গাছের তলা একদম ফাঁকা।

রতিকান্ত বললে—ওকি কোথায় গেল ?

—তাইতো !

—আশেপাশে নেই তো ?

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কেউ পালাতে পারে না—আমাদের দু-জনের চোখ এড়িয়ে এই জ্যোৎস্নালোকিত উপত্যকা থেকে। যাবার আর কোনো রাস্তা নেই, বাজারে যাবার ওই সঙ্গে পায়ে চলার পথ ছাড়া। পেছনে উঁচু পাহাড়টা। বনের নিচে আগাছার জঙ্গল নেই বাংলাদেশের মত—বেশ পরিষ্কার তলা দেখা যাচ্চে জ্যোৎস্নায়। সম্ভব নয় কোথাও লুকোনো বা পালানো আমাদের চোখ এড়িয়ে—অল্প সময়ের মধ্যে।

রতিকান্ত বললে—ব্যাপার কি ?

—তাইতো আমিও ভাবচি !

—এ দেখচি একেবারে ম্যাজিক !

—সেই রকমই মনে হচ্চে।

—কি করা যাবে এখন ?

—শোয়া ও ঘুমুনো।

রাত বড় বেশি ছিল না। ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে উঠে রতিকান্ত ও আমি দেখি নাথুর তখনও নাক ডাকচে। ওকে উঠিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে বলে আমরা আবার এসে বারান্দায় দাঁড়ালুম। ওই সেই গাছটা, ওই সেই বাঁকা ডালটা। সত্যি সত্যি কাল শেষ রাতের দিকে আমরা দু-জনে এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই অদ্ভুত দৃশ্যটি দেখেচি কিন্তু আমাদের নিজেদের কাছেই মনে হচ্চে ওটা আসলে ঘটে নি, হয়তো রাত্রির স্বপ্ন। স্বপ্ন? কি জানি?

দাড়িওয়ালা বৃদ্ধের নিকট বিদায় নিয়ে আমরা মোটরের পাশে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের দোকানী বন্ধু চেরা সরল কাঠের ডাল উনুনে দিয়ে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করচে। আমাদের দেখে বললে—কি, জব্বর ঘুম হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—কোনো বিপদ-আপদ ঘটে নি তো?

আমি যেন দোকানীর কথার সুরে ও দৃষ্টিতে একটি প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন লক্ষ্য করলুম।

আমরা চা দিতে বলে ওর দোকানের সামনে জাঁকিয়ে বসে রাতের ঘটনা সবিস্তারে ওকে বর্ণনা করলাম।

দোকানী ঘাড় নেড়ে হেসে বললে—জানি বাবুজি। এই জন্যেই ও বাড়ির সন্ধান আপনাদের দিতে ইতস্ততঃ করছিলাম। ওই বনে জ্যোৎস্না রাতে কত লোক ও মেয়েটিকে দুলতে দেখেচে। ও মানুষ নয় জিন, আফ্‌রিট্‌, হুরী—

বলে হাত নেড়ে যেন সব জিনিসটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললে—আপনারা আজই কোহালা ছেড়ে চলে যান। আমি জানি যারা ওই খুবসুরত জিন হুরীর মোহে পড়ে ওই কাঠের ঘর ভাড়া নিয়ে দিনের পর দিন থেকে গিয়েচে—শেষকালে তাদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে। একবার একটা আত্মহত্যাও ঘটেছিল। বেশিদিন থাকলেই বিপদে পড়ে যাবেন। বাড়িওয়ালা বুড়ো ওই জন্যেই আজকাল বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না।

আমরা বললাম—তোমরা তো স্থানীয় লোক, তোমরা দেখতে পাও?

রোজ কি জিন, আফ্‌রিট্‌দের নজরে পড়ে? দু-মাস হয়তো কিছুই না, একদিন হয়ে গেল। কানুন কিছু নেই। তবে কানুনের মধ্যে এই, চাঁদনি রাত হওয়া চাই আর রাতের শেষপ্রহর হওয়া চাই। এখানকার লোকেরা সাঁঝ জ্বালার পর ও-পথে বড় একটা যাতায়াত করে না।....

—হ্যাঁ, এক রুপেয়া সাড়ে সাত আনা হুজুর। আদাব হুজুর।

অভিনন্দন-সভা

এবার দেশে গিয়ে দেখি, গৌর পিওন পেনসন্ নিয়েচে। কতকাল পরে? বহুদিন···বহুদিন।

বায়ুমণ্ডলে যখন প্রজ্বলন্ত উল্কা ছুটে চলে, তখন গোটা ফটোগ্রাফ প্লেটটা সে এক সেকেণ্ডে পার হয়ে যায়। কিন্তু ছ'ঘণ্টা কি সাত ঘণ্টা ঠায় আকাশের দিকে ক্যামেরার মুখ ফিরিয়ে রাখলেও, নীহারিকা একচুল নড়ে না।

গৌর পিওন (গৌরচন্দ্র হালদার, জেলে) আমাদের জীবনে সেই বহু-দূরবর্তী নিহারিকার মতো অনড় ও অচল অবস্থায় এক ডাকঘরে, এক ডাকের ব্যাগ ঘাড়ে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর ডাকহরকরার কাজ করে আসচে। মধ্যে অবশ্য তিন বছরের জন্যে সে কেবল কোটচাঁদপুর গিয়েছিলো, বদলী হয়ে, তাও তার মন সেখানে টেকে নি। ওভারসিয়ারের কাছে বিস্তর কান্নাকাটি করে আবার চলে এসেছিলো সে আমাদের এই ডাকঘরে।

১৯১২ সালের ৭ই জুলাই সে প্রথম ভর্তি হয়েছিলো এখানকার ডাকঘরে।

তার মুখেই শুনেচি, আমি তখন স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। বাবা বিদেশ থেকে টাকা পাঠাতেন, ও আমাদের বাড়ি এসে বলতো—'টাকা নিয়ে যান, বাবাঠাকুর!'

বলতাম—'ক'টাকা?'

'—ন'টাকা?'

'—কোন্ ডাকঘর থেকে?'

'—বহরমপুর।'

একবার এক বুড়ো-পিওন আমাদের গাঁয়ের বিটে বদলি হলো, গৌর পিওনের পড়লো অন্য বিট। বুড়ো বাড়ি এসে আগেই বলতো—'কট্হর নিয়ে এসো। সড়া কট্হর দেবে না? আচ্ছা কট্হর লিয়ে এসো—খাবো।'

তার নাম পাঁড়েজি। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। অনেকদিন এদিকে ছিলো। অমনিধারা বাংলা বলতো। কিন্তু তার দোষ ছিলো, দূরের গাঁয়ের চিঠি থাকলে হাঁটবার ভয়ে যেতো না।

একবার বাঁওড়ের ধারের ঝোপ থেকে এই রকম অনেক চিঠি কুড়িয়ে

পাওয়া যায়। বুড়ো পাঁড়েজির নামে নালিশ গেলো ওপরে। তাকে এখান থেকে বদলি করে দিলে।

গৌর পিওন এলো এরই পরে। সেই থেকেই ও এখানে আছে, মাত্র তিন বছর ছাড়া।

গৌর পিওন তিন-চার বছর কাজ করবার পরই আমি গ্রাম ছেড়ে চলে গেলাম। পুনরায় ফিরলাম, দীর্ঘ আঠারো বছর পরে।

সেদিনই বিকেলে দেখি, গৌর পিওন চিঠি বিলি করতে এলো আমাদের বাড়ি।

সত্যি, অবাক হয়ে গেলাম। আমি আশা করি নি···এতকাল পরে সেই বাল্যের গৌর পিওন, পুরোনো দিনের মতো চিঠি বিলি করতে আসবে।

গৌর উঠোন থেকে রোয়াকে উঠে এসে বললে—'প্রাতঃপেন্নাম, বাবাঠাকুর।'

'—গৌর যে! ভালো আছো?'

'—আপনাদের আশীর্বাদে চলে যাচ্চে, বাবাঠাকুর। বাড়ি-ঘর আপনার একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিলো যে, না থাকার জন্যে!'

গৌব কিন্তু অবিকল সেই রকম আছে। বয়স ষাটের কাছাকাছি হলো হিসেব মতো।

গবর্নমেণ্টের খাতায় যে-বয়সই লেখা থাকুক না কেন, মাথার একটি চুলও পাকে নি। তবে সামান্য একটু কুঁজো হয়ে পড়েচে। গলায় তুলসীর ত্রিকণ্ঠী মালা বার্ধক্যের একমাত্র সুস্পষ্ট চিহ্ন।

'—কতদিন চাকরি হলো, গৌর?'

'—তা, একত্রিশ-বত্রিশ বছর।'

'—রোজ ক'খানা গাঁ বেড়াতে হয়?'

'—পাঁচ-ছ'খানা গাঁয়ে বিট থাকে রোজ। পাঁচ-ছ'কোশ হাঁটতে হয় দৈনিক। জলে-কাদায় হানিভাঙা, দুগগোপুর, সরভোগ, দেকাটি এ-সব জায়গায় যেতে বড্ডো কষ্ট। পা হেজে যায়, পাঁকুই হয়।

কতদিন পরে ওকে ডাক বিলি করতে দেখে মনে খুব আনন্দ হলো।

কতদিন পর দেশে এলাম, বাইরের জগতে কতো পরিবর্তন ঘটে গেলো, আমার নিজের জীবনেও কতো-কি ওলট-পালট হলো—কিন্তু পুরোনো গ্রামে ফিরে এসে দেখি, সময় এখানে অচঞ্চল। বাঁশ, আম বনের ছায়ায় পুরোনো

জীবন সেইরকমই বয়ে চলেচে। গৌর পিওন সেই পুরোনো দিনের মতই চিঠি বিলি করচে।

গৌর পিওন রোজ আসে, রোজ খানিকটা বসে গল্প করে। কোনোদিন একটা নারকেল, কোনোদিন বা একটা কাঁঠাল চেয়ে খায়।

সেবার প্রায় মাস আট-নয় বড়ো আনন্দেই কেটেছিলো গ্রামে। তারপরই আবার অনিচ্ছাসত্বেও চলে যেতে হলো বিদেশে। কাটলো সেখানে কয়েক বছর।

এইবার আষাঢ় মাসে দেশে ফিরে এলাম আবার।

এসে দেখি, বাড়ির কি ছিরিই হয়েছে। না থাকলে যা হয়। কয়েক বছরের বর্ষার জলে পুষ্ট হয়ে আগাছার জঙ্গল বাড়ির ছাদ পর্যন্ত নিবিড় ঝোপের সৃষ্টি করেচে। সিমেণ্ট উঠে গিয়ে রোয়াকে কাঁটানটের জঙ্গল গজিয়েচে। ঘরের মধ্যে কড়িকাঠে মৌমাছিরা চাক বেঁধেচে। কলা-বাদুড় কড়িতে বরগাতে ঝুলচে। চামচিকের নাদি দু'ইঞ্চি পুরু হয়ে জমেচে মেঝের ওপর।

পরদিন সকালে গৌর পিওন চিঠি বিলি করতে এলো। এসে সে বললে—'আজই আমার চাকরির শেষ দিন, বাবাঠাকুর। বাড়ি এসেচেন, তবুও শেষ দিনটা আপনাকে চিঠি দিয়ে গেলাম।'

'—আজই শেষ দিন?'

'—আজই, বাবাঠাকুর। পঁয়ত্রিশ বছর তিনমাস পূর্ণ হলো। আর কতদিন রাখবে, গবর্নমেণ্ট।'

'—বসো। একটা পাকা আনারস নিয়ে যাও। বাঁশবাগানে জংলি আনারস অনেক হয়ে আছে, বেশ মিষ্টি।'

গৌর কিছুক্ষণ বসে গল্প করে চলে গেলো।

পরদিনও দেখি, সে ডাকব্যাগ ঝুলিয়ে চিঠি বিলি করে বেড়াচ্চে, সঙ্গে একজন ছোকরা বয়সের পিওন।

বললাম—'কি গৌর, আজ আবার যে?'

গৌর প্রণাম করে বললে—'নতুন লোক এসেচে, ও-তো বাড়ি-ঘর চেনে না, তাই ওকে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চি।'

কিছুদিন কেটে গেলো।

গৌর পিওনের স্ত্রী অনেকদিন মারা গিয়েচে। একটি মেয়ে আছে, সেই রান্নাবাড়া করে। অবস্থা অতি দীনহীন।

একদিন ওর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি, ও পরের বাড়িতে দুধ দুয়ে বেড়াচ্চে।

গৌর বললে—'বাবাঠাকুর, সামান্য পেনসনে কি চলে? আজকাল এই বাজার। তাই দেখি, দুধ দুয়ে কিছু যদি উপরি পাই।'

'—একটা ছোটোখাটো ব্যবসা করো না কেন?'

'—বাবাঠাকুর, যথেষ্ট বয়েস হয়েচে। হাতে টাকা পয়সাও নেই যে ব্যবসা করবো। এই রকম করে আপনাদের আশীর্বাদে একরকম চলে যাবে।'

সত্যিকার দীনতামাখা মুখ ওর। দীনতা যদি বৈষ্ণবসুলভ গুণ হয়, তবে ও একজন খাঁটি বৈষ্ণব।

তারপর একটি মজার ঘটনা ঘটে গেলো।

ব্যাপার এই: মহকুমা হাকিম বদলি হয়ে যাচ্চেন, তাঁর বিদায়-অভিনন্দনের সভায় আমার ডাক পড়লো। খুব বক্তৃতা ও প্রচুর জলযোগের আয়োজন ছিলো সেখানে। এমন সহৃদয় রাজকর্মচারী জীবনেও নাকি কেউ দেখেন নি। তিনি মহকুমার যে উপকার করে গেলেন, এখানকার অধিবাসীরা কখনো তা বিস্মৃত হবে না (কি উপকার? আজকের দিনটি ছাড়া কারো মুখে এতদিন সেই মহদুপকারের বার্তা শোনা যায় নি। কেন?)। বীরেনবাবু বক্তৃতা করতে উঠতে তাঁর কানে কানে বললাম, আর কেন বেশী কথা খরচ করছেন অস্তগামী সূর্যের পেছনে, সংক্ষেপে সারুন। লুচি ঠাণ্ডা করেন কেন অকারণে।

বিদায়ী মহকুমা-হাকিম তাঁর বক্তৃতায় বললেন—তিনি এই মহকুমার জন্যে বিশেষ কিছু করেন নি (খাঁটি সত্য), তাঁর বন্ধুরা তাঁকে স্নেহ করেন বলেই এতো ভালো উক্তি তাঁর সম্বন্ধে করলেন (মিথ্যে কথা হয়ে গেলো, স্নেহ করেন বলে নয়)। তিনি এখানকার কথা কখনো ভুলতে পারবেন না, ইত্যাদি।

সেখান থেকে ফেরবার পথে বার বার মনে হলো, এ-সব বিদায় অভিনন্দন ব্যাপারটা আগাগোড়া মিথ্যে ও অসার। মহকুমা হাকিমকে তোষামোদ

করতে হবে বলেই এর আয়োজন। আমি গৌর পিওনকে অভিনন্দন দেব না কেন? সত্যিকার সমাজসেবক সে, পঁয়ত্রিশ বছর ধরে গ্রামে গ্রামে চিঠি বিলি করে এসেচে, জল-ঝড়কে তুচ্ছ করে—শীত মানে নি, গ্রীষ্ম মানে নি। বিনয়ের সঙ্গে, দীনতার সঙ্গে, মুখে কখনো একটা উঁচু কথা শোনা যায় নি তার।

গ্রামে তরুণ সঙ্ঘের ছেলেদের কাছে কথাটা পাডতেই তারা তক্ষুনি রাজী হয়ে গেলো। সঙ্ঘের কর্মী নিতাই বললে—'খুব ভালো কথা, কাকা। নতুন জিনিস আমাদের দেশে।'

বিনয় আর একজন ভালো কর্মী, সঙ্ঘের সেক্রেটারি। তার খুব উৎসাহ দেখা গেলো এতে; সে বললে—'রসিক চক্কোতি দারোগাকে আমরা ও-বছর অভিনন্দন দিয়েচি কাকা, বাহাত্তর টাকা চাঁদা তুলে। আপনি জানেন না, সে অতি ধড়িবাজ লোক ছিলো, ঘুষ খেতো দু'তরফ থেকেই। তাকে যখন অভিনন্দন দিয়েচি · !'

'—সে সভার সভাপতি কে ছিলো?'

'—বরেন দাঁ, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট।'

'—ঐ যার দোকান?'

'—আজ্ঞে, যে এ-বাজারে কাপড়ের চোরা-কারবারে লাল হয়ে গেলো। সে একাই পঁচিশ টাকা দিয়েছিলো।'

'—দেবেই তো। দারোগার সঙ্গে ভাব না থাকলে, চোরাকারবার হয় কি করে।'

সন্ধ্যের সময় কর্মীরা এসে জানালে, কাজ তারা আরম্ভ করে দিয়েচে। তবে বাজারের অনেকেই হাসবে; বরেন দাঁ সবচেয়ে বেশী। বরেন দাঁ চাঁদা দেবে না। সে বলে—'গৌর পিওনের অভিনন্দন? এ মতলব কার মাথায় এলো? দূর! তোমরা বাবা লোক হাসালে দেখচি। লোকে কি বলবে? কে কবে শুনেচে, ডাকহরকরা পেনসন পেলে তাকে আবার ফেয়ার-ওয়েল-পার্টি দেওয়া হয়? হাকিম-দারোগাদের দেওয়া হয়, এটাই জানি।'

বিনয় বলেচে—'আপনাদের কাল চলে গিয়েচে, বরেন জ্যাঠা। একালে গরীব লোকেরাই অভিনন্দন পাবে। দিন চাঁদা। আমরা শুনবো না। দশ টাকা দেবেন আপনি। কেন দেবেন না?'

এই নিয়ে উভয় পক্ষে তর্ক হয়ে গিয়েচে। বরেন চাঁদা দেয়নি, শেষ

পর্যন্ত নাকি অতিকষ্টে আট আনা দিতে চেয়েছিলো। বিনয় না নিয়ে চলে এসেচে।

তাতে কোনো ক্ষতি হয় নি। বিনয়কে বললাম—'বুধবার অভিনন্দন সভা হবে—বাজারের বড়ো চাঁদনীতে, সবাইকে জানিয়ে দাও—'

বিনয় বললে—'আপনি শুধু পেছনে থাকুন, আমাদের ওপর কাজ করবার ভার রইলো।'

ছু-তিনদিন খুব বর্ষা হলো। আমি আর কোথাও বেরুতে পারি নি। ব্যাপারটা কতদূর এগিয়েচে তার খোঁজ নিতে পারলাম না। বুধবার দিন বিকেলের দিকে সেজেগুজে বাজারের দিকে বেরুলাম। জিনিসটা কি আমিই নষ্ট করে দিলাম? একবার দেখা দরকার।

বাজারে যেতেই দেখি, ক্যাম্বিসের জুতো পায়ে, গায়ে জামা, গৌর পিওন আমার আগে-আগে চলেচে।

বড়ো চাঁদনীতে গিয়ে দেখলাম, ছোকরার দল দিব্যি সভা সাজিয়েচে। রঙিন কাগজের মালা, দেবদারু পাতা, মায় কলাগাছ—কিছু বাদ যায় নি। স্কুল থেকে চেয়ার বেঞ্চি আনিয়েচে। ভেঁপু মুখে দিয়ে তারা বলে বেড়াচ্চে—'আজ বেলা পাঁচটায় অবসরপ্রাপ্ত পিওন—শ্রীগৌরচন্দ্র হালদারের বিদায় অভিনন্দন সভা হবে, বড়ো চাঁদনীতে—আপনারা দলে দলে যোগদান করুন'।

স্কুলের ছেলেরা ভিড় করে এলো সভায়। স্থানীয় মাস্টারদের মধ্যেও কেউ বাদ রইলেনে না, সব হাজির হলেন। বাজারের সকলেও এলো—কি হয় দেখতে। ফলে, সভা আরম্ভ হবার আগেই বসবার আসন সব ভর্তি হয়ে গেলো। লোকে চারিদিকে দাঁড়িয়ে থাকতে আরম্ভ করলে।

বিনয় নিয়ে এলো বরেন দাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করে। স্মিতমুখে বরেন দাঁ সভায় ঢুকে আমাকে দেখে একটু যেন দমে গেলো।

তাহলে কি সভাপতি তাকে করা হবে না? আমাকে বললে—'ভায়া যে! কবে এলে?'

'—আমি তো এসেচি, চার-পাঁচদিন হলো।'

'—তাই।'

'—তার মানে বরেন-দা?'

'—এখন সব বুঝলাম ভায়া। তুমি যে এসেচো জানতাম না। এখন বুঝলাম।'

'—কি বুঝলে?'

'—তোমারই কাজ। নইলে, গৌর পিওনের অভিনন্দন। এমন উদঘুট্টি কাণ্ড আবার কার মাথায় আসবে? তা, ভায়া—আজকের সভাপতিত্বটা তুমিই করো।'

আমি পল্লীগ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের মনের ভাব বুঝি নে? এতো বোকা আমি নই। তৎক্ষণাৎ বললাম, 'ক্ষেপেছো বরেন-দা? তুমি হাজির থাকতে, আমি? কিসে আর কিসে! তা হয় না। চলো দাদা, তোমাকে আজকের দিনের—

—'না না, শোনো. ভায়া…'

বরেন দাঁর মুখে খুশির ঔজ্জ্বল্য। আমি ওকে হাত ধরে টেনে সভাপতির চেয়ারে এনে বসালাম।

আমার ইঙ্গিতে গৌর পিওনকে সভাপতির পাশে বসানো হলো। একেবারে প্রেসিডেণ্টের পাশের চেয়ারে...জনমণ্ডলীর দৃষ্টির সামনে।

এও আজ সম্ভব হলো। গৌর পিওনের দিকে চেয়ে দেখলাম। ওর মুখও খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেচে।

গৌর চারিধারে চেয়ে চেয়ে দেখচে, একি ব্যাপার? সে বোধহয় বিশ্বাস করতে পারে নি যে, তার সভা এমন চেহারার হবে, বা তাতে এতো লোক সমাগম হবে। বরেন দাঁর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি, স্কুলের হেডমাস্টারের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি, আড়তদার নৃপেন সরকারের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি সে সভা অলঙ্কৃত করবেন—তাঁদের মহিমময় উপস্থিতি দ্বারা। ছেলেরা সভায় দল-বেঁধে এলো, প্রত্যেকের হাতে একগাছা করে ফুলের মালা, একজনের হাতে চন্দনের বাটি। উদ্বোধনী সঙ্গীত শুরু হলো:

'শরতে আজ কোন্ অতিথি এলো প্রাণের দ্বারে'

রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেই হবে, যার যা জানা আছে, সভার উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল হলো, বা না হলো। পাড়াগাঁয়ে কে ক'টি রবীন্দ্রনাথের গান জানে? যা জানে, ওই ভালো। লাগাও।

আমি সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাব করবার সময় বললাম—

'আজকের এই জনসভায় বিশিষ্ট সমাজ-সেবক শ্রীগৌরচন্দ্র হালদার মহাশয়ের অভিনন্দন উৎসবে পৌরোহিত্য করার জন্যে দেশের অলঙ্কারস্বরূপ (কিসে?) উদার হৃদয় (একদম বাজে) কর্মী আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের সুযোগ্য

(নির্জলা মিথ্যে) প্রেসিডেন্ট মহোদয়কে (মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান আর কি) অনুরোধ করচি, তিনি দয়া করে অদ্য (দয়া করবার জন্যে পা বাড়িয়েই আছেন)—ইত্যাদি ইত্যাদি।

একটি ছোটো মেয়ে সভাপতির গলায় ফুলের মালা দিলে। কার্য-সূচীর প্রথমেই আমি লিখে রেখেচি, 'সভাপতি কর্তৃক শ্রীগৌরচন্দ্র হালদার মহাশয়কে মাল্য-চন্দন দান।' অতএব সভাপতিকে গৌর পিওনের কপালে চন্দন মাখিয়ে দিতে হলো (কেমন মজা, বলেন দা ?) এবং মালা পরিয়ে দিতে হলো। সে কি হাততালির বহর চারিদিকে। বেচারী গৌর পিওন বিমূঢ় বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। একে একে বক্তাদের নাম ডাকা হতে লাগলো। আমিই নাম-তালিকায় একের পর এক বক্তার নাম লিখে দিয়েচি। যথা—

১। স্থানীয় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার—গদাধরবাবু।

২। স্কুলের শিক্ষক—মহাদেববাবু।

৩। স্টেশন মাস্টার।

৪। পোস্ট মাস্টার।

৫। আড়তদার নৃপেন সরকার।

৬। কবিরাজ মশাই।

৭। প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিত মশাই।

৮। চামড়ার খটিওয়ালা—রজবালি বিশ্বাস।

৯। বস্ত্র ব্যবসায়ী—রামবিষ্ণু পাল।

১০। আমি।

১১। সভাপতি।

এদের মধ্যে অনেকে সভায় বক্তৃতা কখনও দেয় নি। সভায় দাঁড়িয়ে উঠে, মুখ শুকিয়ে গলা কাঠ হয়ে, চোখে সর্ষের ফুল দেখে বক্তারা আর কিছু বলবার না পেয়ে, গৌর পিওনকে একেবারে আকাশে তুলে দিলে।

না, গদাধর ডাক্তার মন্দ বললেন না। মহাদেববাবু বৃদ্ধ হলেও শিক্ষিত ব্যক্তি, মোটামুটি গুছিয়ে দু-চার কথা যা হোক একরকম হলো। স্টেশন মাস্টার বেচারীর হাত-পা একেবারে কেঁপে অস্থির। পোস্ট মাস্টার খুব ভালো বললেন, তবে অনভ্যাসের দরুণ একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেলো।

বক্তৃতার শেষে তিনি ঝোঁকের মাথায় একেবারে ছুটে এসে—'ভাই রে, গৌর! আজ আর তুমি ছোটো আমি বড়ো নই, আজ তুমি আমার ভাই'—

বলে একেবারে নিবিড় আলিঙ্গনে গৌর পিওনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দস্তুরমতো 'সিন' যাকে বলে। লোকে মজা দেখে খুব হাততালি দিয়ে উঠলো।

তারপরই আড়তদার নৃপেন সরকার, বেচারী অতো হাততালির পরের বক্তা—জীবনে এই সর্বপ্রথম তিনি সভায় দশজনের উৎসুক দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়েচেন। বেচারী প্রথমেই বলে ফেললেন, 'আমরা একজন মহাপুরুষের বিদায় উৎসব সভায় একত্র হয়েচি'। যাকে বলা হচ্চে সে পর্যন্ত অবাক হয়ে গেলো।

কবিরাজ মশাই সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে সভাটাকে কুশণ্ডিকার আসর করে তুললেন। মানুষের মধ্যে ব্রহ্ম বাস করেন, অতএব গৌর পিওন ছোটো কাজ করতো বলে সে ছোট নয়, সেও ব্রহ্ম। উপনিষদের ঋষিদের তপোবনের এই আবহাওয়া বইয়ে দেবার পরে প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিত বেচারী মহা ফাঁপরে পড়লেন, কিন্তু তার চেয়েও ফাঁপরে পড়লো চামড়ার খটিওয়ালা—রজবালি বিশ্বাস।

স্কুলের পণ্ডিত ভালোমানুষ লোক, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের গুণ ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা শেষ করলেন।

নানা কারণে তাঁকে বরেন দাঁর মুখের দিকে চাইতে হয়।

রজবালি বিশ্বাস বললে, 'এ পর্যন্ত তার চিঠিগুলো ঠিকমতো বিলি করেচে গৌর, অমন পিওন আর হয় না'। এইখানেই ইতি।

আর কোনো কথা বের হয় না তার মুখ দিয়ে। ঘেমে উঠলো আর অসহায়-ভাবে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো। পরে হঠাৎ ধপ করে বসে পড়ে বক্তৃতার উপসংহার করলে।

রামবিষ্ণু পাল বৃদ্ধ ব্যবসায়ী, সৎলোক, গৌরকে তিনি বন্ধু বলে সম্বোধন করলেন। বাল্যে গৌর, পাঠশালায় তাঁর সহপাঠী ছিলো, এইটুকু মাত্র বললেন। আমি এক মানপত্র লিখে এনেছিলাম, তাতে গৌর পিওনের সম্বন্ধে ভালো ভালো অনেক কথা বলা ছিলো। মানপত্র পড়ে আমি সেটা গৌরের হাতে দিলাম।

সভাপতি বরেন দাঁ ঘুঘু লোক, সভার গতি কোন্‌দিকে সে অনেকক্ষণ বুঝেচে।

সভাপতির অভিভাষণে সে গৌব পিওনের এমন সব গুণের বর্ণনা করে গেলো, যা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। গৌর পিওন প্রকৃতই দেখলাম লজ্জিত হয়ে উঠেচে, ওর মুখে ওই সব কথা শুনে বিস্মিত সে নিশ্চিতই হতো, কিন্তু তার বিস্ময়বোধের শক্তি আজ সে হারিয়ে ফেলেচে।

গৌর পিওন কিছু বলতে উঠে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে! শুধু সে হাত জোড় করে সভাস্থ সকলের দিকে চেয়ে দু-তিনবার বললে—'বাবুরা—বাবুরা…' তারপর সবাইকে করজোড়ে বারবার প্রণাম করে সে বসে পড়লো।

এবার সভা ভঙ্গ হবে। ছোকরার দল অমনি গেয়ে উঠলো:

'তোমার বিদায়বেলায় মালাখানি আমার গলে'

'—না, রবীন্দ্রনাথের গান চাই।'

বিনয়কে বললাম—'খাইয়েচো?'

চাঁদনীর পাশে হরি ময়রার দোকানে হাত ধরে গৌর পিওনকে নিয়ে যাওয়া হলো।

গেলো সে। সে চলে যাচ্ছিলো বাড়ির দিকে। আমিও গেলাম ওদের পেছনে পেছনে।

তা ছেলেরা আয়োজন করেচে ভালো।

দুটো ফজলি আম, দই, সন্দেশ, নিমকি। বড়ো রাজভোগ যে ক'টা পারে গৌর খেতে। খেয়ে কি খুশি, বেচারী। চোখে তার প্রায় জল এসে গেলো আবার।

আমার দিকে চেয়ে সে বললে—'এমন দিনটা যে হবে, ভাবি নি। সব আপনার কাণ্ড। আমি তা বুঝেচি। কি খাওয়াটাই খাওয়ালেন, কি ভালো কথাই বললেন আমার সম্বন্ধে। বড্ডো গুরুবল আমার।'

বললাম—'খুশি হয়েচো, গৌর?'

'—ওই যে বললাম, বাবাঠাকুর। এমনধারা দিন যে আমার কপালে আসবে তা...'

গৌর পিওনের গলায় এখনো সেই ফুলের মালা।

রোমান্স

সমীরই প্রথম কথাটা তুললে।

তার মত এই যে, রোমান্স প্রেম ওসব নভেলিয়ানা কেবল নভেলেই ঘটে, বাস্তব জীবনে ওদের অস্তিত্ব নেই। তাতে সুধীরও যোগ দিল বলে মনে হলো। ক্রমে ক্রমে বাকি সবাই সমীরের মতে মত দিল। তারপর ক্লাবের বেয়ারা চা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে আমাদের গল্পের ধারা শীঘ্রই এসে টেনিসে পৌছলো অন্য সব দিনের মতো।

ঘরের কোণে ব্রিজ টেবিলের আড়ালে রমেনবাবু এতক্ষণ আলোয়ান মুড়ি দিয়ে আরাম-কেদারায় টান হয়ে শুয়েছিলো। এতক্ষণ পর্যন্ত কোনো তর্কেই তিনি যোগ দেননি, বিশেষ কোনো কথাও বলেননি। চায়ের এক চুমুক খেয়েই একটু তাজা হয়ে নিয়ে বললেন—দেখো তোমরা এতক্ষণ বকে যাচ্ছিলে আমি শুনছিলাম, কথা কইনি বটে কিন্তু যখন কথাটা উঠেছে তখন বলি শোনো। রোমান্স আছে এবং খুবই আছে। জীবনটাই তো একটা প্রচণ্ড রোমান্স হে —সে চোখে দেখে ক'জন—দেখবার চোখই বা আছে কজনের? আচ্ছা, চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে, এসো খেয়ে নেওয়া যাক—শোনো তারপর বলি...

রমেনবাবু আমাদের ক্লাবের নতুন মেম্বর, মাস চারেক হলো যোগ দিয়েছেন। তাঁকে একটু অদ্ভুত ধরনের লোক বলে আমাদের সকলেরই মনে হয়েছে। ব্রিজ, টেনিস, বিলিয়ার্ড, দাবা কোনো খেলাতেই কোনোদিন তিনি যোগ দেন নি। খুব বেশি মেশামেশি বা গল্পও কখনো তাঁকে করতে দেখা যায় না। আপন মনে এসে বসেন, কাগজপত্র পড়েন, সন্ধ্যার আগেই উঠে চলে যান। কিন্তু লোকটির মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যাতে ক্লাবের সকলে তাঁকে খুব পছন্দ করে। তিনি না এলে, কেন তিনি এলেন না সে সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং আর একটা জিনিস, যা আদৌ ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক নয়, সেটা এই যে, তিনি উঠে চলে গেলে তাঁর পেছনে তাঁর সম্বন্ধে মন্দ কথা কেউ কোনোদিন বলত না।

ইতিমধ্যে চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছলো। রমেনবাবু চা পান শেষ করে রুমালে মুখ মুছে গল্প শুরু করলেন—

বছর কয়েক আগে আমি তখন একটা স্বদেশী ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রি ও

প্রচারের কার্যে ঢাকা যাই। সেই প্রথম ও-অঞ্চলে যাওয়া। সময়টা শীতের শেষ হলেও কলকাতার ধারণায় আমি শীতের কাপড় সঙ্গে নিয়ে যাইনি, বলে একদফা পদ্মার ওপর স্টীমারে, তারপর ট্রেনে শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে রাত সাড়ে নটা দশটার সময় গিয়ে ঢাকায় পৌছলাম। আমাদের ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টর ঢাকা শহরের এক ভদ্রলোকের নামে একখানা পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন। তিনি শহরের একজন বড়ো উকিল—নাম এখানে করবার আবশ্যক নেই—তাঁরই বাসায় গিয়ে উঠব এরকম কথা ছিল।

আমি যখন সে বাড়ি গিয়ে পৌছলাম তখন রাত সাড়ে দশটার কম নয়। বেশ জ্যোৎস্না রাত, কম্পাউণ্ডের বাঁ ধারে ছোট্ট ফুলবাগান, জাফরিতে মাধবীলতা এঁকেবেঁকে উঠেছে—আলো আঁধারে পাতার আড়ালে বড়ো বড়ো ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপ ফুটে রয়েছে—এসব গাড়িতে বসেই কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। গাড়ি থামতেই একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান রুটিসেঁকা ফেলে গাড়ির কাছে এসে সেলাম করে দাঁড়াল। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম উকিলবাবু কি কাজে কুমিল্লাতে গেছেন, আজ তিন-চার দিন বাড়ি ছাড়া, কবে আসবেন তার ঠিক নেই। কোচম্যানকে গাড়ি ফেরাতে বলেছি—ডাক বাংলোতেই অগত্যা উঠব—একটি ছেলে বাড়ির মধ্যে থেকে বার হয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে সেই দারোয়ানটি এল—সে যে ইতিমধ্যে কখন বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল আমি লক্ষ্য করিনি। ছেলেটি বললে, 'বাবা কাল সকালেই আসবেন, আপনি যাবেন না, শুনলে বাবা দুঃখ করবেন। রামদীন, বাবুর জিনিসপত্র নামিয়ে নাও!'

সুতরাং রয়ে গেলাম। আহার ও শয়নের ব্যবস্থা সুন্দর হলো, সারাদিনের পরিশ্রমে শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে উঠে বাইরের বারান্দাতে বসে কাগজ পড়ছি, গৃহস্বামীর গাড়ি সদর গেট দিয়ে কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকলো। আজ সকালের ট্রেনেই উকিলবাবুর আসবার কথা ছিল—তাই তাঁর গাড়ি স্টেশনে গিয়েছিল তাঁকে আনতে। গৃহস্বামী গাড়ী থেকে নেমে আমায় দেখে আমার পরিচয় জেনে খুব খুশি হলেন। নানাভাবে আপ্যায়িত করলেন, রাত্রে কোনো কষ্ট হয়েছে কিনা সেকথা অন্ততঃ দশবার এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন যে, মনে হলো রাত্রে কষ্ট হয়নি বললে তাঁকে হতাশ করা হবে। একদিনের মধ্যে আমি যেন বাড়ির লোক হয়ে পড়লাম সে বাড়িতে। রাত্রে আমার আহারের স্থান হল বাড়ির মধ্যে দাওয়ায়। পরদিন সকালে আমার বাইরের ঘরে একটি বারো-তেরো

বছরের সুন্দরী মেয়ে চা ও খাবার নিয়ে এল। বেশ ডাগর ডাগর চোখ, কালো চুলের রাশ পিঠের ওপর পড়েছে, মুখ দেখে বুদ্ধিমতী মনে হয়। চা ও খাবারের পাত্রটা টেবিলের ওপর রেখে সে চলে যাচ্ছিল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি বুঝি খুকী এ-বাড়িরই? নাম কি তোমার?

—বীণা, সে হেসে বলল। তারপরই চলে গেল।

পরের দিন সকালে সেই মেয়েটিই আবার চা নিয়ে এল। এ-দিন সে অত শীঘ্র চলে গেল না।—তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি বুঝি স্কুলে পড়ো—না?

সে বললে—আমি মিডফোর্ড গার্লস্ স্কুলে পড়ি।

—কোন্ ক্লাসে পড়ো?

—এবারে ফোর্থ ক্লাসে উঠেছি এই জানুয়ারি মাসে…

—কি কি বই পড়ো?

কিছুক্ষণ ধরে আমাদের কথাবার্তার ধারা ওই পথ ধরেই বেয়ে চললো।

বিকালে সে আপনিই আবার এল। আমার ঘরের চোয়ারটার হাতলের ওপরে বসলো। বললে—আপনি বুঝি বই লেখেন?

—কি করে জানলে বলো দেখি?

—আপনার নাম দেখেছি, আমাদের বাড়িতে মাসিকপত্র আসে, তাতে আছে…

—কই, কোন্ মাসিকপত্র আনো তো দেখি।

বীণা দু-তিনখানা মাসিকপত্র নিয়ে এল।

একখানাতে আমার "বিদেশী ব্যাঙ্ক ও আমাদের কর্তব্য" বলে একটা অর্থ-নৈতিক প্রবন্ধ বার হয়েছিল বটে, সেইটা বীণা খানিকক্ষণ ধরে পড়লো। তারপর সেটা মুড়ে রেখে এ-গল্প ও-গল্প করতে লাগলো। আমি তাকে মুখে মুখে ট্রানস্লেসান্ জিজ্ঞাসা করলাম—সবগুলোর উত্তর দিলে। ঢাকা মিউজিয়াম দেখতে যাবার ইচ্ছা ছিল। বিকালটায় কিন্তু বীণা অনেকক্ষণ ধরে ঘরে বসে রইলো—মিউজিয়াম দেখতে না যাওয়া হলেও কোনো ক্ষতি অনুভব করলাম না।

শেষরাতে কি জন্যে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, কানে গেল বাড়ির মধ্যে মেয়েলী গলায় কে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ইউক্লিডের জিয়োমেট্রি পড়ছে—Two tangents can be drawn to a circle from an external point and they are equal and also subtend—, ভারী আশ্চর্য লাগলো। বীণা নিশ্চয়ই

নয়—কারণ ফোর্থ ক্লাসে জিয়োমেট্রির ট্যান্‌জেণ্ট কোনো স্কুলেই পড়ানো হয় না—তা ছাড়া সেটা বীণার গলাও নয়। ঘড়িতে দেখলাম রাত চারটা বেজেছে। মনে মনে ইউক্লিডের অপূর্ব প্রভাবকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারলাম না। এই শীতের রাত্রে চারটের সময় কার জ্ঞান-পিপাসা এত প্রবল হয়ে উঠেছে জানবার ভারী ইচ্ছে হল।

সকালে বীণা চা নিয়ে আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম—বীণা শেষরাত্রে কে জিয়োমেট্রি পড়ছিল বাড়ির মধ্যে—তুমি?

বীণা হেসে বললে—আমি না, ও দিদি—এইবার ম্যাট্রিক দেবে। এই সামনের বুধবার থেকে একজামিন বসবে কিনা?

আমি বললাম—কই, তোমার দিদি ম্যাট্রিক দিচ্ছেন সে-কথা তো শুনিনি? স্কুলের গাড়িতে তো তুমিই একলা যাও দেখেছি···

বীণা হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। বললে—বারে, বেশ লোক তো আপনি। দিদি তো অ্যালাউ হয়ে বাড়ি বসে পড়ছে—ও বুঝি আমার সঙ্গে রোজ রোজ স্কুলের গাড়িতে পড়তে যাবে?

কথাটা বীণা ঠিকই বলেছে, তার হাসিটা নিতান্ত অসঙ্গত নয় বটে।

সেদিন বিকালে স্কুলের গাড়িটা যখন এসে লাগলো তখন আমি রোয়াকে পায়চারি করছিলাম। বীণাকে নামতে দেখলাম না কিন্তু আর একটি মেয়ে নামলো। বয়স পনেরো-ষোলো হবে, অপূর্ব সুন্দরী, লাল পাড় সিল্কের জ্যাকেটের বাইরে নিটোল শুভ্র বাহুদুটি যেন হাতীর দাঁতে কুঁদে তৈরি। একবার আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখে শান্ত গতিতে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো।

সন্ধ্যার একটু আগে বীণা এসে বললে—চা এখন আনবো, না বেড়িয়ে এসে খাবেন···পরে একটু থেমে বললে—দিদিকে আজ দেখেছেন, না?

আমি তখনও ঠিক করতে পারিনি যে, স্কুলের গাড়িতে সেই মেয়েটিই বীণার দিদি। পূর্বেই বলেছি বীণা ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে আমার মুখ দেখেই ব্যাপার বুঝে নিয়ে বললে—আজ বিকেলে স্কুলের গাড়ি থেকে যে নামলো তখন—ঐতো দিদি—আমি তো আজ স্কুলে যাইনি। দিদি রিসিট আনতে স্কুলে গেছলো যে ও-বেলা···

পরে সে বললে—দিদিই আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, বাইরের ঘরে ও ভদ্রলোকটি কে রে?

মনে মনে অভিমানে বড়ো ঘা লাগলো, বড়ো-মানুষের মেয়ে বটে, সুন্দরীও বটে, কিন্তু আজ ছ-সাতদিন যে আমি তাঁর বাপের বৈঠকখানার একখানা চেয়ার টেবিলের মতো বাইরের ঘরের এক কোণে পড়ে আছি, এতোদিনের মধ্যে এ হতভাগ্যের সম্বন্ধে সে সংবাদটুকু কি তাঁর কর্ণগোচর হয়নি ?

দিন দুই কেটে গেল। এ কয়দিনে আমি নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে যথেষ্ট ঘোরাঘুরি করলাম, তাতে ঠিক সময়ে স্নানাহার হয়ে উঠতো না কোনোদিনও। সুতরাং বীণার সঙ্গে দেখা হবার সময় হতো না। তৃতীয় দিন সকালে বার হয়ে সন্ধ্যার কিছু আগে ফিরে এলাম। বারান্দাটাতে বসে একটু বিশ্রাম করছি, অপ্রত্যাশিতভাবে বীণা ঘরে ঢুকে হাসি-মুখে বললে—ঠাকুর দু-বার তারপর আমি দু-বার আপনাকে ডাকতে এসে ফিরে গিয়েছি—আপনার খিদে-তেষ্টা কিছুই পায় না, কোথায় ছিলেন সারা দিনটা ?

আমি কৈফিয়ৎ দেবার আগেই সে আবার বলে উঠলো—মুখ হাত ধুয়ে ফেলুন, আপনার চা নিয়ে আসি—বাবা এখনও কাছারী থেকে ফেরেননি, গরম জল চড়ানোই আছে···

অল্প পরেই সে চা নিয়ে এসে অভ্যস্তভাবে সামনের চেয়ারের হাতলটার ওপর বসে অনর্গল বকে যেতে লাগল—সব কথার উত্তর পাবারও প্রত্যাশা সে রাখে না। আপনা আপনিই বেশ বলে যেতে পারে। বললে—ভারী মজা হয়েছে, আমি আপনার একটা লেখা দিদিকে দেখিয়ে বললুম—পড়ে দেখো তো। দিদি পড়তে গিয়ে বুঝতে পারে না—দাঁড়ান সেখানা আনি ·

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে বাড়ির মধ্যে চলে গেল, কিন্তু সেদিন আর সে বাইরের ঘরে দেখা দিলে না। বীণার খামখেয়ালি ধরন আমার জানা ছিল কাজেই এতে আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য হলাম না। পরদিন সকালে সে এল—হাতে একখানা 'বঙ্গ-বন্ধু'। আমায় দেখিয়ে বললে—এই নিন, দিন দিকি বুঝিয়ে ? লাল পেন্সিলে দিদি দাগ দিয়েছে জায়গাগুলো। সেই মাসের 'বঙ্গ-বন্ধু'-তে আমার 'যৌথ-ব্যাঙ্ক ও মধ্যবিত্তের কর্তব্য' প্রবন্ধটা বেরিয়েছিল। হাতে নিয়ে মনে মনে ভাবলাম, যদি ম্যাট্রিক ক্লাসের একটি মেয়েকেও তাক্ লাগিয়ে না দিতে পারলাম তবে অনবরত দিন পনেরো ধরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি যাতায়াত এবং নানান্ Year-Pook নাড়া-চাড়া করবার সার্থকতা আর কি হলো ?

বীণা বিকেল বেলা একখানি খাতা হাতে নিয়ে এসে বললে—চা-টা খেয়ে

নিন—নিয়ে দিদির এই ট্রানশ্লেসানটা হয়েছে কিনা দেখে দিন তো। দিদি বললে আপনাকে দেখাতে···

সেটা হাতে নিয়ে দেখলাম—বেশ গোটা গোটা মুক্তোর ছাঁদের লেখাটা বটে কিন্তু ট্রানশ্লেসানটা বিশেষ উঁচুদরের নয়। কাজেই যখন বীণা বললে—ধরুন কুড়ি নম্বর আছে, কত নম্বর দেবেন আপনি? তখন একটু আম্‌তা আম্‌তা করে বললাম—নম্বর? তা এই ধরো, অবিশ্যি বাংলাটা খুব শক্ত, তা ধরো এই চার কি পাঁচ দিতে পারি

—মোটে? তবেই হয়েছে, দিদি তাহলে এবার ইংরাজিতে ফেল, ফেলতুঃ, ফেলুং—কথাটা শেষ করেই সে মুখে হাতখানা চাপা দিয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো। আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম—না না ফেল কেন হবেন—আর একটা সোজা দেখে করলেই—এটা বেজায় শক্ত কিনা?

বিকেলে এসে বীণা বললে—দিদি বলে দিলে আপনাকে রোজ রোজ তার ট্রানশ্লেসান্ দেখে দিতে হবে—পারবেন তো?

হ্যাঁ—খুব—নিয়ে এসো না কাল থেকে। কেন দেখে দেব না?

সেদিন থেকে আমার কাজ হলো রোজ রোজ এক রাস করে ইংরাজি ও বানানের ভুল সংশোধন করা। বেশ হাতের লেখাটি কিন্তু—খাতায় শেষে গোটা গোটা ছাঁদে আমার নেপথ্যপথবর্তিনী ছাত্রীটির নাম লেখা থাকে—প্রতিমা দেবী।

কয়েক দিন খুব গুমোটের পর বৈকালের দিকে সেদিন খুব বৃষ্টি হলো। উকিল-বাবুর বাড়ির সামনে একটা বড়ো বটগাছে নতুন পাতা গজিয়েছে, বারান্দাটাতে বসে সেদিকে চেয়ে আমি আমার দেশের বাড়ির কথা ভাবছিলাম—কতদিন যাইনি, কাজের খাতিরে বিদেশে বিদেশে বেড়াতে হয়। তবুও যখন নববর্ষা নামে, বৃষ্টি-সজল বাতাসে এখান থেকে তিনশো মাইল দূরের সে গ্রামখানির ভিজে মাটির গন্ধ যেন ভাসিয়ে আনে মনে হয় আমার ছোট ভাই অন্তু হয়তো এতক্ষণ আমাদের উঠোনের বৃষ্টির জলে কাগজের নৌকো ভাসিয়ে খেলা করছে...গোঁসাই কাকাদের বৈঠকখানাতে এতক্ষণ তাসের খুব মজলিশ বসেছে...তখন মন বড়ো খারাপ হয়ে যায়, ইচ্ছা হয় চাকুরি-বাকুরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি গিয়ে উঠি।

উকিলবাবু কয়েক দিন রক্তাধিক্যের অসুখ হওয়ায় বাড়ির মধ্যেই ছিলেন, কাছারীও যাননি। তিনি ঝড়-বৃষ্টি থামবার পরে বারান্দাতে এসে আমার পাশে একটা আরাম কেদারায় বসে নানা গল্প করতে লাগলেন। বেশ অমায়িক স্বভাবের ভদ্রলোকটি। বললেন—ক-দিন আপনার খোঁজ-খবর করতে পারিনি,

কোনো অসুবিধে হয়নি আপনার ? হ্যাঁ দেখুন, বীণা বলছিল আপনি প্রতিমার ট্রানশ্লেসান্ রোজ দেখে দেন—কি রকম বুঝছেন, পাস-টাস করবে ? ইংরিজিটা তেমন জানে না, যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনাকে একটু অনুরোধ করি—মেয়েটিকে একটু করে দেখবেন আপনার সময়মতো ? শুধু ইংরিজিটা দেখে দিলেই—ওর মাস্টার ছিল, হঠাৎ মা মারা যাওয়াতে বেচারী জানুআরি মাসে বাড়ি চলে গেল আর এল না—অবিশ্যি যদি আপনার......

বলা বাহুল্য আমাকে এ-বিষয়ে রাজী করাতে তাঁর যতটা বাক্য ব্যয় করার প্রয়োজন ছিল, তিনি তার চেয়ে যেন একটু বেশিই করলেন।

তারপর দিন-দুই কেটে গেল। প্রতিমা রোজ বিকেলে নয় দুপুরে খাতা নিয়ে এসে বসে, সঙ্গে থাকে বীণা, কোনো কোনো দিন সেও থাকে না। ধরনটি ওর ভারী মিষ্টি অথচ ওর মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য আছে যে অবাধ পরিচয়ের পথে একটা সহজ ব্যবধানের সৃষ্টি করে।

সেদিন প্রতিমা এসে সামনের চেয়ারখানাতে বসলো। ট্রানশ্লেসান্ দেখার পরে সে মুখ নিচু করে হেসে বললে—এ আমি পারবো না—এটা বদলে দিন··

আমি বললাম—এমন আর শক্ত কি, করে দেখবে এখন সোজা...

সে পুনবায় ঠিক সেই ভাবে হেসে বললে—না আমি পারবো না, আপনি বদলে দিন

যে স্বরে সে কথাটা বললে, সেটা অতি শান্ত মৃদু হলেও মনে হল এরপর আর তর্ক চলে না। বদলে দিলাম বটে কিন্তু ভাবলাম মেয়েটি একটু একরোখা ধরনের।

পড়াশুনা শেষ করেই প্রতিমা খাতাপত্র উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। একটু পরে বিকেলের দিকে আবার খুব ঝড়-বৃষ্টি নামলো—এ অবস্থায় বাইরে বেড়াতে যাওয়া উচিত হবে না বুঝে চুপ করে বারান্দায় আরাম কেদারাতে বসে আছি—পেছনে দোর খোলার শব্দ হলো।

চেয়ে দেখি আগে আগে বীণা, পেছনে প্রতিমা ঘরে ঢুকছে। প্রতিমার আগমন অনেকটা অপ্রত্যাশিত—কারণ এক পড়াশোনার সময়টি ছাড়া প্রতিমা অন্য কোনো সময়ে আমার এখানে আসেনি কখনো।

বীণা ঘরে ঢুকেই বললে—কেমন বৃষ্টি নেমেছে মাস্টারমশায় ?

—এসো এসো, ভিজতে ভিজতে এলে যে ?

—দিদি বললে আপনি একলাটি বসে আছেন তাই চল্ গিয়ে গল্প ··

প্রতিমা তার দিকে ভ্রুকুটি করে বললে—আমি ?

পূর্বেও কথাটা মনে হয়েছে এখনও মনে হলো, প্রতিমা যে সুন্দরী তার ব্লাউজের হাতার লাল সিল্কের পাড়ের সঙ্গে সুন্দর খাপ খাওয়া শুভ্র বাহু দুটির নিটোল গঠনের দিকে চেয়ে একথা মনে মনে অস্বীকার করতে পারলাম না। কিন্তু সকলের চেয়ে অদ্ভুত তার দুটি চোখ ও ভুরু দুটির একটা বিশেষ ভঙ্গি। সেটা কি তা ঠিক মুখে বোঝানো যায় না অথচ যে ধরনের সৌন্দর্য মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত অভাবের বেদনা সৃষ্টি করে ওর মুখের সৌন্দর্যটা ঠিক সেই ধরনের।

প্রতিমা বললে একলা বসে থাকতে আপনার খুব ভালো লাগে, না ? বসে বসে লেখেন বুঝি। উঃ, কী শক্ত লেখাই লিখেছেন—আচ্ছা অত পার্সেণ্টেজ, গ্রাফ, সেন্সাস রিপোর্ট কোথায় পেলেন—সব বুঝি আপনার মুখস্থ ?

মুখস্থ কি আর থাকে ! ও-সব লাইব্রেরীতে গিয়ে বই দেখে লেখা—অত মুখস্থ থাকলে একটা সচল Year-Book হয়ে উঠবো যে...

—আচ্ছা আপনার দেশ কোথায় ?

—অনেক দূর, বর্ধমান জেলায়। তোমার জিয়োগ্রাফি আছে ম্যাট্রিকে ?

প্রতিমা মৃদু হেসে বললে—জিয়োগ্রাফি না থাকলেও বর্ধমান জেলা জানি...

বীণা বললে—আমাদের ক্লাসের জিয়োগ্রাফিতে বর্ধমান জেলার কথা আছে। আচ্ছা, আপনাদের দেশে খুব ধান হয় আর খুব কয়লার খনি আছে, না ?

—কয়লার খনি নেই এমন নয়, তবে একটু পশ্চিমে ঘেঁষে...

প্রতিমা বললে—কয়লার খনি দেখেছেন আপনি ? আচ্ছা, ও কি করে হয় ?

কয়লার খনির উৎপত্তির কথা এসে পড়াতে স্বভাবতই অনেক কথা মনে পড়লো। পৃথিবীর আদিম জন্মকথা, নেবুলা, স্তর বিভাগ, বিভিন্ন যুগ বিভাগ, সূর্য ও প্রাণীর জন্মের ইতিহাস, জীবাশ্ম ও অধুনালুপ্ত অতিকায় জীবদিগের বিবরণ ইত্যাদি। একদিকে প্রতিমার সৌন্দর্য, অন্যদিকে এ-সব মহিমাময় বৈজ্ঞানিক রোমান্স, যেন একদিকে শাশ্বতী নারীর কমনীয়তা, অন্যদিকে পুরুষের বিশাল প্রসারতা ও উদার কল্পনার প্রতীক।

প্রতিমা খুব মন দিয়ে শুনছিল এবং মাঝে মাঝে এ-প্রশ্ন ও-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল। শেষ হয়ে গেলে বললে—আমি এ-সব কথা শুনিনি তো কোনোদিন—স্কুলে কেউ তো বলে না।

ওরা চলে গেল। বাইরে গিয়েই প্রতিমা বীণার দিকে চেয়ে নিচু গলায়

শাসনের সুরে বলছে, কানে গেল—ও-রকম মাস্টারমশাই মাস্টারমশাই বলছিলি কেন বীণা? ভারী খারাপ শোনাচ্ছিল কানে—উনি কি আমাদের মাইনে নিয়ে পড়ান?

কয়েক দিন পরে হঠাৎ কলকাতায় ফেরবার জরুরী তার পেলাম আপিস থেকে। পরদিন সকালে বিছানাপত্র বাঁধাছাদা চলছে, বীণা এসে বললে—আপনার আজ যাওয়া হবে না। বেশ তো আপনি, ভরা অমাবস্যা মাথায় বুঝি বাড়ি থেকে বেরুতে আছে? দিদি বলে দিলে মাস্টার—এই রমেনবাবুকে বারণ করে আয়, কাল যাবেন এখন। খুলুন বিছানা—ধরবো?

সেদিন অমাবস্যা কাটবার কথা ছিল না, সুতরাং বিছানাপত্র আবার খুলতে হল।

পরদিন সকালে এক কাণ্ড ঘটলো, দশটার গাড়িতে আমি চলে যাবো, উকিলবাবুও আমার সঙ্গে যাবেন তাঁর কি কাজে ফরিদপুরে। নারায়ণগঞ্জ থেকে এক স্টীমারেই আমরা যাবো। সকালে দুজনে একসঙ্গে মাঝের বারান্দাতে খেতে বসেছি, হঠাৎ উকিলবাবু প্রতিমার ওপর রেগে উঠলেন। আজকের রান্নাবান্নার ভার তারই ওপর বুঝি উকিলবাবু দিয়েছিলেন। সে একটু বেশায় আরম্ভ করিয়েছে ঠাকুরকে দিয়ে, এই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে—বিশেষ করে আমি সেখানে একজন বাইরের লোক—আমার সামনে মেয়েকে এমন কড়া ও অপ্রীতিকর কথাবার্তা বললেন, যাতে করে আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করলাম। আমার দিকে চেয়ে চেয়ে তিনি বলতে লাগলেন—দেখলেন রমেনবাবু, আজকালকার মেয়েদের—আমি ওকে কাল রাত থেকে বলছি, সকালে আমরা যাবো সব যেন ঠিক থাকে—দেখেছেন তো একবার কাণ্ডখানা? বলি এটা কি ঝোল না কি ছাই এটা? এর নাম ঝোল? না আমি সত্যি বলছি রমেনবাবু, আমি আজকালকার এসব বিবি সাজা পছন্দ করিনে একেবারেই। যা হয়েছে, পড়াশুনোর আর দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে

আমার সামনে এসব কথা হওয়াতে হয়তো নেপথ্যবর্তিনী প্রতিমা লজ্জায় অপমানে ভেঙে পড়তে চাইছিল। কেননা আমি সম্পূর্ণ বাইরের লোক। তিরস্কারের পর সে আর আমাদের সামনে পরিবেশন করতে এলো না। অত্যন্ত ভারী মন নিয়ে নিজের ঘরটিতে ফিরে এলাম।

একটু পরেই বীণা চায়ের কাপে এক কাপ দুধ নিয়ে এসে বললে, দুধ-মিছরি খেয়ে নিন…

—দুধ-মিছরি কেন বলো দেখি ?

—আমাদের বাড়িতে নিয়ম আছে, বাড়ি ছেড়ে কেউ কোথাও যাবার সময়ে তাকে দুধ-মিছরি খেতে দিতে হয়। ওপরের ঘরে বাবাকে দিয়ে এলাম। দিদি বলে দিলে রমেনবাবুকেও দিয়ে আয় বাইরের ঘরে ·

গত তিন দিন প্রতিমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আজ এইমাত্র এই যা খাবার সময়ে দেখা হয়েছিল, তাও অতি অল্পক্ষণের জন্যে। যাবার সময়েও দেখা হলো না—শুধু বীণা বিছানাপত্র গাড়িতে ওঠাবার সময়ে আমার কাছে ছিল। মনে কয়েক দিন ধরে একটা সন্দেহ হয়েছিল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম—বীণা, আচ্ছা একটা কথা বলি, তোমার মাকে তো দেখতে পাইনি কোনদিন। তিনি ··

—আমার মা একমাস হলো মামার বাড়ি গিয়েছেন ছোট-মামার বিয়েতে—এই বুধবারে আসবেন। আর দিদির মা নেই, দিদির ছেলেবেলাতেই

—প্রতিমা তোমার আপন বোন না ?

বীণা ঘাড় নেড়ে হেসে বললে—ওমা রে, এ্যাদ্দিন আছেন তাও জানেন না বুঝি ? আপনার মন থাকে কোথায় ? একদিন তো আপনার সামনে এ-কথা হয়ে গিয়েছে না ?

কবে পূর্বে এ-কথা উত্থাপিত হয়েছিল, মনে না হলেও এতদিনের একটা খটকা আমার কাছে আজ পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই বীণা ও প্রতিমার মুখের গড়নে একখানি তফাৎ। কথাটা অনেকবার মনে হলেও ঠিক কিছু ধারণা করতে পারিনি এতদিন। অন্যমনস্কভাবে উকিলবাবুর সঙ্গে তাঁর গাড়িতে উঠে বসলাম।

আজ কয়দিনের তো জানাশোনা—কিন্তু চলে যাবার সময়ে মনে হতে লাগল, প্রথম এসে এই অপরিচিত লোহার গেটের মধ্যে যখন আমার ঠিকেগাড়ি ঢুকেছিল, সেদিন আজ অনেক দূর পেছনে পড়ে গিয়েছে—আজ এই বাড়ির প্রতি জিনিসটা—ঐ পাতাবাহারের গাছটা, বাইরের উঠোনের ঐ পুরানো ইঁদারাটা, সব যেন হঠাৎ বড়ো প্রিয় হয়ে উঠেছে—যেন নীড়হারা বিহঙ্গ নিঃসীম শূন্যে মুক্তপক্ষে উড়তে উড়তে কোথায় নীড়ের সন্ধান পেয়েছিল, যে নীড়ে তার কোনো দাবি-দাওয়া নেই, শুধু মনের মধ্যেকার একটা অনির্দিষ্ট নির্ভরতার ভাবে সেই মিথ্যা অধিকারের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিত মাত্র। তাই আজ ছেড়ে যাবার বাস্তবতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে তার নিজের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে সে অধিকারের বার্তাটা কতটা অসঙ্গত ও ভিত্তিশূন্য।

দেশে ফিরে অল্প কিছুদিন বাড়ি থাকবার পরেই কয়েক মাস একরকম কেটে গেল। পূজার পরে কার্তিক মাসের প্রথমে হঠাৎ আপিসের হুকুম হলো আবার ঢাকা যাবার।

এবার যখন গোয়ালন্দ থেকে স্টীমারে উঠলাম তখন আগেকার মতো ভিড় ছিল না। পদ্মাবক্ষ শান্ত স্থির—চরে চরে কাশের বন ঘন সবুজ, আকাশের রঙ তিসির ফুলের মতো নীল। নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত ভারী আরামে কাটলো।

ঢাকায় নেমে বীণাদের ওখানে না গিয়ে ডাক বাংলোয় উঠলাম। নানা কারণে এবার বীণাদের বাড়ি উঠতে পারা গেল না। বারবার অনাহূত-ভাবে তাদের ওখানে গিয়ে উঠলে তারাই বা কি মনে করবে? হয়তো এবার আমার সেখানে যাওয়াটা তারা পছন্দ নাও করতে পারে। তার চেয়ে বরং নিজের কাজকর্ম সেরে এমনি একদিন তাদের বাড়িতে গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখাশুনো করে আসা যাবে এখন।

আবার জ্যোৎস্নাপক্ষ ঘুরে এল। ডাক বাংলোর কম্পাউণ্ডের হাস্না ঝোপের মিঠে মৃদু সৌরভ-ভরা ঝিরঝিরে বাতাসে বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কথাই মনে ওঠে। একবার মনে হচ্ছিল, এই অপরিচিত ঢাকা শহরটিতে এমন কেউ আমার আপনার জন আছে যে, যদি সে জানে আমি ঢাকাতে এসেছি এবং লক্ষ্মীছাড়ার মতো ডাক বাংলোয় উঠে দাড়িওয়ালা বাবুর্চির শিরানহল হস্তের ডালভাত ও কুরুয়া আহার করছি তো মনে মনে ভারী দুঃখিত হবে। কারণ আমি জানি আমার আহারের কিছুমাত্র অনিয়ম হলে তার সহ্য হয় নি, নানা অনুযোগ করে ঠিক সময়ে খেতে বাধ্য করেছে, কিসে আমার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে তার জন্যে অলক্ষ্যে কত চেষ্টা ছিল তার। কিন্তু একবার মনে হচ্ছিল, এসব চিন্তার সার্থকতা কি? অতিথির প্রতি সৌজন্যকে অন্য কিছু বলে মনে করবার অধিকারই বা আমায় কে দিয়েছে?

দিন পনেরো ঢাকায় কেটে গেলেও বীণাদের বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত মাড়ালাম না ইচ্ছে করেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুধু 'ভারতমাতা ব্যাঙ্কের' শেয়ার বিক্রি এবং কালু-ঝমঝম তোপের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করে সময় কাটানো অসম্ভব ও একঘেয়ে হয়ে উঠল। একদিন বিকেলের দিকে ওদের বাড়িতে ছড়ি হাতে নিশ্চিন্ত মনে বেড়াতে গেলাম —যেন এই পথ দিয়েই অন্য কাজের খাতিরে যেতে যেতে একবার দেখতে আসা গেল কে কেমন আছে। গেটের মধ্যে ঢুকে চোখে পড়ল বাড়ির ওপরের ঘরের

সব জানালা বন্ধ। উকিলবাবুর আপিসঘরের সামনে রামধনিয়া বেয়ারাও টুলের ওপর বসে নেই, বাইরে কোথাও একটা···কি করা যায় বা কাকে ডাকব ভাবছি এমন সময়ে উকিলবাবুর পুরানো খানসামা ছকু বাজার থেকে কি কিনে নিয়ে গেট দিয়ে বাড়ি ঢুকেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

—বাবু আপনি?

—হ্যাঁ, এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই। বাবু কোথায়?

—আপনি শোনেননি, জানেন না কিছু?

পরে সে একে একে যা বলে গেল তা সংক্ষেপে এই যে, গত ভাদ্র মাসে উকিলবাবু রক্তাধিক্য রোগে হঠাৎ হার্টফেল করে মরে যান। তার ওপর আরও বিপদ—বড়ো দিদিমণি পরীক্ষায় ফেল হন এবং তারপরই তাঁর মাথা খারাপ মতো হয়ে গিয়েছে—তিনি আছেন তাঁর মামার বাড়ি। বীণাকে নিয়ে তার মা নিজের বাপের বাড়ি চলে গিয়েছেন এবং সেইখানেই আছেন। বর্তমানে এ-বাড়িতে রঘু মিশির দরোয়ান আর সে ছাড়া আর কেউ থাকে না, অন্য চাকর-বাকরের জবাব হয়ে গিয়েছে।

ডাক বাংলোয় ফিরে সেদিন কোনো কাজে মন গেল না। প্রতিমার কথা ভেবে আমার মন করুণায় পূর্ণ হয়ে গেল। ডাক বাংলোর নির্জন বারান্দার অন্ধকারটাও যেন অশ্রুসজল হয়ে উঠল ওর নানা ছোটখাট কথাবার্তার স্মৃতিতে।

পরদিন সকালে আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রির কাজটা যে পরিমাণে হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। সকাল-সন্ধ্যায় সব সময় মহা উৎসাহে ঘুরে ঘুরে আপিসের কাজ করে বেড়াই আর কলকাতার আপিসে বড়ো বড়ো রিপোর্ট পাঠাই।

দিন পাঁচেক পরে সেদিন সকালে স্নান করে বসে কাগজ পড়ছি এমন সময় ডাক বাংলোর বেয়ারা বললে, 'আপ্‌কো পাশ এক আদমি আনে মাংতা হায়।'

একটু পরেই দেখি উকিলবাবুর বাসার ছকু খানসামা বেয়ারার সঙ্গে ঘরে ঢুকছে। আমি আগ্রহের সুরে বললাম, কি মনে করে?

ছকু বললে—পরশু ছোটদিদিমণি বাড়ী এসেছেন মার সঙ্গে। আপনি সেদিন বাসায় গিয়েছিলেন শুনে আমায় বলে দিলেন, ডাক বাংলোয় গিয়ে দেখে আয় তিনি আছেন কি না, থাকলে আমাদের বাড়ি অবশ্যি করে একবার আসতে বলে আয় আমার নাম করে। আজই বিকেলে যেতে বলে দিয়েছেন।

আমি তাকে বলে দিলাম, আপিসের কাজ সেরে বিকেলের দিকে আমি নিশ্চয়ই যাবো।

বিকেলে যখন বীণাদের বাড়ি গেলাম তখন সন্ধ্যা হবার খুব বেশি দেরি ছিল না। রাস্তার ধারে ধারে আলো দিয়েছে, মোড়ে মোড়ে ফিরিওয়ালা 'চাই গরম গরম বাখরখানি' বলে হেঁকে যাচ্ছে। ওদের বাড়ি পৌঁছে বাড়ির মধ্যে খবর পাঠালাম। একটু পরে বীণা এসে পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার শরীর ভালো আছে?

—একরকম মন্দ নয়। তোমার—তোমাদের সব?

বীণার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়ল। কথাটা জিজ্ঞাসা না করাই বোধহয় ভালো ছিল। সান্ত্বনাসূচক গোটাকতক মামুলী কথা বলে আনাড়ির মতো বসে রইলাম। কিন্তু ঐ জন্যেই আমি বীণাকে ভারী পছন্দ করি—এত অল্পক্ষণের মধ্যে সে নিজের দুর্বলতাটুকু সামলে নিলে যে তাকে আমি মনে মনে সাধারণ মেয়ের চেয়ে উচ্চ আসনে স্থান না দিয়ে পারলাম না।

চোখ মুছে নিয়ে বললে—আপনি এসে উঠেছেন কোথায়? ডাক বাংলোয়? আচ্ছা এইবার তো আমরা এসেছি, জিনিসপত্র নিয়ে এখানে চলে আসুন কাল সকালেই।

বীণা কথাটা এমন হুকুমের সুরে বললে যে হঠাৎ তার প্রতিবাদ করা সম্ভবপর নয়। অন্য কথা তুলে সেটা চাপা দেবার পরে নানা অনাবশ্যকীয় কথা তুললাম, যেন প্রধানতঃ সেইগুলো জানবার আগ্রহেই আমি এতটা পথ হেঁটে এসেছি। শেষে বললাম—প্রতিমা কোথায়? এ প্রশ্নটা অনেকবার মুখে এলেও এতক্ষণের মধ্যে কি জানি কেন একবারও মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারি নি।

বীণা বললে, দিদি এখনও সারে নি। বড়ো-মামাবাবু সঙ্গে করে তাকে চুনার নিয়ে গেছেন, সেইখানেই আছে। কেবল আপন মনে বসে বসে কি ভাবে, এছাড়া তার আর কোনো খারাপ লক্ষণ নেই। কিছু খায় না দায় না, শুতেও চায় না, বেড়াতে যেতেও চায় না, কেবল রাতদিন বসে বসে ভাবছে—ঐ তার রোগ ·····

—পরীক্ষায় পাস না করেই বোধহয় এমন হয়ে··

বীণা বললে, শুধু পরীক্ষায় পাস নয়, সে অনেক কথা। আপনাকে বলতে আর কি আপনি ঘরের লোক। দিদি পরীক্ষা দেওয়ার পর বাবা এক সম্বন্ধ

ঠিক করলেন। চাটগাঁয়ের উকিল, হাতে পয়সা আছে, কিন্তু তেজ পক্ষের বর, বয়স চল্লিশেরও ওপর। দিদি সব শুনেছিল, কিন্তু কিছু বলেনি। মা কত বোঝালেন কিন্তু বাবার ইদানীং কেমন হয়েছিল জানিনে, দিদিকে একেবারে যেন বিষ নজরে দেখতেন। দিদি শেষে রাগে পড়ে খবরের কাগজ দেখে কোথাকার স্কুলে মাস্টারির দরখাস্ত করে, চাকরিও পায়—কিন্তু বাবার হাতে তাঁদের চিঠি এসে পড়ে। তারপর সে কী অপমান আর কী কাণ্ড! তারপরই পরীক্ষায় ফেল হল, সে আবার এক কাণ্ড। বাবা হঠাৎ মারা না গেলে ও বিয়ে ঠিক হত। এইসব গোলমালে দিদি যেন কেমন হয়ে গেল। চিরকাল সে ভারী অভিমানী। দিদির কোন দোষ ছিল না, সে যে মাস্টারির দরখাস্ত করেছিল সে শুধু অপমানের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে আর থাকতে না পেরে।

তারপর বীণা আমায় বসতে বলে তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে পুরানো দিনের মতো নিজের হাতে চা ও ঝি-এর হাতে জল-খাবারের রেকাবি আর জলের গ্লাস নিয়ে ঘরের টেবিলে রেখে বললে, আসুন দিদি, খেয়ে দেখুন তো চা-টা—তবে কি আর আপনার ডাক বাংলোর বাড়ির মতো হয়েছে?

বীণা আগেকার চেয়ে সুশ্রী ও মাথায় বড়ো হয়ে উঠেছে। তবে ওর ধরন-গুলো ঠিক আছে, একটুও বদলায়নি। বেশ লাগে ওকে।

ওঠবার সময় বীণা বললে--কিন্তু আপনি কাল সকালেই আসবেন তো?—আমি মাকে বলছি আপনি না এলে ভারী রাগ করব কিন্তু বলে দিচ্ছি। কাল রঘু মিশিরকে সকালে ডাক বাংলোয় পাঠিয়ে দেবো এখন।

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, এবারকার আপিসের কাজ শেষ হয়ে এসেছে, বেশিদিন আর ঢাকায় থাকতে হবে না, অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতায় যেতে হবে। বরং এরপর যখন আসা—ইত্যাদি। বীণা কিন্তু কিছুতেই শুনলে না, তার মনেও বেশি কষ্ট দিতে পারলাম না, রাজী হয়ে বললাম—আচ্ছা তাই হবে, তবে একটু দেরি হয়ে যাবে হয়তো, এই বেলা ন'টার মধ্যেই আসব। বীণা খুব খুশি হয়ে বললে—আপনার সেই ঘরটাতেই থাকবেন, সকালেই আটটার আগে আমি রঘু মিশিরকে পাঠাব। চলে আসবার সময়ে আবার ডেকে বললে—সকালে চা খেয়ে আসবেন না যেন, এখানে এসে খাবেন।

ডাক বাংলোয় ফেরবার পথে সেদিন একটা সত্য আমার কাছে বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠল—হঠাৎ বীণারা আমার বড়ো আপন হয়ে উঠেছে। এত

অল্পদিনে যে উপকরণে গাঁথুনি পাকা ও শক্ত হয়ে ওঠে, ওদের দিক থেকে অন্তত: তার কোনো কর্পাণ্য তো ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের এ রকম সহজ সম্পর্ক আদান-প্রদান যে জীবনের কত বড়ো সম্পদ তা অনেক স্থলে আমরা বুঝিনে বলেই সকল সম্বন্ধকে ছোট করে দেখতে শিখি। মেয়েরা এটা কেমন সুন্দরভাবে পারে, ওদের চরিত্রগত সেবা প্রবৃত্তি ও মুগ্ধ মনের সৌন্দর্য জগৎকে যে কত দিক থেকে মঙ্গল ও কল্যাণে ভরে রেখেছে তার বাস্তবতা সেদিন নির্জন ডাক বাংলোর বারান্দাতে বসে মনে-প্রাণে অনুভব করলাম।

সব কথা বুঝিয়ে বলা যায় না। শুধু নক্ষত্রদল যখন অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে কাঁপে—রাত্রি অপূর্ব রহস্যময় হয়…নৈশ পাখির ডাক দূর থেকে ভেসে আসে—মনের মধ্যের নাম-না-জানা উল্লাসে সে সত্যটুকু নিজের কাছে নিজে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

ডাক বাংলোয় ফিরে দেখি আমার এক পুরোনো বন্ধু আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি ইন্সিওরেন্সের দালাল, নারায়ণগঞ্জে কাজে এসেছেন এবং সেখানেই আছেন। তার নামে তার একটা মনি অর্ডার এসেছে কিন্তু সেখানকার পোস্টমাস্টার তাঁকে চেনেন না, তাঁকে সনাক্ত করবারও কেউ সেখানে নেই বলে টাকা দিচ্ছেন না। এদিকে তাঁর হাতেও এক পয়সা নেই—এখন কি করা যায়?

খুব ভোরের ট্রেনে বন্ধুকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জে রওনা হলাম। যাবার সময় চৌকিদারকে বলে গেলাম কেউ এসে খোঁজ করলে বলতে যে, আমি জরুরী কাজে নারায়ণগঞ্জে চলে গিয়েছি, আজই ফিরব। নারায়ণগঞ্জে কাটলো দিন দুই। মহা হাঙ্গামা। পোস্টমাস্টার আমাকেও চেনেন না, একেবারে কিছুতেই পাওয়া যায় না। দু'একজন যাদের সঙ্গে পূর্বে পরিচয় ছিল তারা টাকা কড়ির হাঙ্গামা শুনে পেছিয়ে গেলেন। অনেক কষ্টে শেষে কাজ মিটলো। ডাক বাংলোয় ফিরেই আপিসের চিঠি পেলাম বিশেষ দরকারে কুমিল্লা যেতে হবে। চিঠি এসে দু'দিন পড়ে আছে, আগেই যাওয়া উচিত ছিল, বিলম্বে কার্য ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। ডাক বাংলোর চাপরাশি বললে রণু বিবি দু'দিন এসে ফিরে গিয়েছে। এদিকে ট্রেনের সময় সংক্ষেপ, ফেরবার পথেই তাদের সঙ্গে দেখা করা ঠিক করলাম।

কুমিল্লা থেকে যেতে হল চাটগাঁ, সেখান থেকে স্টীমারে বরিশাল, সেখান থেকে কলকাতা।

তারপরেই ফাল্গুন মাসে আমার ছোট বোনের বিবাহ উপলক্ষে এক মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি। ছোট বোনের বিবাহ শেষ হয়ে যাবার অল্পদিন পরেই মা পড়লেন অসুখে এবং মাসখানেক ভোগবার পর চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সেরে উঠলেন কিন্তু চেঞ্জে যাওয়ার দরকার হল। আপিসে আরও একমাস ছুটির দরখাস্ত করাতে তারা ছুটি তো দিলেই না বরং লিখলে শীঘ্র কাজে যোগ না দিলে অন্য লোক বহাল করবে। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এক লম্বা পত্র লিখলাম সেখানে।

তাই একদিন পরে আজ ভেবে দেখি জীবনের গতি অপূর্ব, অদ্ভুত। এর চেয়ে বড়ো রোমান্সের সন্ধান কেউ দিতে পারে না। বীণাকে যখন বলে আসি পরদিন সকালে তার ওখানে যাবো—এমন কি তার মন প্রফুল্ল রাখবার জন্যে তাকে কি সব বই পড়াবো তা পর্যন্ত ভাবতে ভাবতে এসেছিলাম—তখন কে জানতো বীণার সঙ্গে দেখা তো আর হবেই না, আমার ঢাকা যাওয়ার পথই একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

তারপর কয়েক বছর কেটে গেল। আইন পাস করে আলিপুর কোর্টে বেরুতে আরম্ভ করলাম। ভবঘুরের জীবন ক্রমে পেছনে পড়ে গেল। মাত্র নির্জন অবসর মুহূর্তে, বার লাইব্রেরী কক্ষে মক্কেলহীন দুপুর বেলায়, মাঝে মাঝে সে-সব দিনের নানা কথা মনে পড়ে—তখন যেন স্বপ্নের মতো ঠেকে।

এই সব স্মৃতিতেই জীবন মধুময় হয়ে ওঠে, জীবনের কুঞ্জবনে এরাই গায়ক পাখি, ফুলে-ফলে সকাল দুপুরের সঙ্গে সুর মেলানো অনন্তমুখী সঙ্গীত এদেরই নিভৃত নাডাস্তর থেকে শোনা যায়।

বিবাহের অনুরোধে বাড়িতে টিকানো দায়। জ্যাঠামশায় ভবানীপুরে কোথায় বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করে পাত্রী দেখে এসে খুব প্রশংসা করলেন। জ্যাঠাইমার অনুরোধে তাঁদের বাসা থেকে রওনা হয়ে বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে একদিন মেয়ে দেখতে গেলাম।

বেলতলা রোডে একতলা ছোট বাড়ি। বাড়ির সামনে ছোট্ট একটু কম্পাউণ্ড, গেটের উপরকার লোহার জালিতে থোকা থোকা মাধবীলতার গুচ্ছ। আমরা গিয়ে বৈঠকখানায় বসবার অল্পক্ষণ পরেই মেয়েকে আনা হল। তার মুখের দিকে চেয়েই আমি চমকে উঠলাম। বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হল না। বীণা!

কিন্তু এ কোন্ বীণা? চার বছর আগের সে চঞ্চলা বালিকা নয়, অনিন্দ্য-

সুন্দরী, ধীরা, সংযতা তরুণী! মেয়ের মামা পরিচয় দিলেন মেয়েটি বেথুনে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, ম্যাট্রিক ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছে, পড়াশুনায় বেশ ভালো। বাপ ঢাকার উকিল ছিলেন, মারা গিয়েছেন। বীণা চোখ নিচু করে ছিল, আমার দিকে চায়নি, সে বোধহয় জানেও না যে আমিই পাত্র।

বাড়ির বার হয়ে এসে বন্ধুরা আমাকে ভাগ্যবান বললেন। ওরকম পাত্রী অদৃষ্টে জোটা ইত্যাদি।

কাউকে কোনো কথা বললাম না। শুভদৃষ্টির সময় কাপড় ঢাকা দিয়ে দেওয়া হল না, এমনই দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে দেখলাম—বীণার মুখের অবস্থা ফটোগ্রাফ নেবার যোগ্য হয়েছিল।

অনেক রাত্রে বাসরে সে শাসনের সুরে বললে—আপনি তো আচ্ছা? তলে তলে বুঝি এইসব কু-মতলব ছিল?

আমি উত্তর দিলাম—আমি বুঝি জানি? মেয়ে দেখবার দিন তো আমি জানলাম। আগে জানতে পারলে তুমি বোধহয় কিছুতেই এতে রাজী হতে না—না?

বীণা রাগে ঘাড় দুলিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে। আমার দিকে না চেয়েই বললে—কোথায় ছিলেন এতদিন নিরুদ্দেশ হয়ে? আর এলেন না কেন সেবার?

সংক্ষেপে কৈফিয়ৎ দেবার পর আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম—প্রতিমাকে দেখছি না, সে কি এখানে আসেনি আজ?

এবার বীণা আমার মুখের দিকে চাইলে, চেয়ে চুপ করে রইলো। তারপর সংযত স্বরে বললে—জানেন না? দিদি নেই—সেবারেই মাঘ মাসে মারা যায়; মাথা তার ভালো হয়নি। আপনার নাম বড়ো করত, আমার কাছে কতদিন বলেছে।

স্বপ্ন-বাসুদেব

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের কথা।

আজ থেকে প্রায় বাইশ শ' বছর আগের তক্ষশিলা। নগরীর রাজপথ কোলাহলমুখর। নবারুণোদয় নিজ মহিমায় ধীরে ধীরে উচ্চ চূড়ায় ও স্তম্ভে নবপ্রভাতের বাণী ঘোষণা করছে। তক্ষশিলায় সম্প্রতি দেবী মিনার্ভার এক মন্দির তৈরি হচ্ছে পার্থেননের স্থাপত্যের অনুকরণে, গম্বুজ বা ডোম কোথাও নেই—ছাদ সমতল, অগণিত সুসমঞ্জস বিরাট স্তম্ভশ্রেণী। গ্রীক স্থাপত্য গম্বুজের খিলান গড়তে অভ্যস্ত ছিল না। বহু পরবর্তী কালে সারাসেন সভ্যতার যুগে ইওরোপের উৎপত্তি, সারাসেন তথা মুর সভ্যতার দান এটি।

বড় বড় স্প্রিংবিহীন কাঠ ও লোহার তৈরি একার ধরনের গাড়িতে মাঝে মাঝে দু'চারজন ধনী বণিক ও গ্রীক জমিদার যাতায়াত করছেন। সুন্দরী গ্রীক বালিকাও মাঝে মাঝে রথে চড়ে চলেছে—দেবী এথেনির মত। ব্রোঞ্জের বিরাট জুপিটারমূর্তি প্রস্তরের ছত্রাবরণতলে শোভা পাচ্ছে রাজপথের মোড়ে। বণিকগণের আপণশ্রেণীতে কত কি জিনিস—কত দেশ থেকে আহরণ করে আনা।

একটি সুবেশ বালকভৃত্য একটি দোকানে এসে বললে—কলা আছে?

—আছে, দাম বেশি পড়বে।

—কোথাকার কলা?

—এই কাছের গাঁয়ের। বুড়ো রোজ টাটকা দিয়ে যায়।

—আর আঙুর?

—মদ তৈরি করবার জন্যে সামান্য কিছু এনেছিলাম, নিয়ে যাও।

হঠাৎ রাজপথকে চমকিত করে তূর্য বেজে উঠল। মহারাজ অ্যান্টিআল-কিডাসের মহামাত্য ডিওন ভ্রমণে বেরিয়েছেন—রাজপথ কাঁপিয়ে শ্বেতাশ্ব-বাহিত টাঙায়। রাজপুরুষ ডিওন চলে গেলেন—বালক ভৃত্যটি হাঁ করে চেয়ে রইল।

দোকানদার বললে—তোমার কর্তা কোথায় চললেন?

বালক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—কি জানি বাপু। সে খোঁজে আমার দরকার কি?

—ওঁর ছেলে কি এখনও সেই বিদেশে ?

—তিনি কাল এসেছেন মালব থেকে। সেখান থেকে এসেই অসুখ বাধিয়েছেন বলেই ফল নিতে এসেছি এত সকালে। বলব কি, পয়সাকড়ির অবস্থা ভাল না। রাজা মাইনে দেন না ঠিকমত, লুটেপুটে নিয়ে যা চলে।

দোকানদার অধীরভাবে বলে উঠল—যাও যাও, আমরা গরিব লোক, আমার দোকানে ওসব···এক্ষুনি কে শুনবে। তোমার কি, বড়লোকের চাকর—সুন্দর মুখের সব মাপ—

এর কথার মধ্যে কিঞ্চিৎ বক্রোক্তি ছিল। ভৃত্য সে উক্তি গায়ে না মেখেই চলে গেল। একটু পরে স্বয়ং ডিওনপুত্র হেলিওডোরাস এসে ফলের দোকানের সামনে দাঁড়াল। সুগঠিতদেহ সৌম্যকান্তি গ্রীক যুবক, রঙ অনেকটা আধুনিককালের পেশোয়ারী মুসলমানের মত। দীর্ঘ দেহ, ঈষৎ কুঞ্চিত কেশ, চক্ষু দু'টি নীল নয়—কটা। হেলিওডোরাস চাকা ছোঁড়বার প্রতিযোগিতায় দু'বার সকলকে পরাজিত করে মহারাজ অ্যান্টিআলকিডাসের প্রকাশ্য সভায় পুরস্কার পেয়েছে। তক্ষশিলার অনেক লোক তাকে চেনে। কপিলা থেকে আনীত বিদেশী সুরা খুব চড়া মূল্যে বিক্রি হয় তক্ষশিলার বাজারে। সাধারণ লোকের সাধ্য নেই তা কেনে—কিন্তু হেলিওডোরাস বন্ধুবান্ধব নিয়ে সরাইখানায় বসে স্ফূর্তি করবার সময়ে কপিলার সুরা ব্যতীত অন্য কিছু চায় না।

ফলের দোকানের মালিক সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে বললে—আসুন ছোটকর্তা, আমার আজ বড় সৌভাগ্য—এত সকালে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল এ গরিবের দোকানে।

হেলিওডোরাস ঈষৎ গর্বিত সুরে বললে—জুজু এখানে এসেছিল ?

—হাঁ কর্তা, এইমাত্র চলে গেল।

—আঙুর দিয়েছ তাকে ?

কথার উত্তর দোকানীর কাছ থেকে শোনবার আগেই হেলিওডোরাস চলে গেল। দোকানী অনেকক্ষণ একদৃষ্টে হেলিওডোরাসের অপস্রিয়মাণ সুন্দর চেহারার দিকে চেয়ে রইল।

ডিওনের আর্থিক অবস্থা আজকাল সত্যিই ভাল নয়। রাজার দরবারে তিনি সভাসদ বটে, কিন্তু রাজা অ্যান্টিআলকিডাসের নিজেরই আর্থিক

অবস্থা যা, তাতে সভাসদদের অর্থসাহায্য করবার অবস্থা নয় তাঁর। গান্ধারের রাজা জোঙ্গিফাস ও পুরুষপুরের গ্রীক তালুকদার হিরাক্লিয়াসের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ লেগেই আছে—রাজকোষের যাবতীয় অর্থ এখন ওদিকেই ওড়ে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম, সুতরাং ডিওন এবং অন্যান্য কর্মচারীরা ঠিকমত বেতন পান না, বাজারের বণিক ও প্রজাদের নিকট নানা ছলে অর্থশোষণ করেন। এঁদের মধ্যে ডিওন প্রধান সভাসদ, সুতরাং তাঁর অত্যাচারে তক্ষশিলার বিত্তশালী প্রজা ও বণিক মাত্রেই তাঁর ওপর যথেষ্ট বিরক্ত।

রাজা অ্যান্টিআলকিডাস ব্যাকট্রিয়ান গ্রীক—সুতরাং ভারতীয় প্রজা যত বেশী উৎপীড়িত হয়, গ্রীক ব্যবসায়ী বা প্রজা তার অর্ধেকও না। দু'বার ভারতীয় বণিকসঙ্ঘ প্রতিবাদ করেছিল, সভাসদদের এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সভাসদ তাই কি, বিনা পয়সায় জিনিস দেওয়া হবে না—তিনি যিনিই হন। ধার নিয়ে উপুড় হাত করবেন না সব। কিসের খাতির? এ ব্যবস্থা টেকে নি। গান্ধার থেকে স্বার্থবাহ বণিকসম্প্রদায় উষ্ট্রপৃষ্ঠে উৎকৃষ্ট সুরা ও বিদেশী ফল নিয়ে আসত—এরা তার উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসালে, বাজারে অত চড়া দামে সেসব খাবার লোক রইল না। দু'বার বাজারে দোকান লুট হল—এই সব নানা উপদ্রব। গ্রীক বণিকগণও যে এ অত্যাচার থেকে একেবারে মুক্ত তা নয়, তবুও তাদের প্রতি অত্যাচার এদের তুলনায় অত্যন্ত কম।

হেলিওডোরাসকে ঠিক এই জন্যে কোনও ভারতীয় প্রজা পছন্দ করত না। সে ছিল উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্ধত—'গ্রীক ছাড়া অন্য কেউ মানুষ নয়', এই তার মত। তার আদর্শ পুরুষ হল লিওনিডাস, যিনি থার্মপলির গিরিসংকটে অমর হয়ে আছেন—থেমেস্টোক্লিস্, যিনি টেম্পি গিরিবর্ত্ম রক্ষা করেছিলেন দশ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হয়ে—দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার, যাঁর বাহুবলে আজ ভারতে গ্রীক রাজ্য সম্ভব হয়েছে।

ব্যাকট্রিয়ান গ্রীকদের জীবনযাত্রা ও আচার-ব্যবহার অনেক সময় তার চোখে ভাল লাগত না। একজন খাঁটি গ্রীক স্কুলমাস্টার তক্ষশিলার রাজসভায় দিনকতক এসেছিলেন, ছেলে পড়াতেন বড়লোকের বাড়ির, তাঁর নাম পলিফাইলস—রীতিমত পণ্ডিত। তাঁকে নিয়ে সে সময় কাড়াকাড়ি পড়ে গেল বড়লোকদের মধ্যে, কে তাঁকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করতে পারে, কারণ এথেন্স থেকে তিনি এসেছিলেন। হেলিওডোরাস তখন বালক, তাকে

তিনি বলতেন—তোমাকে দেখে আমার প্রাচীন যুগের গ্রীক যুবকদের কথা মনে পড়ে। শরীরটা স্পার্টার ছেলেদের মত শক্ত কর। এদেশে কিছু নেই। নামেই গ্রীক।

—কেন ?

—গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। এদেশের গ্রীকরা অতিরিক্ত বিলাসী ও আরামপ্রিয় হয়ে পড়েছে। পূর্বপুরুষের রক্তের তেজ নেই এদের মধ্যে। শুধু তা নয়, এরা দেশী লোকের সঙ্গে যেভাবে মেশে, অনেকে দেশী খাদ্য খায় ও পরিচ্ছদ ধারণ করে—যেমন সেদিন এক গ্রীক ভদ্রলোকের গায়ে কাশ্মীরী শাল দেখলাম—ছি ছি, লজ্জাও করে না!...বেশি কথা কি বলব, অনেকে এদেশী মেয়েদের সঙ্গে—

এই সময় স্কুলমাস্টারের হঠাৎ মনে পড়ত যে তাঁর শ্রোতা বালক এবং ছাত্র। স্বজাতির অধঃপতনের দুঃখে যা বলে ফেলেছেন তা যথেষ্ট। বলে উঠলেন—তা ছাড়া, দেখছ না গ্রীক রাজধানী তক্ষশিলা বৌদ্ধ বিহারে ভরা! যাক গে। কবিতা মুখস্থ বলে যাও—

কখনও কখনও ভীষণ গ্রীষ্মের দিনে তক্ষশিলার কোন প্রমোদ-উদ্যানের মধ্যে নিভৃত কুঞ্জে ছায়া নে তিনি ছাত্রদের নিয়ে বসতেন। অতীত যুগের গ্রীকদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ প্রভৃতি জলন্ত ভাষায় বর্ণনা করে যেতেন, ইউরিপিডিস্ ও সাফোর কবিতা আবৃত্তি করতেন, প্লেটোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেশাবলী বুঝিয়ে দিতেন। কয়েক বছর তক্ষশিলায় থাকার পরে তিনি হঠাৎ কোথায় চলে যান। জনশ্রুতি যে, তিনি এই সময় স্বদেশে ফিরতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে আর একবার তিনি প্রিয় জন্মভূমির পবিত্র মৃত্তিকা স্পর্শ করতে চান।

সেই থেকে হেলিওডোরাস পূর্বপুরুষের গৌরবে গৌরবান্বিত। ভারতীয়দের সে ঘৃণাই করে—স্পার্টার যুবকদের আদর্শে শরীর গড়ে তুলেছে। ভারতীয়দের সঙ্গে গ্রীকরা যে বেশি মেসামেশা করে, এটা সে পছন্দ করে না। এমন কি তার পিতা ডিওনকে পর্যন্ত এজন্য সে ঠিক শ্রদ্ধা করতে পারে না, কারণ দু'তিনটি ভারতীয় নর্তকীর বাড়িতে বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর যাতায়াত। যাক সে সব কথা। এদিকে হেলিওডোরাসের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অত্যাচারে তক্ষশিলার অনেকেই অতিষ্ঠ। সে লম্পট নয়, কিন্তু সুরাপায়ী, উদ্ধত—লোকের মান রাখে

না, দোকানের জিনিস ধারে নিয়ে গিয়ে দাম দেয় না—দু-তিনটি নরহত্যা পর্যন্ত করেছে সুরার ঝোঁকে।

কেন, তা বলি।

মেলিবিয়া নামে একটি রূপসী গ্রীক গায়িকা আজ বছর দুই হল ব্যাকট্রিয়া ও গান্ধার হয়ে এখানে আসে উপার্জনের চেষ্টায়। গান্ধাররাজ জোজিফাসের সভায় খুব নাম কিনে এসেছিল। এখানে সে পদার্পণ করার দিনটি থেকে তক্ষশিলার অনেক যুবক ও প্রৌঢ়ের নজরে পড়ে গেল। প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার হিড়িক শুরু হল। বহু গ্রীক যুবক, প্রৌঢ়, এমন কি বৃদ্ধের প্রণয় উপেক্ষা করে (এদের দলে হেলিওডোরাসও ছিল) সুন্দরী মেলিবিয়া প্রসন্নদৃষ্টিতে চাইল, সুমঙ্গল বলে এক ভারতীয় বণিকের প্রতি। এমনই অদৃষ্টের ফের—প্রকাশ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে হেলিওডোরাস সুমঙ্গলকে। মেলিবিয়া এতে বাধা দেয়—তার পর একদিন এক সরাইখানায় সামান্য ছলে ঝগড়া বাধিয়ে হেলিওডোরাস সুমঙ্গলকে হত্যা করে। খুব গোলমাল বাধে এ নিয়ে।

রাজদরবারে অভিযোগ উপস্থিত হল হেলিওডোরাসের বিরুদ্ধে। ভারতীয় বণিকসঙ্ঘ রাজাকে ধরলে এর সুবিচার করতেই হবে। তাদের কাছে টাকা ধার না করলে রাজার চলে না। ফলে, মহারাজ অ্যান্টিআলকিডাস তাঁর সভাসদ ডিওনকে ডেকে বলে দিলেন, কিছুদিনের জন্য হেলিওডোরাসকে সরিয়ে দেওয়া দরকার তক্ষশিলা থেকে। মালবের রাজা তালভদ্রের সভায় যে গ্রীকদূত ছিল, তার মৃত্যু হয়েছিল সম্প্রতি—সেখানেই আপাতত ওকে পাঠানো হক। বলা হবে, রাজার বিচারে ওর নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হল।

সুতরাং গত শীত ঋতুর প্রারম্ভে হেলিওডোরাস মালবের রাজা তালভদ্রের রাজসভায় প্রেরিত হয়।

তক্ষশিলায় পুনরায় আসার উদ্দেশ্য ছিল—মেলিবিয়ার সন্ধানে। কিন্তু হায়, সেই কেলেঙ্কারীর পরে বেচারী গ্রীক গায়িকাকে রাজ্য ছাড়তে হয়েছে। মেলিবিয়া এখন পুরুষপুরের তালুকদার হিরাক্লিয়াসের অতিথি, অন্তত সেই রকম জনপ্রবাদ।

ডিওন বললে—হেলিওডোর, এখানে আবার এসে ঘুরঘুর করছ কেন? বুড়ো বয়সে চাকরিটা খোয়াব তোমার জন্যে?

—আজ্ঞে না, আমি এসেছিলাম শরীর সারাতে। ওখানে যে দিশি বদ্দি

আছে তাদের হাতের শেকড়-বাকড় ওষুধ খেলে হাতী মারা পড়ে, মানুষ কোন্ ছার! আর দেশটাও বড় বিষম জ্বরের—

—বাবা, তুমি আমার নয়নের আনন্দ। কিন্তু জুপিটারের শপথ করে বলছি আমার হাতে একটি পয়সা নেই যা তোমার জন্যে রেখে যেতে পারব। এ হতভাগ্য রাজ্যে কিছু উন্নতি নেই, এদের ঘুণে ধরেছে। ঋণের বোঝা রাজকোষকে ছাপিয়ে উঠেছে। নতুন দেশে যদি কিছু উপার্জন করতে পার, আখের ভাল হবে।

শরতের অপূর্ব জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। ডিওন তার প্রণয়িনীর বাড়িতে আরও কয়েকটি বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করতে গেলেন। তক্ষশিলার মধ্যেই এক সংকীর্ণ রাস্তার ধারে বাড়িটি। কার্নিসে পাথরের ছোট ছোট থামের মাঝে মাঝে ফোকরকাটা ইটের নীচু পাঁচিল।

একজন বললে—শুনেছ হে, কাঞ্চীনগরের তালুকদারের ছেলে অ্যারিস্টোস সম্প্রতি বৌদ্ধ হয়েছে!

অন্য বন্ধু বললে—তুমি যা শুনেছ, ন্যনিফাস, সত্যি হওয়া আশ্চর্য নয়। রাজা মিনাণ্ডাব গ্রীক কুলাঙ্গার, নইলে গ্রীক রক্ত যার গায়ে আছে, সে দেশী ধর্ম গ্রহণ করে কি হিসেবে? ওর শ্বশুরকে আমি জানি, ব্যাকট্রিয়ায় তাঁর অনেক তালুকমুলুক; ভাল বংশের ছেলে—অ্যাণ্টিগোনাস গোনাটাসের মাসতুত ভাইএর শালার বংশ।

—কে?

—ওই রাজা মিনাণ্ডারের শ্বশুর। জামাইএর এই কুমতি শোনবার পরে বেচারা একেবারে শয্যা গ্রহণ করেছেন।

—নিয়ারা কোথায় গেল··?

ডিওন আজ বেশি সুরা পান করেন নি। মন তাঁর ভাল নয়, ছেলেটা আজ কি কাল বাড়ি থেকে চলে যাবে, সঙ্গে এবার তিনি তাঁর প্রিয় বালক-ভৃত্য জোজিফাস ওরফে জুজুকে প্রবাসে ছেলের সেবা করতে পাঠাবেন। ডিওন অনেকদিন বিপত্নীক; বাড়িতে প্রিয়দর্শন পুত্র ও বালক-ভৃত্যটিও অনুপস্থিত থাকবে। একপাল দাসদাসীর মধ্যে (তাদের মধ্যে অনেকেই অসন্তুষ্ট, কারণ সময়মত বেতন পায় না) সন্ধ্যা কাটানো এই বয়সে ভাল লাগে?·· কি যে করবেন—

নিয়ারা প্রবেশ করলে। বয়সে সে ডিওনের চেয়ে অনেক ছোট, তবুও চল্লিশের কম নয়, কিন্তু দেখায় ত্রিশ। সোনালীপাড় দামী রেশমী অঙ্গাবরণ, দুটি বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ওর গৌর অঙ্গের শোভা বর্ধিত করছে। কিন্তু মাথায় গ্রীক মহিলাদের ন্যায় পুষ্পমাল্য, সুন্দর চোখের ভুরু কাশ্মীরী জাফরাণের রেণু, চন্দন ও বার্জ বৃক্ষের আটা মিশিয়ে চিত্রিত করা। তাতে চোখের ভুরু দুটি কালো না দেখিয়ে হলদে দেখাচ্ছে। নিয়ারার পিতা ব্যাকট্রিয়ান গ্রীক, কিন্তু মাতা পারশ্যদেশীয়া।

ন্যানিফাসের কথার উত্তরে নিয়ারা বললে—আমার গুরু এসেছেন, তাই আনন্দে কথাবার্তা বলছিলাম তাঁর সঙ্গে।

ন্যানিফাস বললে—সে আবার কে?

—তিনি একজন ভারতীয় যোগী। বারাণসী থেকে এসেছেন।

সবাই একবাক্যে বলে উঠল—আমরা একবার দেখব—

—তিনি কাউকে দেখা দেন না। কারও কাছে কিছু চান না তো তিনি।

ন্যানিফাস বললে—আচ্ছা নিয়ারা, তুমি একজন এদেশী ধাপ্পাবাজের পাল্লায় পড়ে গেলে কি বলে? এ যে-রকম শুরু হল দেখছি, কবে আমাদের বন্ধু ডিওন মুণ্ডিতমস্তকে বৌদ্ধ ভিক্ষু না হয়ে দাঁড়ায়!

সুরাপায়ী বিলাসী স্থূলদেহ ডিওন পক্ককেশে পুষ্পমাল্য ধারণ করে একপাশে পর্যঙ্কে শুয়ে ছিলেন, তাঁকে মুণ্ডিত-মস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে কল্পনা করে সর্বপ্রথমে প্রৌঢ়া সুন্দরী নিয়ারা হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ল, পরে ডিওনের সব বন্ধুই সেই হাসিতে যোগদান করল।

এমন সময়ে দেখা গেল, একজন দীর্ঘদেহ কৌপীনধারী লোক, সর্বাঙ্গে বিভূতি মাখা, হাতে কমণ্ডলু, আয়ত চক্ষুদ্বয় জ্যোতিষ্মান্—কোন্ সময়ে ছাদের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। সকলে চমকে উঠল। ডিওন বলল—কে তুমি?

সন্ন্যাসী বললেন—বাবাজিদের জয় হক।

—কি?……এ উত্তর শুধু ডিওন দিলেন।

—এই মেয়েটি আমায় বড় মানে। আমি একে এই পাপজীবন থেকে উদ্ধার করতে চাই। আপনারা এখানে আর আসবেন না।

—কোথায় যাব আমরা? তুমি কোন্ নবাব এলে জানতে পারি কি?

সন্ন্যাসী রোষকষায়িত নেত্রে বললেন—বৃদ্ধ লম্পট! পরকালের দিন সমাগত, ভয় হয় না? এখনও এই সব—

সবাই মিলে হুংকার দিয়ে ঠেলে উঠল—এত বড় স্পর্ধা !····· কিন্তু আশ্চর্য, কারও সাধ্য নেই যে নিজ নিজ আসন ছেড়ে উত্থিত হয়। ডিওনকে দেখা গেল তাঁর স্থূলদেহ নিয়ে তিনি পর্যঙ্ক থেকে ওঠবার চেষ্টায় নানারূপ হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি করছেন—এ যেন এক রাত্রির দুঃস্বপ্ন।···সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বললেন —নিয়ারাকে আমি কন্যার মত দেখি, মা বলে সম্বোধন করি। ওর পারলৌকিক উন্নতির জন্যে আমি দায়ী। তোমাদের মত সুরাসক্ত লম্পট ওকে অধঃপতনের পথে নিয়ে চলেছে! তোমাদের সাবধান করে দিয়ে গেলাম। এর পরেও যদি এস, বিপদে পড়ে যাবে। পরে ন্যানিফাসের দিকে চেয়ে বললেন—শোন, তোমার দিন আসন্ন। এই সুরা ও নারী তোমাকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যাবে। পরকালের কথা চিন্তা কর। এখন থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে একটি প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্ববর্তী পুরাতন কূপে তোমার মৃতদেহ ভাসছে আমি দেখতে পাচ্ছি—

ন্যানিফাসের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ, পাণ্ডুর হয়ে উঠল। সুরার নেশা ততক্ষণে তার এবং সকলেরই কেটে গিয়েছে।

—আর ডিওন, তোমার বংশে একটি অদ্ভুত পরিবর্তন আসন্ন। কিন্তু সেজন্যে তুমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিও। বিদায়···আমি চলে গেলে তোমরা পূর্ব অবস্থা প্রাপ্ত হবে—বিদায়···

সন্ন্যাসী অন্তর্ধান হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই নিজ নিজ অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হলেন। দোরের কাছে নিয়ারা দাঁড়িয়ে—তার মুখে মৃদু হাস্য।

ডিওন বললে—কি ?

ন্যানিফাস বললে—কি ?

অন্য সবাই বললে—কি ?

নিয়ারা নিরুত্তর। একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মতই অতি ক্ষীণ একটি হাস্যরেখা তার ওষ্ঠপ্রান্তে মিশে রইল।

২

শরৎ ঋতু শেষ হয়েছে। প্রথম হেমন্তের সুশীতল বাতাসে গত গ্রীষ্মদিন-গুলির দাবদাহ স্মৃতিতে পর্যবসিত করে তুলেছে। হেলিওডোরাস মালবে আজ মাস দুই ফিরে এসেছে। রাজধানী বিদিশার উপকণ্ঠে একটি বৃহৎ উদ্যানবাটিকা

দূর থেকে তার বড় ভাল লাগে। প্রাচীন অশোক বকুল বট নাগকেশর ও সপ্তপর্ণ তরুশ্রেণীর নিবিড় ছায়ায় উদ্যানটি যেন নিভৃত তপোবনের মত শান্তিপ্রদ ও মনোরম। কত পক্ষিকুলের সমাবেশ ও বিচিত্র কলতানে ছায়াবিতানগুলি যেন মুখর।

কয়েকদিন সেদিকে সে একাই গ্রীক রথ হাঁকিয়ে বেড়াতে যায়। টাঙা-জাতীয় এই গ্রীক যানগুলির চলন তক্ষশিলা এবং প্রায় সর্বত্র সভ্য সভ্য নগর-নগরীতে দেখা যায় আজকাল। স্প্রিং নেই, বড় একটা কাঠের বা লোহার খুরোর ওপর শকটের যতটুকু বসানো, তাতে বড় জোর দু'জন লোকের স্থান সঙ্কুলান হতে পারে।

একদিন সে কি ভেবে প্রাচীরের একটি নিম্নস্থান উল্লঙ্ঘন করে উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করল। উদ্যান তো নয়, যেন নিবিড় বন। বহু কালের উদ্যান, বড় বড় গাছগুলিতে নিভৃত কোণ ও ছায়া রচনা করেছে নানাস্থানে—পাষাণ-বাঁধানো বাপীতটে সুন্দর লতাগৃহ, অশোককুঞ্জ, উৎস, যক্ষমূর্তি ইত্যাদি দ্বারা শোভিত নির্জন উদ্যানের মধ্যে কিছু দূরে প্রাচীন দিনের ভারতীয় স্থাপত্য-প্রণালীতে নির্মিত একটি বিশাল অট্টালিকা বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়ে চোখে পড়ে—কিন্তু সেখানে কেউ বাস করে বলে মনে হল না। হেলিওডোরাস আপন মনে পরিভ্রমণ করতে করতে একটি পাষাণবেদীতে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলে—তারপর সেখান থেকে বের হয়ে এসে রথ হাঁকিয়ে চলে এল। সেই থেকে মাঝে মাঝে উদ্যানটিতে যায়—কখনও মধ্যাহ্নে, কখনও সন্ধ্যায়, কখনও একাই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে।

বৎসর প্রায় ঘুরে গেল। শীত এলও, চলেও গেল। পুরুষপুরে এবার তুষারপাতের সংবাদ পাওয়া গিয়েছে—অতি দুর্দান্ত শীত ছিল এবার। ফাল্গুনী চতুর্দশী তিথির মনোরম জ্যোৎস্নালোকে, অজস্র বিহঙ্গকাকলী ও পুষ্পপর্যাপ্তির মধ্যে হেলিওডোরাসের দিনগুলি যেন স্বপ্নের মত কাটছে। রাজকার্যের অবসানে নিজের রথটি নিয়ে বার হয়ে নগরীর বাইরে বহু দূর পর্যন্ত চলে যায়। এখানে সে প্রায় একা। দু' একটি ভারতীয় কর্মচারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে এবং মালবের ভাষা সে একরকম আয়ত্ত করে ফেলেছে এক বৎসরে।

এই সময় একদিন সে তার সেই পরিচিত উদ্যানবাটিকাতে ঢুকল পথের পাশে রথ থামিয়ে। পুষ্পে পুষ্পে, নববল্লীপল্লবে, চূতমুকুলের সুবাসে, কোকিল-ঝঙ্কারে প্রাচীন উদ্যান তার বৃদ্ধত্ব পরিহার করে নবযৌবনের রূপ পরিগ্রহ

করেছে। নিভৃত লতাগৃহ যেন গ্রীক রতিদেবতার আসন্ন পদস্পর্শের আগ্রহে উৎসববেশে সজ্জিত হয়েছে। সেই পাষাণবেদীতে সে মুগ্ধ মনে চুপ করে বসে আছে, এমন সময় কার পদক্ষেপের শব্দে চমকে পিছন ফিরে যা দেখলে তাতে সে বিস্মিত ও বিচলিত হয়ে উঠল।

একটি রূপসী তরুণী তার পিছনে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে। অপূর্ব তার অঙ্গলাবণ্য, ক্ষীণ কটিতটে রত্নমেখলা, নিবিড় কৃষ্ণ কেশপাশে টাটকা তোলা যূথীগুচ্ছ। গ্রীক মেয়েদের মত দীর্ঘদেহা তন্বী। মেয়েটি অবশ্য ভারতীয়া, সাজপোশাকেই হেলিওডোরাস বুঝলে।

মেয়েটি তাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে মনে হল হেলিওডোরাসের। বিস্ময়ে তার চারু আয়ত কৃষ্ণ নেত্রদুটি স্তব্ধ অচঞ্চল। কিছুক্ষণ দুজনের কেউ কথা বললে না।

তার পর হেলিওডোরাস উঠে দাঁড়িয়ে বললে—ভদ্রে, এ উদ্যান বোধ হয় আপনাদের। আমি পথিক, বেড়াতে এসে একটু বসেছিলাম—

মেয়েটি কোন কথা না বলে ফিরে চলে যেতে উদ্যত হল।

হেলিওডোরাসের মূঢ়তা ততক্ষণ ঘুচেছে। সে হাজার হলেও গ্রীক ভদ্রলোক। বিনীত স্বরে বললে—একটু দাঁড়াবেন দয়া করে? আমার এই অনধিকার প্রবেশের জন্যে আমি বিশেষ লজ্জিত—আমায় যদি ক্ষমা করেন—

মেয়েটি যেন কম্পিত অগ্নিশিখা, নিজের মহিমায় নিজে দীপ্তিমতী। হেলিওডোরাস এই ভারতীয় মেয়েটির অপরূপ রূপমাধুরীতে কেমন বিস্মিত হয়ে উঠেছে। এত রূপ হয় এদেশের মেয়ের? এমন শ্বেতাঙ্গ সুন্দর দেহকান্তি যে কোন সুন্দরী গ্রীক তরুণীর পক্ষেও দুর্লভ।...মেলিবিয়া কোথায় লাগে!

হেলিওডোরাস সসংকোচে তার কথা শেষ করবার অতি অল্পক্ষণ পরেই মেয়েটি নম্রস্বরে বললে—আপনি কি গ্রীক?

—হ্যাঁ, ভদ্রে।

—অল্প দিন এসেছেন এখানে?

—না ভদ্রে। এক বৎসর হল—আমি রাজসভায় তক্ষশিলার গ্রীকদূত—আমার নাম হেলিওডোরাস।

রূপসী বালিকা বিস্ময়ে কৃষ্ণ ভ্রূযুগল উর্ধ্বদিকে ঈষৎ তুলে হেলিওডোরাসের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বললে—ও!

—কেন? আমার কথা কি আপনি শুনেছিলেন?

—হ্যাঁ। বাবার মুখে শুনেছিলাম সভায় একজন রাজদূত—

হেলিওডোরাস মনে মনে ভাবলে, ইনি বোধ হয় কোন রাজঅমাত্যের কন্যা হবেন। বললে—আপনার পিতা রাজসভায় কি পদে—আমি অনেককেই চিনি—

মেয়েটি কিছু বলবার পূর্বেই আরও দুটি সুন্দরী মেয়ে—ওরই প্রায়' সমবয়সী —সেখানে এসে পড়ল কোথা থেকে। ওদের দুজনকে দেখে তারাও যেন অবাক হয়ে গিয়েছে। একজন বললে—কত খুঁজে বেড়াচ্চি তোমাকে—বাবাঃ! এখানে কি হচ্ছে?

মেয়ে দুটি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে হেলিওডোরাসের দিকে চাইলে। সে দৃষ্টির মধ্যে প্রশ্নও ছিল।

হেলিওডোরাস বললে—আমি এখানে বেড়াতে এসে একটু বসেছিলাম। আমি জানতাম না যে, আপনাদের বাগান। সেই সময় আপনাদের সখী—

মেয়ে দুটি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই মুখ ঘুরিয়ে তাদের সখীর দিকে চেয়ে বললে—চল! মহাদেবী ভাববেন—কতক্ষণ বেরিয়েছি—

এমন সময় আরও তিন-চারটি তরুণী সেখানে এসে দাঁড়াল। তাদের পেছনে দেখা গেল আরও দুটি আসছে। পিছনের মেয়েগুলি কলরব করতে করতে আসছিল। ওদের মধ্যে কে বললে—কি হচ্ছে সব জটলা ওখানে? কি হয়েছে?

ওদের সম্মিলিত কণ্ঠের তরল হাস্যকলরবে নববসন্তের বাতাস যেন মদির হয়ে উঠেছে, চূতমঞ্জরী এই পুষ্পলাবিনী তন্বী বালিকাদের নূপুর-নিক্বণে।

হেলিওডোরাস প্রথমদৃষ্টা সে অপরূপ রূপসীকে সম্বোধন করে বললে—আমি চলে যাচ্ছি, আমায় ক্ষমা করুন—আপনার পিতার নামটি তো শুনতে পেলাম না ভদ্রে?

একজন মেয়ে ভাল করে মুখ না ফিরিয়েই ঈষৎ উদ্ধত স্বরে বলেন—ওঁর পিতার নাম মহারাজ ভাগভদ্র।

তারপর সবাই মিলে একদল বন্যহংসীর মত লঘু পদক্ষেপে লতাবিতানের অন্তরালে অদৃশ্য হল।

হেলিওডোরাস কোনরকমে বাগান থেকে বার হয়ে এল।

স্বয়ং রাজকন্যা মালবিকা! এঁর রূপের খ্যাতি বিদিশায় এসে পর্যন্ত

সমবয়সী দু' একজন বন্ধুবান্ধবের মুখে সে যথেষ্ট শুনে এসেছে। নগরচত্বরে ভ্রমণশীল অনেক মেয়েকে দেখে মনে হয়েছে—রাজকন্যা কেমন রূপসী? এই রকম?

আজ এভাবে........

আশ্চর্য! কিন্তু—

হেলিওডোরাসের মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। উঃ কি গরম আজ! বিশ্রী জায়গা এই বেশনগর। এমন গরমে মানুষ টেকে?

অপূর্ব রূপসী এই রাজকন্যা মালবিকা। অপূর্ব...অপূর্ব...অপূর্ব—দেবী মিনার্ভার মত মহিমময়ী, অ্যাফ্রদিতির মত লাস্যময়ী, রূপবতী, সাক্ষাৎ রতিদেবী অ্যাফ্রদিতি, মূর্তিমতী প্রণয়-কবিতা, সাফোর বহ্নিজ্বালাময়ী প্রেমের কবিতা—সাফোর—

৩

আরও এক মাস কেটে গেল। গ্রীষ্মকাল এসে পড়েছে। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা মাথায় করে ঝাঁকে ঝাঁকে খরমুজা বিক্রি করতে আনছে বাজারে। এই এক মাস কি কষ্টে যাপন করেছে হেলিওডোরাস সে-ই জানে। কাউকে বলতে পারে নি যে, তার সঙ্গে রাজকন্যা মালবিকার দেখা হয়েছিল। কে কি মনে করবে, কার কানে কি কথা উঠবে। এ-সব হিন্দুরাজ্যের আইনকানুন বড় কড়া—কথায় কথায় প্রাণদণ্ড। মৃত্যুকে সে ভয় করে না—কিন্তু নির্বোধের মত মৃত্যুকে ডেকে আনার দরকার কি।·· সেইদিনটি থেকে তার শয়নে স্বপনে রাজকন্যা মালবিকা। কতবার সেই উদ্যানের আশেপাশে বেড়িয়েছে, দু' দিন প্রাণ তুচ্ছ করে ঢুকেও ছিল, সেই পাষাণবেদীতে গিয়ে বসেছিল...কিন্তু সে উদ্যান যেমন সে দিনটির পূর্বে ছিল জনহীন, তেমনই তখনও। অবহেলিত উৎসমুখ, ভগ্ন যক্ষমূর্তি, বনে-জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন পুষ্পবাটিকা, লতাগৃহ—শৈবালাচ্ছন্ন পাষাণ-প্রাসাদ...জনশূন্য অলিন্দ। কিন্তু হেলিওডোরাস আর বাঁচে না... সত্যিকার প্রেম এই প্রথম জীবনে এসেছে তার বহ্নিজ্বালা নিয়ে। জীবনে আর সবকিছু তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে...আর একটিবার সেই অপরূপ রূপসী তরুণী দেবীর সঙ্গে দেখা হয় না? সব কিছু দিয়ে দিতে পারে হেলিওডোরাস...একটিবার চোখের দেখা···সব দিক থেকে অসম্ভব...সে সামান্য রাজদূত, কর্মচারী

মাত্র—তাতে বিদেশী, বিধর্মী...অন্যদিকে প্রবলপ্রতাপ মহারাজ ভাগভদ্রের কন্যা সে...

বৈশাখের শেষের দিকে গ্রীষ্মের দাবদাহ আরও বেড়েছে, হেলিওডোরাস কি মনে করে অপরাহ্নের দিকে সেই উদ্যানবাটিকাতে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করতে করতে গিয়ে হাজির হল। পক্ক আম্রফলের গন্ধ বৈশাখ-অপরাহ্নের উষ্ণ বাতাসে। সেই পাষাণবেদীতে আগেকার আরও দু'বারের মত এবারও বসল। দু'বার নিষ্ফল হয়েছে এই বৃথা প্রতীক্ষা, এবারও হবে সে জানে! তা নয়, সেজন্যে সে আসে নি—কিন্তু এই লতাগৃহের বাতাসে যেন তার দেহগন্ধ মিশিয়ে আছে—পক্ক আম্রফলের গন্ধ যেমন মিশে রয়েছে এই নিদাঘ-অপরাহ্নের বাতাসে। সে স্বপ্ন দেখতে চায়—ভাবতে চায়—কোথায় কোন্ সুপী প্রেমিক-যুগল এমনই জনহীন নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় পরস্পরের হাত ধরে যূথীবনে বিচরণশীল... কত কথা, কত প্রণয়-গুঞ্জন, কত চুম্বন উভয়ের মধ্যে।...সে আর রাজকন্যা মালবিকা।...এমন যদি কোনদিন—

ভাবতে ভাবতে বোধ হয় তার তন্দ্রাকর্ষণ হয়ে থাকবে। গরম তো বটেই...

হঠাৎ যেন একটি সুন্দর হাস্যমুখ কিশোরমূর্তি তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাকে এক ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলে বললে—আমি কতকাল অপেক্ষা করব তোমার জন্যে? ওঠ, ওঠ—কত এলোমেলো স্বপ্ন থাকে মাথায়!

হেলিওডোরাস জেগে উঠল। বেদীর গায়ে তার খড়্গখানা ঠেসানো রয়েছে, হাতে নিয়ে বাগানের বাইরে তার রথের কাছে এল।

সত্যিই সে উদ্‌ভ্রান্ত, এমন অবস্থায় সে বেশিদিন এখানে কাটাতে পারবে না। পাগল হয়ে যাবে নাকি শেষে?

পথে পা দিতেই একটি বৃদ্ধ ভিক্ষুক ওর কাছে ভিক্ষা চাইল। অন্যমনস্কভাবে কিছু মুদ্রা ওর হাতে দিতে গেল। দেখলে, সেটি একটি স্বর্ণমুদ্রা—ফিরিয়ে নিতে যাবে, কিন্তু পরক্ষণেই অপরিসীম ঔদাসীন্যের সঙ্গে মুদ্রাটি ভিক্ষুকের হাতে ফেলে দিল। কি হবে অর্থ তার জীবনে? নীরস জীবন, মরুময় জীবন। পিতা ডিওন সুখে থাকুন, কিন্তু তাঁর বংশের পাপ·· প্রজাদের অর্থশোষণ, তাদের উপর অত্যাচার—

ভিক্ষুক স্বর্ণমুদ্রা হাতে পেয়ে অপ্রত্যাশিত আনন্দে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল—বাসুদেব আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন!

হেলিওডোরাসের অন্যমনস্কতা এক চমকে কেটে গেল। বললে—কি বলছিস তুই? এই, দাঁড়া!

ভিক্ষুক ভয়ে ভয়ে বললে—খারাপ কিছু বলি নি বাবা, বাসুদেব আপনার মনের বাসনা পূর্ণ করুন, তাই বলছি।

—কে তিনি?

—মস্ত বড মন্দির বাসুদেবের—জানেন না?

—খুব জানি। কেন জানব না—ভারতীয় দেবতার মন্দির। দেখেছি।

—তিনি যে জাগ্রত দেবতা বাবা। যে যা ভেবে মানত করে, তিনি তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। আমি একবার—

হোলিওডোরাস আর একটি মুদ্রা তার হাতে দিয়ে বললে—যা পালা—মুণ্ড কেটে ফেলে দেব আর একটি কথা বললে—

সেই বৈশাখী জ্যোৎস্নারাত্রে উদ্‌ভ্রান্ত হেলিওডোরাসের মনে ভিখিরির এই কথা যেন দৈববাণীর আশ্বাস নিয়ে এল। বাসুদেব...' ভারতীয় দেবতা বাসুদেব'

মনের বাসনা পূর্ণ হবে তার? সে যা চায়? মালবিকাকে না পেলে বিশাল ইরিথিয়ান সমুদ্র পাডি দিয়ে ছাগপদ বনদেবতাদের খুঁজে বের করবে সামোস দ্বীপের বন্য দ্রাক্ষাকুঞ্জের নিভৃত আশ্রয়ে, জলপাই ও মার্টল বৃক্ষের ঝোপে ঝোপে, আর্দ্র পাষাণমঞ্চে শুয়ে ওক পাইনের তলে সারাজীবন কাটিয়ে দেবে বন্যফল খেয়ে—ছাগপদ স্যাটিরদের দলে মিশে চিরযৌবনা বনদেবীদের সন্ধানে·· অথবা—বনদেবীদের প্রয়োজন নেই—রাজনন্দিনী মালবিকার সন্ধানে সে চিরযুগ ঘুরবে···

পরদিন বৈশাখী পূর্ণিমা। সন্ধ্যার সময় সে গিয়ে বাসুদেবের মন্দিরের বিশাল চত্বরের একপাশে এক গাছতলায় দাঁড়াল। বিরাট পাষাণমন্দিরের চূড়া উর্ধ্বাকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—মন্দিরের অভ্যন্তরে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি—মন্দিরের প্রাঙ্গণে শত শত নরনারীর ভিড়—স্থানে স্থানে পুষ্পবিক্রেতা বসে আছে নানা বর্ণের পুষ্পের ডালি সাজিয়ে—দলে দলে মেয়েপুরুষ চলেছে মন্দিরে। সে জানে তাকে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়তো বাধা দেবে। তবুও সে ভিডের মধ্যে ঢুকে পডল সন্ধ্যার অন্ধকারে গা মিশিয়ে। বেশী দূর যেতে সাহস হল না কিন্তু।

দূর থেকে দেখা গেল গর্ভদেউলের অন্ধকারে ধাতুপ্রদীপের আলোয়

বাসুদেবের প্রস্তরমূর্তির মুখ। কোথায় যেন সে এ মুখ দেখেছে ঠিক মনে করতে পারলে না। কোথায়? কবে?

অন্য লোকের দেখাদেখি হাত জোড় করে প্রার্থনা করলে—হে বাসুদেব, আমি বিদেশী, বিধর্মী। তোমার কাছে এসেছি। তুমি নাকি মানুষের মনের বাসনা পূর্ণ কর। আমার মনের বাসনা তুমি জান, অন্য ধর্মের লোক বলে তুমি আমার প্রার্থনা অবহেলা করতে পারবে না কিন্তু। আমার নাম হেলিওডোরাস —তক্ষশিলায় আমার বাড়ি। মনে করে রেখো—

বাসুদেবের বিশাল মন্দিরের পাষাণচূড়া বৈশাখী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। নরনারীর ভিড় ক্রমশই বাড়ছে—হয়তো এখানে আজ কোন উৎসব আছে। নরনারীদের মধ্যে কেউ কেউ তার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে গেল—হয়তো ভাবলে একজন গ্রীক যুবক বাসুদেবের মন্দিরে কি করছে?

একটি লোককে দেখে হেলিওডোরাস তাকে ডাক দিলে। লোকটি ছুটে এল তার কাছে। তার গলায় উপবীত, কপালে চন্দনের ফোঁটা, শিখায় পুষ্প বাঁধা।

হেলিওডোরাসের অনুমান যথার্থ, সে মন্দিরের একজন পরিচারক ব্রাহ্মণ বটে।

লোকটিকে সে বললে—কত লাগে তোমাদের দেবতাকে কিছু ফলমূল মিষ্টান্ন কিনে দিতে?

একজন গ্রীকের এত ভক্তি দেখে বোধ হয় লোকটি একটু অবাক হয়ে ও মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—আপনি কি পূজো দেবেন?

—হ্যাঁ।

—যা দেবেন আপনি। দু দীনার, দশ দীনার—

—তক্ষশিলার স্বর্ণমুদ্রা এখানে চলবে?

—কেন চলবে না হুজুর? শ্রেষ্ঠীর দোকানে ভাঙিয়ে নিলেই চলবে।

—আচ্ছা নিয়ে যাও। আমার নাম হেলিওডোরাস, নাম মনে থাকবে? আমার নামে এই মুদ্রার পরিমাণ ফলফুল মিষ্টান্ন কিনে দেবে—কেমন তো?

—নিশ্চয়ই। বাসুদেবের নামে দিচ্ছেন—আপনি দেখছি একজন ভক্ত।

—আচ্ছা যাও—

—আমার দক্ষিণাটা—

হেলিওডোরাস পূজারীকে আরও কিছু দিয়ে সেখান থেকে বার হয়ে মন্দিরের সিংহদ্বারের কাছে এল।

সেই দিনটির পর সে মাঝে মাঝে প্রায়ই বাসুদেবের মন্দিরে এসে একবার করে দেবতাকে তার প্রার্থনা জানিয়ে যায়। মাসের পর মাস চলে গেল, মন্দিরের দেবতা তার প্রার্থনা শুনলেন কই? কোথায় তার মানসী প্রতিমা যার জন্য এত আকুল প্রতীক্ষা—কেবল হাঁটাহাঁটিই সার।

৪

একদিন এই অবস্থায় মন্দির থেকে বাড়ি ফিরে দেখলে তক্ষশিলা থেকে দূত এসেছে রাজা অ্যান্টিআলকিডাসের সেনাপতি অ্যারিওস্টোসের পত্র নিয়ে। পত্র খুলে পড়লে, এক্ষুনি তাকে ফিরে আসতে হবে তক্ষশিলায়। জরুরী দরকার।

হেলিওডোরাস বিস্মিত হল। দূতকে বললে—তুমি কিছু জান?

সে ব্যক্তি বিশেষ কিছু জানে না। কোন গোপনীয় রাজকার্য হবে।

সেইদিনই হেলিওডোরাস তক্ষশিলায় প্রত্যাবর্তন করলে। সেখানে গিয়ে শুনলে, ব্যাপার গুরুতর বটে। মধ্য-এসিয়া থেকে যুদ্ধদুর্মদ শ্বেতকায় হূণদল গান্ধার আক্রমণ করে ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের অত্যাচারে গান্ধার ও কপিলার বহু গ্রাম জনপদ ধ্বংস হয়েছে, বহু নগরী বিধ্বস্ত হয়েছে। পুরুষপুর, বেণুপত্র, মাত্রাবতী, বলভী প্রভৃতি রাজ্য বিপন্ন। পুরুষপুরের গ্রীকরাজ হিরাক্লীয়াস ও বেণুপত্রের মহাসামন্ত কুব্জ বিষ্ণুবর্ধন তক্ষশিলার সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। রাজা সৈন্যদল পাঠাচ্ছেন—হেলিওডোরাসকে যেতে হবে যুদ্ধে। হেলিওডোরাস আদেশ পেলে—সেনাপতি অ্যারিওস্টোস ও মহাসামন্ত কুব্জ বিষ্ণুবর্ধনের অধিনায়কত্বে একদল সৈন্য 'চন্দ্রভাগা' পার হয়ে গান্ধারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—ওদের সঙ্গে অবিলম্বে যোগ দিতে হবে।

তিন বছর কাটল। আজ বলভী, কাল অনত্র, পরশু কপিলা। পর্বত, প্রান্তর, নদী। গান্ধার থেকে পুরুষপুর, পুরুষপুর থেকে গান্ধার। শ্বেতকায় হূণেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত—অনেকবার তাদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হল মরুভূমিতে, পর্বতের সংকীর্ণ অধিত্যকায়, কত গণ্ডগ্রামের রাজপথে। মানুষ মরে পাহাড় হয়ে গেল—যত না যুদ্ধে, তত দুঃখে কষ্টে অনাহারে। হূণের দল রক্তলোলুপ পশুর মত জনপদবাসীদের উপর অত্যাচার করতে লাগল। রাত্রের আকাশ

আলো হয়ে ওঠে দহ্যমান শস্যক্ষেত্রের বা গ্রাম-জনপদের বাসগৃহের রক্ত অগ্নি-শিখায়। মানুষ নৃশংস হত্যার লালসায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। যুধ্যমান সৈন্য-বাহিনীর নির্মম রথচক্রতলে শত শত নিরীহ নারী, শিশু, অসহায় বৃদ্ধ পিষ্ট হয়ে মেদরক্তে পথের ধূলি কর্দমাক্ত করে তোলে। সর্বগ্রাসী প্রলয়দেব করাল কৃপাণ দু' হাতে বন্ বন্ করে ঘোরান—শাণিত খড়্গের ফলকে ফলকে সূর্যকিরণ ঠিকরে পড়ে। কপিলার উত্তর ভাগ শ্মশান হয়ে গেল এই তিন বৎসরে। গভীর নিশীতে সেখানে মুণ্ডমালিনী কপালিনী কালভৈরবীর রক্তসিক্ত জিহ্বা লক লক করে অন্ধকারে। শিবাদলের অমঙ্গল চীৎকারে অন্তরাত্মা কাঁপে।

একটি খণ্ডযুদ্ধে হেলিওডোরাস হূণদের হাতে বন্দী হল। কেন তারা তাকে হত্যা করলে না, সে নিজেই জানে না। অবাক হয়ে গেল সে। পশু-চর্মের তাঁবুতে উটের দুধ ও ছাতু খেয়ে পর্যুসিত পশুমাংস খেয়ে সে এক মাস অতি কষ্টে কাটাল। প্রতিক্ষণেই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে—অথচ কেন তাকে ওরা মারে না কে জানে। একদিন সে শুয়ে আছে তাঁবুতে, স্বপ্ন দেখলে, এক সুন্দর তরুণ তাকে ঠেলা মেরে উঠিয়ে বলছে—আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় পথ দেখিয়ে দিচ্ছি পালাবার।

বাইরের অন্ধকার ছুরি দিয়ে কাটা যায়। এখানে ওখানে হূণ-প্রহরীদের অগ্নিকুণ্ড। আবছায়া অন্ধকারে চলেছে দুজনে—তরুণ আগে ও পেছনে। ...পথপ্রদর্শক তরুণের মূর্তি অন্ধকারে অস্পষ্ট, ভাল দেখা যায় না। সম্মুখেই অজিরাবতী নদী।....

—নাম নাম, জলে নাম। মাভৈঃ—

স্বপ্নাচ্ছন্নের মত নামছে হেলিওডোরাস। কনকনে বরফগলা জল, প্রথমে এক হাঁটু, পরে কোমর, তার পরে একগলা।

আগে যে যাচ্ছে সে বলছে—ভয় নেই। চলে এস। এই জায়গায় নদীর জল কম, চিনে রাখ, এই শালগাছ। ডুবে যাবে না।

একগলা জলে পড়তেই হেলিওডোরাসের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভোর হয়েছে। স্বপ্নের কথা ভাবলে। কে এই কিশোর, একে সে কোথায় আরও স্বপ্নে দেখেছে—পরিচিত মুখ। হঠাৎ মনে পড়ল সেই বিদিশার প্রাচীন উদ্যান-বীথি...এই বাপীতট (স্বপ্নযোগে উদ্‌ভ্রান্ত সে একদিন একেই দেখেছিল) —কেন সে বার বার এই কিশোরকে স্বপ্নে দেখে? কে এই তরুণ?

সারাদিন সে স্বপ্নের কথা ভাবলে। তার দৃঢ় বিশ্বাস হল, আজ রাত্রে সে

পালাতে চেষ্টা করবে। সে কৃতকার্য হবে। গভীর নিশীথে তাঁবুর বার হয়ে এল সে—হাতে পায়ে শৃঙ্খল ছিল না। আসবপানমত্ত হূণ প্রহরীরা অগ্নিকুণ্ডের ধারে তন্দ্রামগ্ন। অদূরে অজিরাবতী নদী, ওই সেই শালগাছ। নিঃশব্দে জলে নেমে চক্ষের নিমেষে সে ওপারে উঠল গিয়ে শালবনের মধ্যে কুব্জ বিষ্ণুবর্ধনের স্কন্ধাবারে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল সেই শীতকালের প্রথমেই। দীর্ঘকাল পরে হেলিওডোরাস তক্ষশিলায় ফিরল। মাসখানেকের মধ্যেই রাজার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে মালবে সে পূর্বপদে ফিরে এল। কিসের যেন আকর্ষণ, কে যেন টানে।

একদিন সে নগরীর বাইরে বেড়াতে বেড়াতে সেই উদ্যানবাটিতে প্রবেশ করলে। সেই শৈবালাচ্ছাদিত পাষাণবেদী, সেই লতাগৃহ, সেই যক্ষমূর্তিশোভিত বাপীতট—সব তেমনই আছে। যেন কত কাল আগের স্বপ্ন। একদিন সেই রূপসীকে যেন স্বপ্নে দেখেছিল এখানে—সেই বসন্তকালের পুষ্পসৌরভ, সেদিনকার সে সন্ধ্যাটি—সব যেন হিপোলিটাসের সেই করুণ কবিতাটি স্মরণ করিয়ে দেয়—'আপেলগাছের ছায়া, রূপসী-কণ্ঠের গান, সুবর্ণের দ্যুতি'—প্রথম যৌবনের হারানো দিনগুলির দূরাগত বংশীধ্বনি! হা ভারতীয় দেবতা বাসুদেব! তোমার পাষাণ-দেউলের মত তুমিও কি কঠিন? কিংবা আমি গ্রীক বলে, বিধর্মী বলে, আমায় অবহেলা করলে? কথা কানে তুললে না?....সে আজ নেই। সে রূপসী কোনও দূর রাজ্যের রাজমহিষী। জীবনে আর তার সঙ্গে দেখা হবে না, সে জানে। কেউ বসে নেই তার জন্যে তিন বৎসর পরে।

৫

আবার বসন্তকাল। সুদীর্ঘ তিন বৎসর পূর্বে এই বসন্তকালে এই সময় মালবিকার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। হেলিওডোরাস কি মনে করে এবার ঠিক তেমনি প্রস্ফুটিতকুসুমগন্ধে আমোদিত পথ দিয়ে যেতে যেতে রথ থামিয়ে সেই উদ্যানটিতে প্রবেশ করলে। কতদিন এখানে আসে নি। সম্পূর্ণ বাস্তব এই পাষাণবেদী। স্বপ্ন তো নয়—বিশাল রাজপুরীর অন্তঃপুর-প্রান্তে সেই রূপবতী তরুণী রাজনন্দিনীও তো স্বপ্ন নয়। এখানে এসে তবুও যেন কেমন

একটু স্পর্শ···একদিন এখানকার এই মৃত্তিকায় তো সে এসে দাঁড়িয়েছিল। আজ সে হয়তো বিবাহিতা—কোনও দূর রাজ্যের রাজমহিষী।

কতক্ষণ কেটে গেল। অপরাহ্ণ অবসানপ্রায়। বনলক্ষ্মী স্নিগ্ধ বাতাস কুসুমগন্ধে ভরে দিয়েছেন।

হিপোলিটাসের সেই কবিতা—'আপেলগাছের ছায়া, তরুণীকণ্ঠের গীতধ্বনি সুবর্ণের দ্যুতি—'

হঠাৎ পাষাণ-বেদিকার পিছনে বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে কার পদধ্বনি শোনা গেল। তবে কি সেই কৃষ্ণকায় উদ্যানরক্ষক যাকে একবার সে কিছু পুরস্কার দিয়েছিল? মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখেই হেলিওডোরাস স্তব্ধ হয়ে রইল বিস্ময়ে, ঘটনার অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতায়। সেই অপরূপ রূপসী তরুণী স্বয়ং!

হেলিওডোরাস উঠে দাঁড়াল। মেঘাবরোধ ছিন্ন করে বিদ্যুৎশিখা একেবারে তার সামনে! কতদিনের স্বপ্নে চাওয়া তার সেই মানসী প্রতিমা। দীর্ঘ তিন বৎসরে তার রূপ এতটুকু ম্লান হয় নি—বরং বেড়েছে।

তার চেয়েও আশ্চর্য, তরুণী তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললে—ও, আপনি!

হেলিওডোরাসের ঘোর তখনও যেন কাটে নি—মাথা ও শরীর ঝিমঝিম করছে। সে উত্তর দিলে—হ্যাঁ ভদ্রে!

মেয়েটি বললে—আপনি অনেকদিন এদিকে আসেন নি—আপনি ছিলেন না এখানে তাও জানি। হূণদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। বীর আপনি। কিন্তু ফিরেছেন কবে তা শুনি নি।

হেলিওডোরাসের গ্রীক রক্ত শরীরের মধ্যকার শিরায় উপশিরায় আগুন ছুটিয়ে দিলে। সে স্থির দৃষ্টিতে তার প্রেমাস্পদার দিকে চেয়ে বললে—আমি ফিরে এসেছি এবং এই উদ্যানেও এসেছি কয়েকবার—কিন্তু আপনাকে দেখি নি—

মেয়েটি অবাক হয়ে বললে—আমাকে!

—আপনাকে খুঁজেছি যে—এই তিন মাস ধরে। গান্ধার থেকে ফিরে পর্যন্ত কতদিন এসেছি।

মেয়েটির মুখে যেন অতি অল্প সময়ের জন্য কিসের দীপ্তি। ওর শ্বেতপদ্মের আভাযুক্ত গণ্ডস্থল যেন অল্প সময়ের জন্য রক্তিম হয়ে উঠল। সে বললে—আচ্ছা, আমি শুনেছি, আপনি নাকি যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে বাসুদেবের মন্দিরে যাতায়াত করতেন প্রায়ই?

—হ্যা, ভদ্রে—কে বললে ?

—সবাই বলে। আপনি গ্রীক, আপনার ওখানে যাতায়াত নিয়ে নগরীর লোকজনের মধ্যে কৌতুহলের সৃষ্টি হবেই তো। আপনি কি আমাদের দেবতা মানেন ?

—মানি—আজ বিশেষ করে মানছি। বাসুদেব অতি দয়ালু দেবতা, মানুষের প্রার্থনা উনি শোনেন, আজ বুঝলাম।

মেয়েটি বিস্ময়ের সুরে বললে—অ'জ ! কেন ?

—আজই। অভয় দেবেন ভদ্রে ? মার্জনা করবেন একজন বিদেশী লোকের প্রগল্‌ভতা ?

মেয়েটির মুখ হঠাৎ যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। পরক্ষণেই সে-মুখে সাহস ও কৌতুহলের দীপ্তি ফুটে উঠল—সেই সঙ্গে যেন লজ্জাও। মেয়েটি যেন আগে থেকে অনুমান করেছে—সে কি শুনবে এই রূপবান গ্রীক যুবকের মুখ থেকে।

হেলিওডোরাস বললে—ভদ্রে, আপনাকে আর একটিবার দেখব এই প্রার্থনা করেছিলাম দেবতার কাছে।

মেয়েটি রক্তিম মুখে চুপ করে রইল মাটির দিকে চেয়ে। কি দীপ্তিময়ী, মহিমময়ী মূর্তি ! নিবিড় কৃষ্ণ কেশপাশে সেদিনকার মতই রক্তজবা ও যূথীগুচ্ছ। গ্রীবার কি অদ্ভুত ভঙ্গি !

হেলিওডোরাস বললে—আপনাকে না দেখলে বাঁচব না। আমি এই তিন বৎসর উদ্‌ভ্রান্তের মত বেড়িয়েছি।

মেয়েটি প্রসন্নহাস্যে বললে—কি হবে দেখে বলুন।

দেবী যেন জাগ্রত হয়ে উঠেছেন—এই অদ্ভুত প্রসন্ন হাসির মধ্য দিয়ে অন্তর-শয্যা থেকে সদ্য জাগ্রতা প্রেমের ও করুণার দেবী যেন মূর্ত হয়ে উঠেছেন।

হেলিওডোরাস সহাস্যে বললে—শুধু দেখব দেবী, আমার হৃদয়ের সমস্ত অর্ঘ্য যদি কোন দিন—

—এই জন্যে যেতেন আপনি বাসুদেবের মন্দিরে ? ঠিক বলছেন ?

—মিথ্যা বলি নি। কত পূজো দিয়েছি পূজারীদের হাতে—আর—হেলিওডোরাস কুণ্ঠিত মুখে চুপ করে রইল।

—আর কি ?

—মনোবাসনা পূর্ণ হলে বাসুদেবকে মূল্যবান কিছু উপহার দেব—।

রাজকন্যার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। বাসুদেব ওর মূল্যবান উপহার

পাবার প্রত্যাশা করেন কিনা! এই বিদেশী যুবক বড় সরল। মায়া হয় ওর ওপর।

মুখে বললেন মৃদু হেসে—তারপর বাসুদেবকে ভুলে যাবেন বুঝি?

—জীবন থাকতে নয় দেব, আপনি আর বাসুদেব এক তারে গাঁথা রইলেন আমার হৃদয়ে। দুজনের কাউকে ভুলব না।

রাজকন্যা বললেন—একদিন আমরা বাসুদেবের মন্দিরে গিয়ে আপনাকে দেখি।

হেলিওডোরাস বললে—আমাকে?

—মন্দিরের সিংহদ্বারের কাছে আপনি একজন পূজারী ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি আমার সখীদের সঙ্গে মন্দিরে ঢুকছি—সুনেত্রা আমাকে দেখালে। সুনেত্রাকে ডাকি—

একটু পরে যে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন, তাকে প্রথম দিন হেলিওডোরাস এখানে দেখেছে।

সুনেত্রা এসেই হেসে বললে—আপনাকে আমরা কতদিন এখানে খোঁজ করেছি—আমার সখী—

রাজকন্যা তর্জ্জনী তুলে শাসনের ছলে লজ্জারুণ মুখে বললেন চুপ—সাবধান!

সুনেত্রা বললে—এখানে আর আসতেন না কেন? যুদ্ধে গিয়েছিলেন বুঝি?

—হ্যাঁ—কিন্তু ফিরে এসেও তো কতবার এসেছি ভদ্রে—রোজ রোজ তো আর পরের বাগানে আসতে পারি না?

সুনেত্রা ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে—রোজ রোজ কি আমরা আপনার সন্ধান করতাম নাকি? আপনি দেখছি বড় ধৃষ্ট—যান এখান থেকে আজ। জানেন এটা আমাদের সখীর মাতামহ সঞ্জয় দত্তের বাগান? নাতনীকে দিয়ে গিয়েছেন তিনি। এ শুধু আমার সখীর নিজস্ব বাগান—কার অনুমতি নিয়ে আপনি এখানে ঢুকেছেন জিগ্যেস করতে পারি কি?

রাজকন্যা সকুণ্ঠ প্রতিবাদের সুরে বললেন—ওকি সুনেত্রা!

পরে হাসিমুখে হেলিওডোরাসের দিকে চেয়ে বললেন—আমাদের হূণযুদ্ধের গল্প শোনাবেন?

৬

হায় দেবতা অ্যাপোলো বেলভেডিয়ার! প্রতিদিন চতুরশ্বযোজিত রথে সারা আকাশ পরিভ্রমন করে সন্ধ্যায় ফিরে আসেন নিজ গৃহে—আপনি দেখেন নি হেলিওডোরাসের দুঃখ—ডিওন-পুত্র হেলিওডোরাসের? আপনি কি এখন আবার দেখছেন না, কত দুপুরে, কত সুন্দর শরৎ ও শীতের অপরাহ্নে বিদিশার পূর্বতন মহামাত্য সঞ্জয়দত্তের প্রাচীন উদ্যানবাটিকায় দুটি প্রেমিক হৃদয়ের গোপন লীলা-খেলা, শুনছেন না তাদের আনন্দগুঞ্জন? মাধবী-পুষ্পমঞ্জরীর আড়ালে যার বিকাশ, উদ্যানবাটিকার অরণ্যচ্ছায়ায় যার ব্যাপ্তি—দুটি তরুণ হৃদয়ের সে সসংকোচ প্রেম, সে বিচ্ছেদকালীন ব্যাকুলতা—দেখেন নি এ সব? না দেখেছেন না দেখেছেন, হেলিওডোরাস আর আপনাকে চায় না। দুঃখের দিনে যিনি কৃপা করে তার মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন, সেই দেবতাই হেলিওডোরাসের একমাত্র উপাস্য। ভারতবর্ষের পবিত্র মৃত্তিকায় সেই দেবতার অপার করুণার এ ইতিহাস সে অক্ষয় করে রেখে যাবে—যদি গ্রীক রক্ত তার দেহে থাকে।

একদিন মালবিকা বললে—হেলিওডোরাস, বাবাকে বল—

—মহারাজ কি শুনবেন?

—তাহলেও তুমি বল—গুপ্তভাবে আমাদের এমন সাক্ষাৎ আর বেশিদিন চলবে না।

—আমিও তোমাকে চাই মালবিকা—আমারও চলবে না তোমাকে না পেলে—

—সব হয়ে যাবে বাসুদেবের কৃপায়। চল আজ দুজনে মন্দিরে যাই—তুমি একদিক থেকে আমি অন্যদিক থেকে। মানত করে আসি তাঁর কাছে। তাঁর কৃপায় সব সম্ভব।

হেলিওডোরাস ইতিমধ্যে রাজসভায় যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছিল নানাদিক থেকে। তক্ষশিলার প্রধান আমত্যের পুত্র সে—উভয় রাজ্যের মধ্যে একটা মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় হয়ে উঠেছে হেলিওডোরাসের রাজদূতরূপে উপস্থিতিতে তরুণ দলের সে একজন নেতা—তার সুঠাম দেহকান্তি ও পুরুষোচিত ক্রীড়া ও ব্যায়ামনৈপুণ্যের জন্য তরুণ নাগরিকগণ তাকে অত্যন্ত মানে। তার ওপর হেলিওডোরাসের খ্যাতি রটে গিয়েছিল যে, সে গ্রীক হলেও বাসুদেবের একজন ভক্ত।

নৃপতি ভাগভদ্র প্রথমে আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি হঠাৎ কেন এ বিবাহে সম্মতি দিলেন তা কেউ জানে না।

স্বয়ং মহারাণী পট্টদেবী কুমারললিতা তার খবর রাখেন।

সেদিন নিশীথরাত্রে রাজা ঘর্মাক্ত-কলেবরে পর্যঙ্ক থেকে ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে উঠলেন।

রাজ্ঞী ব্যস্তভাবে বললেন—কি হয়েছে গো, অমন করছ কেন?

—একটু জল দাও—উঃ কি ভীষণ! জল দাও—

রাজ্ঞী স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে জল দিয়ে বললেন—কি হয়েছে—কি হয়েছে?

নৃপতি এক দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। এক চণ্ডপুরুষ তাঁর কাছে এসে এক বিশাল শূল আস্ফালন করে হুংকার দিয়ে বলছেন—রে ভাগভদ্র, আমি কে চেন? তোমার বংশের কুলদেবতা। হেলিওডোরাসের সঙ্গে তোমার কন্যার বিবাহে যদি সম্মতি না দাও, তবে তোমার মালবরাজ্য এই শূলের আগায় উড়িয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে ফেলে দেব। ও আমার জন্মজন্মান্তরের ভক্ত। বলেই সেই চণ্ডপুরুষ কি ভীষণ হুংকার ছাড়লে!...শূলের অগ্রভাগ থেকে রক্ত অগ্নিশিখা যেন দাউ দাউ করে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল ঘরে ঘরে—উঃ, কি ভীষণ দুঃস্বপ্ন!

রাজ্ঞী বললেন—বেশ তো। হেলিওডোরাস সুন্দর ছেলেটি, তাকে আমি দেখেছি—মালবিকার সঙ্গে বড় সুন্দর মানাবে। তোমার মেয়েরও সম্পূর্ণ... ইচ্ছে—

—বল কি রাজ্ঞী! মেয়ে কি ওকে দেখেছে?

রাজ্ঞী হতাশার স্বরে হাত-দুটি শূন্যের দিকে ছুঁড়ে বললেন—নির্বোধ নিয়ে ঘর করা যায় তো অল্পবুদ্ধি নিয়ে ঘর করা চলে না—কথাতেই বলেছে। ওরা হল আজকালকার মেয়ে—আর কি আমাদের মত সেকাল আছে? কোন অমত ক'রো না। হেলিওডোরাস আমাদের ধর্ম গ্রহণ করবে বিয়ে হলেই, তুমি দেখো। আর ও-রকম আজকাল তো হচ্ছেই। তক্ষশিলায় আমার এক পিসতুত বোনের ননদের যে একজন গ্রীক তালুকদারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে—

অতএব হেলিওডোরাসের সঙ্গে মালবিকার বিবাহে বাধা রইল না।

পিতা ডিওন পত্রবাহকের হাতে লিখে পাঠালেন—খুব সুখের কথা বাবা, আমি তোমাকে এক পয়সা দিয়ে যেতে পারব না। নিজের আখের যাতে ভাল হয় তাই কর। অর্থই গান্ধারের আপেল, কপিশার সুরা এবং কাশ্মীরী শাল। রাজকন্যাকে বিবাহ কর, ক্ষতি নেই, আখের দেখে নিও।

হেলিওডোরাসের সঙ্গে মালবিকার বিবাহের কয়েকদিন পরে রাত্রে গভীর সুষুপ্তির মধ্যে হেলিওডোরাস দেখলে সেই নবীন সুন্দর কিশোর তাকে ঘুমের মধ্যে ঠেলে দিয়ে আবদারের সুরে অভিমানে রাঙা ঠোঁট ফুলিয়ে বলছে—আমার কথা মনে আছে? আমায় যা দেবে—কবে দেবে? মনে থাকবে?

হেলিওডোরাস চিনলে—দু বৎসর পূর্বে মহামাত্য সঞ্জয়দত্তের উদ্যানে এই কিশোরকে সে স্বপ্নে দেখেছিল—হূণ-তাঁবুতে রাতের অন্ধকারে একেই সে স্বপ্নে দেখে। একদিন মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহের মুখ দেখে তার মনে হয়েছিল কোথায় যেন এ মুখ সে দেখেছে।—আজ সে বুঝেছে?

হেলিওডোরাস বিস্ময়ে ও আনন্দে শিউরে উঠল ঘুমের মধ্যে। ইনিই সেই পরম করুণাময় বাসুদেব। জয় হোক তাঁর। জয় হোক স্বপ্ন-বাসুদেবের! হেলিওডোরাস তোমাকে ভুলবে না।

হেলিওডোরাস ভোলেও নি।

দু হাজার বছর মহাকালের বীথিপথের অস্পষ্ট কুজ্‌ঝটিকায় কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। বিদিশা নগরী ও তার বাসুদেবমন্দির আজ অতীতের ভগ্নস্তূপ—কিন্তু তার প্রাঙ্গণতলে পরম ভাগবত হেলিওডোরাসের বিশাল গরুড়স্তম্ভ ভক্ত ও ভগবানের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।...ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।...

গল্প নয়, সত্য ঘটনা'।

যাঁর মুখে আমার এ গল্প শোনা, তাঁদের পরিবারবর্গ কর্ম উপলক্ষ্যে পূর্ব আফ্রিকার নাইরোবিশহরে অনেক দিন থেকেই বাস করেছিলেন, ও-দেশের নানা গল্প আমি বন্ধুটির মুখে সেদিন বসে বসে শুনেছিলাম।

সকালবেলা, পাহাড়ী-পথে একা বেড়াতে বার হয়েচি, একখানা জিপগাড়ি দেখি স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসচে, আমার বন্ধু প্রণববাবু গাড়িটি চালাচ্ছেন। অনেক দিন দেখি নি প্রণববাবুকে—তিনি কবে এখানে এসেচেন তাও জানি না।

আমাদের এদিকের বাজারে মালিয়া মোহাস্তির বড় গোলদারি দোকান। তার কাছে জিগ্যেস করে জানলুম, প্রণববাবু আজ দু-মাস ধরে 'হোমস্ডেল' কুঠিতে বাস করচেন।

মিনিট পঁয়ত্রিশ পরে (কারণ আমাকে পায়ে হেঁটে এই পথটা যেতে হোল তো) প্রণববাবু ও আমি দু-জনে বসে গল্প করছিলাম ও চা পান করছিলাম। অনেক দিন পরে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ এবং দু-জনেই খুব খুশি হয়েছিলাম এই রকম হঠাৎ দেখা হওয়ায়।

—বাড়িতে বলে আসিনি, স্নান হয়নি—

—সব ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। তা হোলে থাকবেন তো, একটা খুব ভাল গল্প বলবো খেয়ে-দেয়ে ঐ বুড়ো হর্তুকিতলার ছায়ায় বসে। কেমন? ও লাখপতিয়া, এখানে এস—এই বাবুর বাড়ি গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হবে।

—এখানে কতদিন আর থাকবেন?

—বুধবারে চলে যাবো। আজ দেখা হওয়াতে বড় ভাল হোল। কতদিন দেখা হবে না আবার কে জানে।

—অথচ আমারা কলকাতাতেই থাকি, ঠিকানা না জানাতেই—

—মাংস খান তো?

—খুব।

—নিষিদ্ধ পক্ষীর?

—খুব।

মধ্যাহ্ন ভোজন খুব ভালই হোল।

এর পর আমরা সেই হর্তুকিতলায় গিয়ে বসি। সামনে পশ্চিম দিকে নদীর ওপারে শৈলশ্রেণী, ঝির-ঝির বাতাস বইচে নদীর দিক থেকে। একদল সাদা বক পাহাড়শ্রেণীকে পেছনে ফেলে মেঘের তলা দিয়ে উড়ে আসচে এদিকে।

প্রণববাবু বললেন—আপনি আমার জীবনের কথা কিছু কিছু সকালবেলা শুনেছেন। আজ একটি আসাধারণ ঘটনার কথা বলবো। এ আমার নিজের চোখে দেখা বলেই আপনার কাছে বলবার ইচ্ছেটা বড প্রবল হয়েচে।

আপনি জানেন, আমার বাবা ও কাকা উগাণ্ডা রেলপথ তৈরির সময় থেকে ওদেশে ছিলেন। আমার এক কাকা বেলজিয়ান কঙ্গোতে কমলালেবুর আবাদ করেন, আমার বাবার অনেক আগে থেকে তিনি আছেন সে দেশে, তাঁর চার-পাঁচটি ছেলে big game hunter। লোহার মত শরীর, অনর্গত সোহালি ভাষা বলতে পারে সে দেশের নেটিভদের মতই। এসব কথা গল্পের মত শোনাচ্ছে না কি? কিন্তু ঘর-বোলা লোকের কাছে হয়তো এ সব যতই গল্প বলে মনে হোক, আমরা জানি বাঙলা দেশের লোক কত দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে। পৈতৃক বাসভূমি বলাগড়ের কাছে সিমুলিয়া। দশ বছর বয়সে আমি প্রথম নাইরোবি যাই। ভিক্টোরিয়া নয়ান্জা হ্রদের তীরবর্তী কাপমালা নামক ছোট শহরে সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে একজন ভদ্রলোক স্কুল-মাষ্টারী করতেন সে সময়—আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে সময়ে তিনি বিবাহ করেন নি, ছুটি-ছাটাতে নাইরোবিতে আমাদের বাসায় এসে বসতেন। তিনি দিনকতক আমায় ইংরেজি পড়াবার ভারও নিয়েছিলেন।

সে সময়ে ওদেশে জিনিসপত্র খুব সস্তা ছিল—মাংস, দুধ, মাখন, কপি যথেষ্ট পাওয়া যেত। সমগ্র নাইরোবিতে তিন ঘর বাঙালী পরিবার ছিল। সকলেই উগাণ্ডা রেলপথের কর্মচারী। আর একজন ছিল খ্রীষ্টান, ধর্মপ্রচার করবার কাজে কি এক মিশন কর্তৃক প্রেরিত, মাঝে মাঝে নাইরোবিতে থাকতো, মাঝে মাঝে দূর পল্লী অঞ্চলে যেতো।

আমি পনেরো বৎসর একাদিক্রমে নাইরোবিতে ছিলাম বাবা-মার সঙ্গে। ওখানকার জীবন খুব ভালই কেটেছিল। জীবনযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ, জিনিসপত্র ছিল সস্তা, কত নতুন সপ্ন তখন দেখেছি অল্প বয়সে। একবার আমার খুড়তুতো ভাই অতুল এসে বেলজিয়ান কঙ্গোর জীবনের এক অপূর্ব ছবি আমার চোখের সামনে ধরলে, সেই আমার তরুণ বয়সে। বাবাকে বললাম, কাকার

কমলালেবুর আবাদে গিয়ে কাজ করবো, হাতী, সিংহ শিকার করবো, গল্পের বইয়ের নায়কের মত দুর্দান্ত এডভেঞ্চারপূর্ণ মুক্ত জীবনানন্দ আস্বাদ করবো।

আমি বললায়—তখন তোমার বয়েস কত?

—সতেরো বছর।

—লেখাপড়া?

—কামপালার সেই মাস্টার সীতানাথ বাঁড়ুজ্যে ইংরিজি পড়াতেন আর স্টেশন মাস্টার ডসন সাহেবের মেয়ের কাছে অঙ্ক কষতাম। আমায় বড় ভালবাসতেন ডসন সাহেবের স্ত্রী। তাঁর এক ছেলে ছিল প্রায় আমার বয়সী। একটা এয়ার-গান নিয়ে তার সঙ্গে খেলা করতাম। শিকারের ঝোঁক ছিল আমাদের দু-জনেরই। নাইরোবির বাইরে তখন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কণ্টক ও মিমোসা গাছের বনে জেব্রা, সিংহ, জিরাফ, উটপাখীর দল বিচরণ করতো এখনও করে। আমরা কতবার এই সব অঞ্চলে যেতাম বন্য জন্তু শিকারের জন্যে। একবার একদল সিংহের সামনে পড়েছিলাম—তার মধ্যে এক গর্ভবতী সিংহী ছিল, সে আমাদের প্রায় চোখের সামনে একটা ঝোপের আড়ালে তিন-চারটে শাবক প্রসব করেছিলো।

—সুতরাং লেখাপড়া সেখানে তেমন হয় নি।

—আপনি ডাক্তার হয়েছিলেন কোথায় পড়াশুনা কোরে?

—সে অনেক পরে। কলকাতায় ডাক্তারি পড়ি।

—কত বছর বয়সে কলকাতায় আসেন?

—পঁচিশ বছর বয়সে।

—পঁচিশ বছর বয়সে ডাক্তারি পড়লেন? পাস করেছিলেন?

—হোমিওপ্যাথিক কলেজে পড়ি, মাত্র তিন বছরের কোর্স ছিল তখন। তাতেই যথেষ্ট রোজগার করেছি বা এখনো করছি।

—ভাগ্যটা ভালো আপনার।

—আমি প্রথম প্র্যাকটিস করি ডার-এস-সালামে, তারপর মোম্বাসায়। ওখান থেকে বোম্বে। বোম্বে থেকে কলকাতায় এলাম। পয়সা যা কিছু বেশি রোজগার করি, সবই ডার-এস-সালামে। আবার ইচ্ছে ছিল, সেখানে যাই, কিন্তু সেখানে আর সুবিধে হবে না। ম্যালান গবর্ণমেণ্টের আওতায় ও উৎসাহে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েচে, তাতে ভারতবাসীদের আর সেখানে হয়তো সুবিধে হবে না। ওরাই বেশি ডাকতো

—কারা ?

—আফ্রিকানরা। ওদের মধ্যে অনেকে ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করেছিল সে সময়। অনেক মেয়ে ভারতীয় স্বামী গ্রহণ করেছিল। আস্তে আস্তে উভয় সমাজে এ প্রথাটা চালু হচ্ছিল।

—এইবার আসল গল্পটা বলুন।

—বেলা গিয়েচে। বাকিটুকু অথবা আসলটুকু অতি অল্প কিন্তু ভারি অদ্ভুত। শুনলেই তো ফুরিয়ে যাবে। তার চেয়ে চলুন চা খাওয়া সেরে নেওয়া যাক।

চা খাওয়া হলো খুব ভাল। ও-বেলাও যাতে আমি থাকি, সেজন্যে প্রণববাবু ও তাঁর স্ত্রী পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।—এবেলা নাকি ভালো করে খাওয়ানো হোল না।—আমার খাওয়ার নাকি খুবই কষ্ট হোল।

সন্ধ্যার পর আধ-জ্যোৎস্না আধ-অন্ধকারের মধ্যে প্রণববাবু আবার গল্প শুরু করলেন সেই হর্তুকিতলায় বসে।

এইবার যে কথাটা বলবো, সেটা ভালো করে বুঝতে হোলে আমার মামার বাড়ির ইতিহাস আপনার কিছু জানা দরকার। আমার দাদামশায় গোবিন্দ ঘোষাল সিপাই বিদ্রোহের সময় ফয়জাবাদ মিলিটারি একাউণ্টেণ্টে কাজ করতেন। তাঁর দুই বিবাহ, আমার দিদিমাকে তিনি বিবাহ করেন যখন, তখন তাঁর বড় ছেলের বয়েস ত্রিশ বছর। আমার মা তাঁর শেষ বয়সের সন্তান; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমার সে দিদিমা সধবা অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। আমার মাকে মানুষ করে বামা বলে এক পুরোনো ঝি, আমার মামার বাড়ির। আমার দাদামশায় তখন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে হুগলী জেলায় নিজের গ্রামে এসে ব[illegible]চেন।

বামা মাকে ঠিক নিজের সন্তানের মত মানুষ করেছিল। বাইরে কোথাও গেলে সন্ধ্যার পর পিছু-পিছু যেতো মার বড় বয়সেও।

বামা কোথাও যেতো না, নিজের দেশ বর্ধমান জেলার যে ক্ষুদ্র গ্রামটিতে তার পৈতৃক ভিটে, মার ভার নেওয়ার পর থেকে সে কখনো আর গ্রামে পদার্পণ করে নি।

আমার মা যখন বিয়ের কনে সেজে আমাদের বাড়ি এসেছিলেন বামা তখন মার সঙ্গে এ বাড়ি চলে আসে এবং মাঝে-মাঝে দেশে চলে গেলেও প্রায়ই তার এই জামাই-বাড়ি এসেই থাকতো।

মা বলতেন—এখানেই থাক না কেন বামা ?

সে বলতো—না খেঁদি (মার ডাক নাম), জামাই-বাড়ি কি থাকতে আছে ? লজ্জার কথা।

সে কিন্তু মাকে ছেড়ে বেশিদিন থাকতে পারতো না—কিছু দিন পর-পর প্রায়ই আসতো। আসবাব সময়, মা যা খেতে ভালবাসতেন ছেলেবেলায়—নারকোল নাড়ু, চিঁড়ে, কলা, এই সব যোগাড় করে নিয়ে আসতো। শুধুহাতে কখনো আসে নি।

বামা কিন্তু মারা যায় আমার মামার বাড়িতেই, হঠাৎ কি একটা অসুখ হয়ে। মার সঙ্গে দেখা হয়নি। মার সেজন্যে খুব দুঃখ হয়েছিল। আমাদের কাছে পর্যন্ত বামার নাম করতেন আর চোখের জল ফেলতেন।

আমি বললাম—আপনি বামাকে দেখেছিলেন ?

—না, আমার দাদা দেখেছিলেন, তখন দাদার ছ-সাত বছর বয়েস।

— তারপর ?

—তারপর কর্ম উপলক্ষে বাবা-মা উগাণ্ডা চলে গেলেন এবং সে দেশেই বাস করতে লাগলেন। আমরাও গেলাম, ক্রমে সে দেশে। বাবার চাকরির উন্নতি হোল। আমার এক বোনের বিয়ে হোল মোম্বাসায়, সেখানে হুগলী জেলার বন্দীপুরের রামতারণ চক্রবর্তী শিপিং কোম্পানীর অফিসে চাকরি করতেন, তাঁব বড ছেলে শিবনাথ আমার ভগ্নীপতি।

পরের বৎসর আমার মা মারা গেলেন।

আমার বোনের বিয়ের আগে থেকেই তিনি হৃদরোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন, একদিন সন্ধ্যার পর আমাদেব সঙ্গে গল্প করতে করতে বললেন শরীরটা কেমন করচে।

তারপর ঘরের মধ্যে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পডলেন, ডাক্তার আসবার আগেই মারা গেলেন।

এইবার আসল কথাটা এসে গিয়েছে।

মা তো মারা গেলেন সন্ধ্যার সময়। অনেক রাতে লোকজন যোগাড় হোল। যে ক'টি বাঙালী পরিবার নাইরোবিতে সে সময় থাকতো, তাদের সকলের বাড়ি থেকেই মেয়েরা ও পুরুষেরা এলেন সে রাতে আমাদের বাড়ি খবর পেয়ে। রাত এগারোটার পর আমরা শ্মশানে মৃতদেহ নিয়ে গেলাম।

নাইরোবির বাইরে শহর থেকে প্রায় একক্রোশ দূরে অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায় নদীর ধারে শ্মশান। স্থানটা বড় নির্জন ও ঘাসের জঙ্গলে ভরা। রাত্রে এ-সব স্থানে সিংহের ভয় ছিল খুব বেশি। সিংহের উপদ্রবে রাতে কেউ বড় একটা মড়া নিয়ে যেতে সাহস করতো না শ্মশানে। আমাদের সঙ্গে অনেক লোক ছিল। আলো জেলে ও বন্দুক নিয়ে আমাদের দল মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল।

মৃতদেহ চিতায় চড়ানো হয়েচে, দাদা মুখাগ্নি করলেন, আমরা সবাই চিতার অদূরে বসে আছি। এমন সময় আমার ছোট ভাই দেবু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ঐ দেখো, ও কে দাদা!

আমি চেয়ে দেখলাম। শ্মশানের দক্ষিণ দিকে একটা গাছতলায় একজন ভারতীয়া বৃদ্ধা মহিলা চুপ করে বসে একদৃষ্টে চিতার দিকে চেয়ে আছে। পরনে তার আধময়লা থান কাপড়।

বাবা সেদিকে চেয়ে বলে উঠলেন—সর্বনাশ! ও যে বামা ঝি!

দাদা বললেন—হ্যাঁ বাবা, বামা দিদিমার মত দেখতে বটে।

বাবা বললেন—তোর মনে আছে?

—একটু একটু মনে পড়ে বাবা।

আমরা সবাই অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলাম। সত্যি, এই গভীর রাতে এই দুর্গম শ্বাপদসঙ্কুল শ্মশান-ভূমিতে কোন বাঙালীর মেয়ে আসবার কথা কেউ কল্পনা করতে পারে না। আমরা কেউ তাকে চিনিও না। কেবল চেনেন বাবা এবং সামান্য কিছু চেনে দাদা। তাদের সাক্ষ্য সেখানে সেদিন গভীর এক তত্ত্বের অবতারণা করলে। কোথায় বা চিতা, কার বা মৃতদেহ, মৃত্যুই বা কার?

বৃক্ষতলে উপবিষ্টা নারীমূর্তি কিন্তু আমাদের দিকে লক্ষ্য করে নি। সে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, উদাসীনভাবে একদৃষ্টে জলন্ত চিতার দিকে চেয়ে বসে ছিল। এখনো সে ছবি আমি দেখছি চোখের সামনে। চিরকাল আঁকা থাকবে সে ছবি আমার মনের পটে।

হুগলী জেলার এক অখ্যাত গ্রাম থেকে মৃত্যুঞ্জয়ী স্নেহের টানে আজ বিশ বছর পরে বামা ঝি চলে এল পূর্ব আফ্রিকার নাইরোবির শ্মশান-ভূমিতে।

বেশিক্ষণ আমরা দেখতে পাই নি। সবসুদ্ধ বোধ হয় মিনিট পাঁচ-ছয়

হবে বামা ঝিকে আমরা দেখতে পেয়েছিলুম সবাই মিলে। তার পরই মিলিয়ে গেল সে মূর্তি।

আমরা বেশি কিছু কথা বলিনি এর পর। দাহকার্য শেষ করতে সকাল হয়ে গেল। নদীতে স্নান করে আমরা বাড়ি ফিরে এলুম তখন বেলা সাতটা সাড়ে সাতটা। ওই নদীতীরেই আমার মার দশপিণ্ড দেওয়া হয় এর দশদিন পরে এবং মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন রেল অফিসের অবিনাশ গাঙ্গুলী, নাইরোবির বাঙালীদের মোটামুটি বিয়ে পৈতে ষষ্ঠীপূজো তিনিই করতেন। তাঁর নামই ছিল আমাদের মধ্যে 'পুরুত-কাকা'।

নদীর ওপারে শৈলশ্রেণী সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢেকে গেল।

প্রবন্ধ-আলোচনা

আমার লেখা

আমি কেমন করে লেখক হলাম, এ আমার জীবনের, আমার নিজের কাছেই একটা অদ্ভুত ঘটনা। অবশ্য হয়তো একথা ঠিক, নিজের জীবনের অতি তুচ্ছতম অভিজ্ঞতাও নিজের কাছে অতি অপূর্ব। তা যদি না হত, তবে জগতে লেখক জাতটারই সৃষ্টি হত না। নিজের অভিজ্ঞতাতে এরা মুগ্ধ হয়ে যায়—আকাশ প্রতিদিনের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে কত কল্পলোক রচনা করছে যুগে যুগে—তারই তলে কত শত শতাব্দী ধরে মানুষ নানা তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজের দিন কাটিয়ে চলেছে, মানুষের জন্ম-মৃত্যু, আশা-নৈরাশ্য, হর্ষ-বিষাদ, ঋতুর পরিবর্তন, বনপুষ্পের আবির্ভাব ও তিরোভাব—কত ছোট-বড় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে পৃথিবীতে—কে এসব দেখে, এসব দেখে মুগ্ধ হয়?

এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাদের চোখে কল্পনা সব সময়েই মোহ-অঞ্জন মাখিয়ে দিয়ে রেখেছে। অতি সাধারণ পাখীর অতি সাধারণ সুরও তাদের মনে আনন্দের ঢেউ তোলে, অস্তদিগন্তের রক্তমেঘস্তূপ স্বপ্ন জাগায়, আবার হয়ত তারা অতি দুঃখে ভেঙে পড়ে। এরাই হয় লেখক, কবি, সাহিত্যিক। এরা জীবনের সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক। এক যুগের দুঃখবেদনা আশা-আনন্দ অন্য যুগে পৌঁছে দিয়ে যায়।

আমার জীবনের সেই অভিজ্ঞতা তাই চিরদিনই আমার কাছে অভিনব, অমূল্য, দুর্লভ হয়ে রইল। যে ঘটনা আমার জীবনের স্রোতকে সম্পূর্ণ অন্য দিকে বাঁক ফিরিয়ে দিয়েছে—আমার জীবনে তার মূল্য অনেকখানি।

১৯২২ সাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নিয়ে ডায়মণ্ডহারবার লাইনে একটা পল্লীগ্রামের হাইস্কুলে মাস্টারি চাকুরি নিয়ে গেলুম আষাঢ় মাসে।

বর্ষাকাল, নতুন জায়গায় গিয়েছি। অপরিচিতের মহলে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করছি। বৈঠকখানা ঘরের সামনে ছোট্ট একটু ঢাকা বারান্দাতে একলা বসে সামনে সদর রাস্তার দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় একটি ষোল-সতের বছর বয়সের ছেলেকে একখানা বই হাতে যেতে দেখে তাকে ডাকলাম কাছে। আমার উদ্দেশ্য, তার হাতে কি বই দেখব এবং যদি সম্ভব হয় পড়বার জন্যে চেয়ে নেব একদিনের জন্যে।

বইখানা দেখেছিলাম, একখানা উপন্যাস। তার কাছে চাইতে সে বললে, এ লাইব্রেরির বই, আজ ফেরত দেওয়ার দিন। আপনাকে তো দিতে পারছি নে, তবে লাইব্রেরি থেকে বই বদলে এনে দেব এখন।

--লাইব্রেরি আছে এখানে?

—বেশ ভাল লাইব্রেরি, অনেক বই। দু' আনা চাঁদা।

—আচ্ছা চাঁদা দেব, আমায় বই এনে দিও।

ছোকরা চলে গেল এবং ফেরবার পথে আমাকে একখানা বই দিয়েও গেল। আমি তাকে বললাম—তোমার নামটি কি হে? সে বললে—আমার নাম পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী, কিন্তু এ গ্রামে আমাকে সবাই বালক-কবি বলে জানে।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম—বালক-কবি বলে কেন? কবিতা-টবিতা লেখ নাকি?

ছেলেটি উৎসাহের সঙ্গে বললে—লিখি বই কি। না লিখলে কি আমাকে বালক-কবি নাম দিয়েচে? আচ্ছা কাল এনে দেখাব আপনাকে।

পরদিন সে সকাল বেলাতেই এসে হাজির হল। সঙ্গে একখানা ছাপানো গ্রাম্য মাসিক পত্রিকা গোছের। আমাকে দেখিয়ে বললে—এই দেখুন, এই কাগজখানা আমাদের গাঁ থেকে বেরোয়। এর নাম 'বিশ্ব'। এই দেখুন প্রথমেই 'মানুষ' বলে কবিতাটি আমার। এই আমার নাম ছাপার অক্ষরে লেখা আছে কবিতার ওপরে—বলেই ছোকরা সগর্বে কাগজখানা আমার নাকের কাছে ধরে নিজের নামটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। হ্যাঁ সত্যিই—লেখা আছে বটে, কবি পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী। তাহলে তো নিতান্ত মিথ্যা বলে নি দেখছি।

কবিতাটি সেই আমায় পড়ে শোনালে। বিশ্বের মধ্যে মানুষের স্থান খুব বড়—ইত্যাদি কথা নানা ছাঁদে তার মধ্যে বলা হয়েছে।

অবশ্য কাগজখানা দেখে আমার খুব ভক্তি হল না। স্টেশনের কাছে একটা ছোট প্রেস আছে এখানে, সেই প্রেসেই ছাপানো—অতি পাতলা জিল-জিলে কাগজ। পত্রিকাখানাকে 'মাসিক' 'পাক্ষিক' ইত্যাদি না বলে 'ঐকিক' বললেই এর স্বরূপ ঠিক বোঝানো হয়। অর্থাৎ যে শ্রেণীর পত্রিকা গ্রামের উৎসাহী লেখা-বাতিক-গ্রস্ত ছেলে-ছোকরার দল চাঁদা তুলে একটিবার মাত্র বার করে, কিন্তু পরের বারে উৎসাহ মন্দীভূত হওয়ার দরুন আশানুরূপ চাঁদা না ওঠাতে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়—এ সেই শ্রেণীর পত্রিকা।

তবু আমার ঈর্ষা না হয়ে পারল না। আমি লিখি না, বা লেখার কথা কখনও চিন্তাও করি না। অথচ এতটুকু ছেলে—এর নাম দিব্যি ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে গেল! এর ওপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা হল, মনে ভাবলাম, বেশ ছোকরা তো। অক্ষর মিলিয়ে মিলিয়ে কেমন কবিতা লিখেছে! সাহিত্যের সমঝদারিত্ব তার মধ্যে ছিল তা আমি জানি। তখনকার আমলের একজন বিশেষ লেখকের বই না থাকলে পল্লীগ্রামের কোন লাইব্রেরি চলত না। সেই লেখকের এক একখানা বই-এর তিন-চার কপি পর্যন্ত রাখতে হত কোন কোন বড় লাইব্রেরিতে।

ছেলেটি বলত—ওসব ট্র্যাশ-ট্র্যাশ। দেখবেন ওসব টিকবে না।

এক এক দিন পাঁচুগোপাল আমাকে নিয়ে গ্রামের বাইরে মাঠে বেড়াতে যেত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চোখও তার বেশ ছিল—মাঝে মাঝে মুখে মুখে কবিতা তৈরি করে আমাকে শোনাত। অনেকগুলো কবিতা হলে পর একটা কবিতার বই ছাপাবে এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করত। সেই সময় কলকাতার কোনও 'পাবলিশিং হাউস' ছয়-আনা গ্রন্থাবলী প্রকাশ শুরু করে দিল—তার প্রথম বই লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের বইখানি স্থানীয় লাইব্রেরি থেকে পাঁচুগোপাল আমায় এনে দিয়ে বললে—"এ বই নিতে ভিড় নেই। নতুন এসেছে, এক-আধ জন নিয়েছিল, কালই ফেরত দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু দেখুন গে যান অমুকের বই-এর জন্যে কি যে মারামারি। ডিটেকটিভ উপন্যাস না রাখলে লাইব্রেরি উঠে যাবে। কেউ চাঁদা দেবে না।" পরের মাসে আর একখানি বই বেরুল। সেখানা আমার কাছে নিয়ে এসে সে বললে—"আমি একটা কথা ভাবছি, আসুন আপনাতে আমাতে এই রকম উপন্যাস সিরিজ বের করা যাক। খুব বিক্রি হবে, আর একটা নামও থেকে যাবে। আপনি যদি ভরসা দেন, আমি উঠে পড়ে লাগি।" আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম—"তুমি আর আমি দু'জনে মিলে বই-এর কারবার করব, এ কখনও সম্ভব? এ ব্যবসার আমরা কিই বা জানি? তা ছাড়া, বই লিখবেই বা কে? এতে লেখকদের পারিশ্রমিক দিতে হবে, সে পয়সাই বা দেবে কে?" সে হেসে বললে—"বাঃ তা কেন, বই লিখবেন আপনি, আমিও দু-একখানা লিখব। পরকে টাকা দিতে যাব কেন।"

বাংলা সাহিত্যকে ভালবাসতাম বটে, কিন্তু নিজে কলম ধরে বই লিখব এ ছিল সম্পূর্ণ দুরাশা আমার কাছে। অবিশ্যি পাঠ্যাবস্থায় অন্য অনেক

ছাত্রের মত কলেজ ম্যাগাজিনে দু-একটা প্রবন্ধ, এক-আধটা কবিতা যে না লিখেছি তা নয়, বা প্রতিবেশীর অনুরোধে বিবাহের প্রীতি-উপহারের কবিতা যে দু-পাঁচটা না লিখেছিলাম তাও নয়—কিন্তু সে কে না লিখে থাকে?

সুতরাং আমি তাকে বললাম—"লেখা কি ছেলেখেলা হে যে কলম নিয়ে বসলেই হল? ওসব খামখেয়ালি ছাড়। আমি কখনও লিখি নি, লিখতে পারবও না। তুমি হয়ত পারবে—আমার দ্বারা ওসব হবে না।"

সে বললে—"খুব হবে। আপনি যখন বি-এ পাস, তখন আপনার কাছে এমন কিছু কঠিন হবে না। একটু চেষ্টা করুন তাহলেই হয়ে যাবে।" তখন বয়েস অল্প, বুদ্ধিসুদ্ধি পাকে নি, তবুও আমার মনে হল, বি-এ পাস তো অনেকেই করে, তাদের মধ্যে সকলেই লেখক হয় না কেন? অথচ বি-এ পাস করা লোকদের ওপর পাঁচুগোপালের এই অহেতুক শ্রদ্ধা ভেঙে দিতেও মন চাইল না। এ নিয়ে কোনও তর্ক আমি আর তার সঙ্গে করি নি।

কিন্তু করলেই ভাল হত, কারণ এর ফল হয়ে দাঁড়াল বিপরীত। দিন দশেক পরে একদিন স্কুলে গিয়ে দেখি সেখানে নোটিশ-বোর্ডে, দেওয়ালের গায়ে, নারকেল গাছের গুঁড়িতে সর্বত্র ছাপানো কাগজ টাঙানো—তাতে লেখা আছে,—বাহির হইল! বাহির হইল!! বাহির হইল!!! এক টাকা মূল্যের গ্রন্থমালার প্রথম উপন্যাস!

লেখকের নামের স্থানে আমার নাম দেখলাম।

আমার তো চক্ষুস্থির। এ নিশ্চয় সেই পাঁচুগোপালের কীর্তি। এমন ছেলেমানুষি সে করে বসবে জানলে কি তার সঙ্গে মিশি! বিপদের ওপর বিপদ, স্কুলে ঢুকতেই শিক্ষক ছাত্রবৃন্দ সবাই জিজ্ঞেস করে,—"আপনি লেখক তা তো এতদিন জানতাম না মশাই? বেশ বেশ! তা বইখানা কি বেরিয়েছে নাকি? আমাদের একবার দেখিয়ে যাবেন।" হেডমাস্টার ডেকে বললেন, তাঁর স্কুল লাইব্রেরিতে একখানা বই দিতে হবে। সকলের নানারূপ সকৌতূহল প্রশ্ন এড়িয়ে চলি সারাদিন—কবে থেকে আমি লিখছি, আর আর কি বই আছে, ইত্যাদি। স্কুলের ছুটির পরে বাইরে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে।

তাকে খুঁজে বার করলাম বাসায় এসে। দস্তুরমত তিরস্কার করলাম তাকে, এ তার কি কাণ্ড! কথার কথা একবার একটা হয়েছিল বলে একেবারে নাম ছাপিয়ে এ রকমভাবে বার করে, লোকে কি ভাবে!

সে নির্বাক হয়ে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললে—"তাতে কি হয়েছে? আপনি তো এক রকম রাজিই হয়েছেন লিখতে। লিখুন না কেন।" আমি বললাম—"বেশ ছেলে বটে তুমি! কোথায় কি তার ঠিক নেই, তুমি নাম ছাপিয়ে দিলে কি বলে, আর দিলে দিলে একেবারে স্কুলের দেওয়ালে, নোটিশ বোর্ডে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছ, এ কেমন কাণ্ড? নামই বা পেলে কোথায়? কে তোমাকে বলেছিল ও নামে আমি কিছু লিখেছি বা লিখব?"

যাক—পাঁচুগোপাল তো চলে গেল হাসতে হাসতে। এদিকে প্রতিদিন স্কুলে গিয়ে সকলের প্রশ্নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হল—বই বেরুচ্চে কবে? কত দেরি আছে আর বই বেরুবার?—মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম। সে যা ছেলেমানুষি করে ফেলেছে তার আর চারা নেই। আমি এখন নিজের মান বজায় রাখি কেমন করে? লোকের অত্যাচারের চোটে তো অস্থির হয়ে পড়তে হয়েচে।

সাত-পাঁচ ভেবে একদিন স্থির করলাম—এক কাজ করা যাক। সে একটাকা সিরিজের বই কোনদিনই বের করতে পারবে না। ওর টাকা কোথায় যে বই ছাপাবে? বরং আমি একখানা খাতায় যা হয় একটা কিছু লিখে রাখি—লোকে যদি দেখতে চায়, খাতাখানা দেখিয়ে বলা যাবে, আমার তো লেখাই রয়েছে, ছাপা না হলে আমি কি করব। কিন্তু লিখি কি? জীবনে কখনও গল্প লিখি নি, কি করে লিখতে হয় তাও জানা নেই। কি ভাবে প্লট যোগাড় করে, কি কৌশলে তা থেকে গল্প ফাঁদে—কে বলে দেবে? প্লটই বা পাই কোথায়? আকাশপাতাল ভাবি প্রতিদিন, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারি নে। গল্প লেখার চেষ্টা কোনদিন করি নি। পাঠ্যাবস্থায় স্থরেন বাঁড়ুজ্যে ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনে সাধ হত, লেখক হতে পারি আর না পারি, একজন বড় বক্তা হতে হবেই।

কিন্তু লেখক হবার কোন আগ্রহই কোনদিন ছিল না, সে চেষ্টাও করি নি। কাজেই প্রথমে মুশকিলে পড়ে গেলাম। সাত-পাঁচ ভেবে প্লট সংগ্রহ আর করতে পারি না কিছুতেই। মন তখন বিশ্লেষণমুখী অভিব্যক্তির পথ খুঁজে পায় নি। সব কিছুতেই সন্দেহ, সব কিছুতেই ভয়।

অবশেষে একদিন এক ঘটনা থেকে মনে একটা ছোট গল্পের উপাদান দানা বাঁধল। সেই পল্লীগ্রামের একটি ছায়াবহুল নিভৃত পথ দিয়ে শরতের

পরিপূর্ণ আলো ও অজস্র বিহঙ্গকাকলীর মধ্যে প্রতিদিন স্কুলে যাই, আর একটি গ্রাম্য বধূকে দেখি পথিপার্শ্বের একটি পুকুর থেকে জল নিয়ে কলসী কক্ষে প্রতিদিন স্নান করে ফেরেন। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়—কিন্তু দেখা ওই পর্যন্ত। তাঁর পরিচয় আমার অজ্ঞাত এবং বোধ হয় অজ্ঞাত বলেই একটি রহস্যময়ী মূর্তিতে তিনি আমার মানসপটে একটা সাময়িক রেখা অঙ্কিত করেছিলেন। মনে মনে ভাবলাম এই প্রতিদিনের দেখা অথচ সম্পূর্ণ অপরিচিত বধূটিকে কেন্দ্র করে একটি গল্প আরম্ভ করা যাক তো, কি হয় দেখি! গল্প শেষ করে সেই গ্রামের দু-এক জনকে পড়ে শোনালাম—পাঁচুকেও। কেউ বলে ভাল হয়েছে, কেউ বললে মন্দ হয় নি। আমার একটি বন্ধুকে কলকাতা থেকে নিমন্ত্রণ করে গল্পটি শুনিয়ে দিলাম। সেও বললে ভাল হয়েছে। আমি তখন একেবারে কাঁচা লেখক; নিজের ক্ষমতার ওপর কোন বিশ্বাস আদৌ জন্মায় নি। যে আত্মপ্রত্যয় লেখকের একটি বড় পুঁজি, আমি তখন তা থেকে বহু দূরে, সুতরাং অপরের মতামতের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে উপায় কি। আমার কলকাতার বন্ধুটির সমঝদারিত্বের ওপর আমার শ্রদ্ধা ছিল—তার মত শুনে খুশি হলাম।

পাড়াগাঁয়ে স্কুলমাস্টারি করি। কলকাতার কোন সাহিত্যিক বা পত্রিকা-সম্পাদককেই চিনি না—সুতরাং লেখা ছাপানো সম্বন্ধে আমায় একপ্রকার হতাশ হতে হল। এইভাবে পূজার অবকাশ এসে গেল, ছুটিতে দেশে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে এলাম। পুনরায় ফিরে এসে কাগজপত্রের মধ্যে থেকে আমার সেই লেখাটি একদিন বার করে ভাবলাম, আজ এটি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

ঘুরতে ঘুরতে একটা পত্রিকা আপিসের সামনে এসে পড়া গেল। আমার মত অজ্ঞাত অখ্যাত নতুন লেখকের রচনা তারা ছাপবে এ দুরাশা আমার ছিল না, তবু সাহস করে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। দেখা যাক না কি হয়, কেউ খেয়ে তো ফেলবে না, না হয় লেখা না-ই ছাপবে। ঘরে ঢুকেই একটি ছোট টেবিলের সামনে যাঁকে কর্মরত দেখলাম, তাঁকে নমস্কার করে ভয়ে ভয়ে বলি—"একটি লেখা এনেছিলাম—"; ভদ্রলোক মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "আর কোথাও আপনার লেখা কি বেরিয়েছিল? আচ্ছা, রেখে যান, মনোনীত না হলে ফেরত যাবে। ঠিকানাটা রেখে যাবেন।"

লেখা দিয়ে এসে স্কুলের সহকর্মী ও গ্রামের আলাপী বন্ধুদের বলি—

"লেখাটা নিয়ে বলেছে শীগ্‌গির ছাপবে।" চুপি চুপি ডাকঘরে গিয়ে বলে এলাম, আমার নামে যদি বুকপোস্ট গোছের কিছু আসে, তবে আমাকে স্কুলে বিলি যেন না করা হয়। কারণ লেখা ফেরত এসেছে এটা তাহলে জানাজানি হয়ে যাবে সহকর্মী ও ছাত্রদের মধ্যে।

দিন গুনি, একদিন সত্যিই ডাকপিওন স্কুলে আমায় বললে—আপনার নামে একটা বুকপোস্ট এসেচে, কিন্তু গিয়ে নিয়ে আসবেন। আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। নবজাত রচনার প্রতি অপরিসীম দরদ যাঁরা অনুভব করেছেন তাঁরা বুঝবেন আমার দুঃখ। এতদিনের আকাশকুসুম চয়ন তবে ব্যর্থ হল, লেখা ফেরত দিয়েচে!

কিন্তু পরদিন ডাকঘর থেকে বুকপোস্ট নিয়ে খুলে দেখি যে, আমার রচনাই বটে, কিন্তু তার সঙ্গে পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের একটি চিঠি। তাতে লেখা আছে, রচনাটি তাঁরা মনোনীত করেচেন, তবে সামান্য একটু-আধটু অদল-বদলের জন্য ফেরত পাঠানো হল, সেটুকু করে আমি যেন লেখাটি তাঁদের ফেরত পাঠাই, সামনের মাসেই ওটা ছাপা হবে।

অপূর্ব আনন্দ আর দিগ্বিজয়ীর গর্ব নিয়ে ডাকঘর থেকে ফিরি। সগর্বে নিয়ে গিয়ে চিঠিখানা দেখাতেই সবাই বললেন—"কারু সঙ্গে আপনার আলাপ আছে বুঝি ওখানে?—আজকাল আলাপ না থাকলে কিছু হবার জো-টি নেই। সব খোশামোদ, জানেনই তো।" তাঁকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না, যাঁর হাতে লেখা দিয়ে এসেছিলাম, তাঁর নাম পর্যন্ত আমার জানা নেই! তার পর সে গ্রামের এমন কোনও লোক রইল না, যে আমার চিঠিখানা না একবার দেখলে। কারও সঙ্গে দেখা হলে প.থ তাকে আটকাই এবং সম্পূর্ণ অকারণে চিঠিখানা আমার পকেট থেকে বেরিয়ে আসে, এবং বিপন্ন মুখে তাকে বলি—তাই তো, ওরা আবার একখানা চিঠি দিয়েচে, একটা লেখা চায়—সময়ই বা তেমন কই!—হায়! সে সব লেখকজীবনের প্রথম দিনগুলি! সে আনন্দ, সে উৎসাহ, ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার সে বিস্ময় আজও স্মরণে আছে, ভুলি নি। নিজেকে প্রকাশ করার মধ্যে যে গৌরব এবং আত্মপ্রসাদ নিহিত, লেখকজীবনের বড় পুরস্কার সবচেয়ে তাই-ই। স্বচ্ছ সরল ভাবানুভূতির যে বাণীরূপ কবি ও কথাশিল্পী তাঁর রচনার মধ্যে নিয়ে যান—তা সার্থক হয় তখনই, যখন পাঠক সেই ভাব নিজের মধ্যে অনুভব করেন। এইজন্য লেখক ও পাঠকের সহানুভূতি ভিন্ন কখনও কোন রচনাই সার্থকতা লাভ করতে পারে না।

বালক-কবির নিকট আমি কৃতজ্ঞ। সে-ই একরকম জোর করে আমাকে সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে নামিয়েছিল।

পাঁচুগোপালের সঙ্গে মাঝে দেখা হয়েছিল। সে এখন চব্বিশ-পরগনার কাছে কি একটা গ্রামের উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালার হেডমাস্টার। এখনও সে কবিতা লেখে।

প্রথম দর্শন

আজ প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ বছর আগের কথা।

কলকাতায় সবে এসেছি কলেজে পড়তে। রাস্তাঘাট তখনও ভাল চিনি না, একদিন দুপুরবেলা কলেজে কে বললে, আজ সেণ্ট পল্‌স কলেজ হোস্টেলে রবিবাবু আসবেন—দেখতে যাবে ?

রবি ঠাকুর! ইন্দ্রজাল ছিল ও নামে মাখানো আমার বাল্যকাল থেকে। কারণ বলছি। আমার বয়েস যখন আট কিংবা নয়, পাঠশালায় পড়ি আপার প্রাইমারি—তখন আমাদের হেড-মাস্টার গগনচন্দ্র পাল একদিন একখানা শিশুপাঠ্য বই থেকে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতাটির ধ্বনি ও ছন্দ কানে যেতেই মন্ত্রমুগ্ধের মত গগনচন্দ্র পালের মুখের দিকে চেয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত শুনলাম। দাশু রায়ের পাঁচালি শুনেছি, কবি-জারি-গান শুনেছি, কাশীরাম দাসের মহাভারত নিজেও পড়েছি, গুরুজনদের মুখেও শুনেছি, কিন্তু এমন সুললিত কবিতা কখনও শুনি 'ন। যেন একটি অপূর্ব সঙ্গীত—অশ্রুতপূর্ব বাণী। হেড-মাস্টারের মুখে শুনলাম কবিতার নাম 'বঙ্গে শরৎ'—লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের নাম সেই প্রথম শুনলাম জীবনে। এবং এই নামটির সঙ্গে বাল্যকালে শ্রুত সেই কবিতাটির অপরিচিত সৌন্দর্য মিশে গিয়ে ওই নামটির চারিপাশে একটি মায়ালোক গড়ে উঠল আমার মনে সেই দিন থেকেই। কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই মায়ালোকের মানুষ। যখন আমি হাই-স্কুলের ছাত্র, তখন তিান নোবেল-প্রাইজ পান, তাঁর কবি খ্যাতির কথা তখন যথেষ্ট শুনলেও, তাঁর রচনার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ঘটে নি তখনও, কারণ যে সময়ের কথা বলছি, মফঃস্বলের একটি ক্ষুদ্র শহরে রবীন্দ্রনাথের রচনা ৩ত প্রসার লাভ করে নি সে সময়ে। মনে আছে, সে সময়ে গর্ব অনুভব করেছিলুম এই ভেবে যে, আমাদেরই একজন আজ বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে উচ্চ সম্মান লাভ করেছেন, সাহেবেরা দেখুক আমরা ছোট নই। রবীন্দ্রনাথের সম্মান সারা বাংলা দেশের তথা সারা ভারতবর্ষের সম্মান—আমাদের সম্মান।

সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এলেন সেণ্ট পল্‌স কলেজের হোস্টেলের সামনের মাঠে—ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, বেলা বিশেষ পড়ে নি—তিনটে হবে। মাঠে তাঁর জন্যে চেয়ার টেবিল পড়েছে। আমরা সেই টেবিলের দুই পাশে ভিড় করে

দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় রবীন্দ্রনাথ ঢুকলেন পেছনে ছাত্রদের ভিড়ের মধ্যেকার সরু পথ দিয়ে। দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ শ্মশ্রু, সৌম্য সুন্দর মূর্তি! তার আগে ছবিতে তাঁর চেহারা দেখেছি অনেকবার, কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হল কোন ফটোই তাঁর প্রতি সুবিচার করে নি। কি একটি অনন্যসাধারণ দীপ্ত দৃষ্টি চোখ, চিবুকের নিচে শ্মশ্রুরাজির বাঁকা ভার। একেবারে তাঁর কাছে ঘেঁসে দাঁড়িয়েছি, তাঁর অতটা নিকট সান্নিধ্য-লাভের আনন্দে তখন আমি আত্মহারা। দেশে গিয়ে গল্প করবার মত একটা ঘটনা বটে আজ। সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ছেলে বেলায় তাঁর কবিতা গগন পালের মুখে প্রথম শুনে মুগ্ধ হই।

বেশ মনে আছে, হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কেনেডি সাহেব রবীন্দ্রনাথের সামনের টেবিলে বড় একটা কাঁচের জগ ভর্তি করে জল ও একটা গ্লাস রাখলেন। দেখে সকৌতুকে ভাবলাম, দেখ কেনেডি সাহেবের কাণ্ড! অতটা জল কি খাওয়ার দরকার হবে ওঁর?

রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিতে উঠলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর কানে যেতে যেন চমকে উঠলাম, তারপর যতই শুনি, মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। এমন কণ্ঠস্বর আর কখনও শুনি নি, মনে হল এ কণ্ঠস্বর অসাধারণ, জীবনে এই এমন কণ্ঠস্বর কানে গেল, যা হাজার লোকের মধ্যেও পৃথক করে চিনে নেওয়া চলবে।

তাঁর বক্তৃতার আর কোন কথা আমার মনে নেই, বহুদিনের কথা— কেবল মনে আছে, তিনি বক্তৃতার মধ্যে একটা কথা অনবদ্য ভঙ্গিতে ডান হাত নেড়ে চাঁপার কলির মত অঙ্গুলির সাহায্যে (যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন, সবাই জানেন তাঁর আঙ্গুল দেখলে চাঁপা কলির কথা মনে হত) একটি সুশ্রী মুদ্রা রচনা করে বললেন, "কল্পলোক···কল্পলোক"—কয়েকবার তিনি কথাটি ব্যবহার করলেন বক্তৃতার মধ্যে, আরও অনেককিছু বলেছিলেন, মনে নেই।

একটা কথা মনে আছে। সে দিন সেণ্ট পল্‌স হোস্টেলের মাঠে কিন্তু তেমন ভিড হয় নি, অন্তত যেমন ভিড় দেখেছিলুম ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে তাঁর বক্তৃতার সময়, ইউরোপ থেকে তাঁর প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরেই কৌতূহলী জনতার চাপে ইনস্টিটিউটের দরজা ও রেলিং সেদিন ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। হোস্টেলের মাঠে ক্রমে ছায়া পড়ে এল। বক্তৃতা শেষ হয়ে গেল। আমরা সবাই ঠেলাঠেলি করে তাঁর পায়ের ধূলা

নিলাম, পায়ে তাঁর চকচকে বাদামী চামড়ার জুতা ছিল—সে কথা আজও ভুলি নি।

পরবর্তী কালে যখন তাঁর কাছে বসে কথাও বলেছি, তখনও তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কখনই মনে করতে পারি নি, ইনি আমাদের পাঁচজনের মত মানুষ। আমার বাল্যমনের রঙে রাঙানো কল্পলোকের দেবতা হয়ে তিনি চিরদিন রইলেন আমার কাছে—তিনি সাধারণ লোক নন, তিনি অতি-মানব, তিনি রবি ঠাকুর।

সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প

মানব-জীবনের দৈনন্দিন অতি-পরিচিত ও বৈচিত্র্যময় পরিবেশের যে অংশকে অবলম্বন করে সাহিত্য বড় হবার চেষ্টা করেচে সে অংশটা তাকে বিশেষভাবে পুষ্ট করে তুলেচে উপন্যাস ও গল্পের দিক থেকে। তাই সাহিত্যে জীবনের প্রতিফলন সত্যিকারের ঘটেচে উপন্যাস ও গল্পের সাহায্যে। গল্পের কাজটা আবার একটু বেশী কৃতিত্বের। এই হিসেবে যে গল্প সে রকম পরিবেশকে সাহিত্যের কাছে পৌছে দিয়েচে খুব সহজে ও ছোট করে। সাহিত্যে গল্পের মান সে জন্যে খুবই উঁচুতে। সাহিত্য যেদিন থেকে জন্ম নিয়েচে সেদিন থেকেই প্রায় ছোট গল্প আত্মপ্রকাশ করেচে তাকে উন্নত করে রাখতে নিজের দিক থেকে। কিন্তু তার পরিচয় আমাদের কাছে খুব বেশি দিনের নয়। ছোট গল্পকে আমরা চিনেচি বিশেষ করে মোঁপাশার দৌলতে, তাও সেটা বিদেশী সাহিত্য। তাঁরই কাছ থেকে পাওয়া দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা দেখতে শিখেচি বিদেশী সাহিত্যে গল্পের মান-মর্যাদা যার অনুকরণে আবার বাংলা সাহিত্যে গল্পের স্থান দিতে শিখেচি যথেষ্ট খাতিরের।

বাংলা সাহিত্যে গল্পের যে ধারা এখন পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে মৌলিকত্ব পাওয়া যায় না বিশেষ। সবই যেন কতকগুলো শেখান বুলি আওড়ান, বেশী রকম বিদেশী ঘেঁষা, আর যেন কোন 'ইজমে'র চাপে পড়া। যা হোক, নরনারীর প্রেমের কাহিনী নিয়ে যে একটানা একটা একঘেয়েমি পেয়ে বসেছিল গত শতাব্দীর বাংলা গল্পে সেটার থেকে মুক্তি দিতে যে সংস্কার-সাধনের চেষ্টা হতে চলেচে আজকের গল্পে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু এই সংস্কারসাধনের ব্যাপারটা এতই দ্রুত ও সামঞ্জস্যবিহীনভাবে হয়ে চলেচে যে মৌলিকতা বলে জিনিসটা নষ্ট হতে চলেচে, যে মৌলিকতার গৌরবে বাংলা সাহিত্য এতদিন শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষ অধিকার করে ছিল। মোহিতলাল প্রমুখ বিশিষ্ট সমালোচকরা বলেন, আজ সেই মৌলিকতার অভাবেই বাংলা সাহিত্যে গঠনমূলক বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। সংস্কারের ছদ্মবেশে সমালোচনাই স্থান নিচ্ছে বেশী করে। সংস্কারসাধন মানে মৌলিকত্ব বিনাশ নয়। সংস্কার করতে হলে মৌলিকত্ব বজায় রেখেই সেটা করতে হবে। আর এই মৌলিকত্ব আমাদের সাহিত্যে এসেচে আজকের যুগে রবীন্দ্রনাথের যুগ থেকে, রবীন্দ্রনাথের

যুগ এসেচে বঙ্কিমের যুগ থেকে যেটা এসেচে বিদ্যাসাগরের আমল থেকে। তাই 'গল্প-গুচ্ছে'র 'গল্পভারতী'র যুগে নাম করা হচ্ছে 'কথামালা', 'মণিমঞ্জুষার'। কথামালার যুগও সন্ধান নিয়ে গেছে 'হিতোপদেশ' 'পঞ্চতন্ত্রে'র যুগের। সুতরাং মৌলিকত্বের খোঁজ পড়লে প্রাচীনের দিকেও দৃষ্টি যায় ক্ষেত্র বিশেষে। তাই সংস্কৃত সাহিত্যেরও দাম আছে—এ হিসেবে যতই তার ভাষাকে 'ডেড ল্যাঙ্গোয়েজ' বলে মেরে রাখা যাক না।

সংস্কৃত সাহিত্য ঐশ্বর্যশালী হয়েচে প্রধানতঃ নাটকের জন্যে। সংস্কৃত নাটকের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গদ্য আর পদ্যেব অপূর্ব সমাবেশ। শব্দ-অলঙ্কারপূর্ণ গদ্যের সঙ্গে কাব্য মাখা ছন্দগাথা শ্লোকের প্রযোজনা তাকে দিয়েচে একটা স্বকীয় ভঙ্গিমা যার দরূণে সংস্কৃত নাটক আমাদের কাছে আজও এতটা প্রিয়। আর একটা লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, নাটকের সাধারণ অধিকাংশ সংলাপ লেখা হয়েচে প্রাকৃত ভাষায়—যে ভাষা প্রাথমিক কাব্যরূপ নেয় নানা-রকম আখ্যান ও গল্পের ভিতর দিয়ে। 'কাদম্বরী' প্রমুখ ক'টা বিখ্যাত নাটক কাব্যের রূপে প্রকটিত হতে দেখা গেছে সহজ ও লোকপ্রিয় একরকম গল্প যার প্রভাবেই নাট্যে সংলাপের মাধুর্য। তাছাড়া নাটকের বিষয়বস্তু গঠনে যথেষ্ট প্রভাব পাওয়া গেছে প্রাচীন জনপ্রিয় গল্পগুলোর, যাদের স্রষ্টা ছিলেন বিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী। নাটক ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য গদ্য রচনাতেও এ রকম প্রভাব দেখা গেচে প্রাচীন লোকশ্রুত নানা রকম গল্পের।

সংস্কৃত সাহিত্য গল্পের গোড়ার দিকে আমরা দেখি তিন রকম রূপ-এর। এক রকম হচ্ছে জাতীয় গৌরবময় কাহিনী অবলম্বনে বীরত্বের কাহিনী যাকে ইংরিজিতে বলা হয় 'লিজেণ্ড' (Legend)। আর এক রকম হচ্ছে নীতি-শিক্ষার উদ্দেশ্যে উপমা ও তুলনামূলক সহজ গল্প যার ইংরিজি পরিচয় 'ফেবল' (Fable)। তৃতীয়টা হল সহজ ও সাধারণ উদ্দেশ্যবিহীন আমোদদায়ক গল্প যাকে ইংরিজিতে বলে 'টেল' (Tale)। দুঃখের বিষয় সংস্কৃতে এই তিন রকম গল্পের স্পষ্ট কোন সংজ্ঞার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে এদের পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাই বিখ্যাত গল্পগুলোতে।

প্রথম রকমের গল্পগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে সেগুলোকে, যেগুলো পাওয়া যায় 'বৃহৎ কথামঞ্জরী' ও 'কথাসরিৎসাগরে'। 'বৃহৎ কথামঞ্জরী' প্রকাশিত হয়েছিল ১০৬৬ থেকে ১০৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। রচনা করেছিলেন তখনকার কাশ্মীরের বিখ্যাত পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র। কাশ্মীরের প্রাচীন জনশ্রুত

কাহিনীগুলোকে সুন্দরভাবে গল্পের আকারে সাজিয়ে গ্রন্থরূপ দেওয়ায় ক্ষেমেন্দ্রের যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখা যায়। সরল প্রাকৃত ভাষার সরস রচনার একটা ভঙ্গীও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর একটা বড় দান। 'কথাসরিৎসাগরে'র রচয়িতা সোমদেব। রচিত হয়েছিল 'বৃহৎ-কথামঞ্জরী' রচনার প্রায় পঁচিশ বছর পরে। পর পর আঠারোটি লম্ভকে একশ' চব্বিশটি ভাগে ভাগ করে একটা মনোরম গল্পধারা সৃষ্টি করা হয়েচে। তাই এর নাম কথার স্রোত সাগর। গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে রাজা উদয়নের পদ্মাবতী হরণের কাহিনী খুবই সুখপাঠ্য। পঞ্চম ভাগ চতুর্দারিকায় সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে রাজপুত্র শক্তিভোগের বিজয়াভিযান ও রাজা বিদ্যাধরের রাজ্যে প্রবেশ করে চারজন সুন্দরী যুবতীকে হরণ। এখানে বিন্ধ্য পর্বতের প্রাকৃতিক বর্ণনা সত্যি উপভোগ্য। ষষ্ঠ ভাগে আছে বীর নরবাহন দত্তের সিংহাসন লাভের আগের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী। এ রকম অন্যান্য ভাগেও আছে বিভিন্ন রকমের কাহিনীর সুন্দর বর্ণনা। 'কথাসারিৎসাগরে'র বৈশিষ্ট্য রয়েছে মূল গল্পের সঙ্গে বহু সংখ্যক অন্য বিভিন্ন রকমের ছোট গল্পের সুচতুর সংযোজন। গল্পগুলোর দাম শুধু সরল বর্ণনাভঙ্গী ও দুরূহ ভাবপ্রবণতা অর্জনের চেষ্টায় যার জন্যে সেগুলো এতটা প্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী। তবে এর দোষ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকৃতির কাহিনীর প্রাচুর্যে অনেক সময় মূল কাহিনীকে হারিয়ে ফেলতে হয়। বুদ্ধস্বামী-রচিত 'শ্লোক-সংগ্রহ'ও একই শ্রেণীভুক্ত একটা উঁচুদরের গল্পগ্রন্থ। রচনা হয়েছিল নবম শতাব্দীতে নেপালে। এতে আছে আটাশটি অধ্যায়ে চার হাজার পাঁচশ' চব্বিশটি শ্লোক। প্রাচীন জাতীয় বীরগাথা লেখা হয়েছিল এতে সরল সংস্কৃত ভাষায়। বুদ্ধস্বামীর রচনার বিশেষত্ব হচ্ছে অলঙ্কার-বর্জিত সরল শ্লোক প্রয়োগে সম্পূর্ণ কাব্যভাব ফুটিয়ে তোলা। সংক্ষিপ্ত ক'টা উপমাদির সাহায্যে একটা বিরাট ভাব ব্যক্ত করার অদ্ভুত ক্ষমতা আমরা পাই তাঁর গ্রন্থে।

শিক্ষামূলক নীতিযুক্ত গল্পগুলো অর্জন করেচে আরও বেশী লোকপ্রিয়তা। কারণ এগুলোর রচনার উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীকে গল্পের ছলে সৎপথে চালিত করা। প্রত্যেক গল্পকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্যে সহজভাবে উপমা ইত্যাদির সাহায্যে সুবোধ্য করা হয়েছিল। গল্পের শেষে প্রযুক্ত হত একটা নীতিকথা পাঠকদের মনে গল্পের বিষয়বস্তু ও তার শিক্ষণীয় বিষয় গ্রথিত করে রাখতে। এ রকম গল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাধারণ জীবজন্তুর চরিত্রাঙ্কণে কথোপকথনের ভিতর দিয়ে গল্পাংশ সৃষ্টি করা। এদিক থেকে গল্পগুলো একটা অভিনবত্ব

দিয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যে। জীবজন্তুর চরিত্র অবলম্বনে সুন্দর ছোট গল্প রচনা সংস্কৃত সাহিত্যের একটা স্বীয় বৈশিষ্ট্য। যেটা ইংরিজি সাহিত্যে একটু পাওয়া গেছে ঈশপের 'ফেবলস'-এর মত গল্পগুলোতে। সংস্কৃত গল্পগুলোতে আবার প্রযুজ্য হয়েছে ছোট ছোট শ্লোক, যেগুলোর লোকপ্রিয়তা আজও হারায়নি, দৈনন্দিন জীবনযাপনে পথপ্রদর্শকের কাজ করে আসচে। জীবজন্তুর চরিত্র সৃষ্টি করে নীতিগত গল্প রচনার একটা কারণ আমরা পাই সমালোচকদের কাছে। গল্পগুলোর রচনার যুগে ভারতবাসী প্রধানতঃ বাস করত মুক্ত গ্রাম্য আবহাওয়ায়। তাই তাদের জীবন ও চরিত্র গঠনে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের দান ছিল অনেকটা। একই প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় পুষ্ট নানা শ্রেণীর জীবও মানুষের প্রিয় হয়ে উঠেছিল ও অনেক ক্ষেত্রে তাদের সহচরও হয়ে পড়েছিল—যা আমরা আজও দেখি কুকুর, বেড়াল, গরু, ঘোড়া ও নানা রকম পাখী পোষার প্রবৃত্তিতে। মানুষের এই রকম জীবনযাত্রা প্রতিফলিত হয়েছিল তখনকার সাহিত্যে ও কাব্যে। ঋকবেদেও আমরা পেয়েছি বর্ষারম্ভে ভেকের ডাক ঘোষণা করত ব্রাহ্মণদের পূজা উপাসনার সময়। উপনিষদেও আছে কুকুরের 'উদ্গীত' যা নির্দেশ দিত নাকি ঋষিদের তপ-জপের। তাছাড়া রাজনীতি ক্ষেত্রেও জীবজন্তুর চরিত্রের উপমার সাহায্য নেওয়া হত কূটনীতি সহজভাবে বুঝতে। সোনার বিষ্ঠাত্যাগী পাখীর গল্পের সাহায্যে বিদূরকে দেখা যায় ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিতে পাণ্ডবদের বিষয়। বৌদ্ধ জাতকেও পাওয়া যায় পশু-পাখীদের গল্পের ভিতর দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের সহজ আলোচনা করতে। এই রকম যে সব নীতিগল্প অমরতা পেয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যে তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে 'পঞ্চতন্ত্রাখ্যায়িকা' ও হিতোপদেশ'।

'পঞ্চতন্ত্রাখ্যায়িকা' বা 'পঞ্চতন্ত্র' রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায় যে ভাষা দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজদরবারের ভাষা বলে পরিচিত হয়েছিল। এর রচয়িতা ছিলেন পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা। মহিলারোপ্যের রাজা অমরশক্তির মূর্খ পুত্রদের তন্ত্রশাস্ত্রে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে বিষ্ণুশর্মা যে পাঁচটি তন্ত্র রচনা করেছিলেন তাই পঞ্চতন্ত্র নামে খ্যাত। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাজকার্য চালনার নীতি ও উপায়গুলো সহজভাবে গল্পের মধ্যে দিয়ে বোঝাবার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল পঞ্চতন্ত্র। রচনা সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যেও আবার দেখা যায় মতদ্বৈধ। একদল বলেন, রচনার গোড়ায় যার প্রভাব ছিল সেটা হচ্ছে খৃষ্টপূর্ব তিনশ' অব্দের আগে কাশ্মীরি ভাষায় লিখিত 'তন্ত্রাখ্যায়িকা' নামে গ্রন্থটি। আর এক দলের মতে এতে খানিকটা

প্রভাব পাওয়া যায় কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রের'। 'তন্ত্রাখ্যায়িকা' পাঁচটা ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে করতক ও দমনক নামে দুই শৃগাল, একটি সিংহ ও ষাঁড়ের মধ্যে যে বৈরিতা এনে দিয়েছিল তা দেখান হয়েছে বেশ যুক্তির অবতারণা করে। দ্বিতীয় ভাগে আছে পাঁচটা মজার গল্প—যাদের চরিত্রগুলো হচ্ছে ঘুঘু, কাক, পেঁচা, ইঁদুর, কচ্ছপ ইত্যাদি। জীবজন্তুর চরিত্র অঙ্কন ও তাদের কথোপকথন প্রয়োগের কুশলতাই লেখকের বৈশিষ্ট্য। ক্ষুদ্রবুদ্ধি শৃগাল কর্তৃক পশুরাজ সিংহকে কূপে নিক্ষেপাদি নীতিগত গল্পগুলোর জন্যে এর দাম আজও আছে। এ সব ছাড়াও মহাত্মা শিবির দেহদানের গল্পের মত শিক্ষণীয় গল্পও আছে অনেক। তাছাড়া প্যাঁজ চোরের প্যাঁচ খেয়ে শাস্তি পাওয়া, বোকা অপরিণামদর্শী ব্রাহ্মণের আকাশকুসুম কল্পনার শোচনীয় পরিণামের মত গল্পগুলোর মধ্যে লেখকের রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় যথেষ্ট। পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলো প্রধানতঃ 'তন্ত্রাখ্যায়িকা' থেকে নেওয়া। বিষ্ণুশর্মার কৃতিত্ব শুধু বৃহৎ আকারের গ্রন্থকে কৌশলে পাঁচটা ভাগে ভাগ করে মৌলিকতা বজায় রেখে একটা শিক্ষামূলক গ্রন্থ রচনার ক্ষমতায়। সরল গদ্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে ছোট শ্লোকের প্রয়োগে সংস্কৃত গল্প রচনায় এ একটা বিশেষত্ব আরোপ করেচে। শ্লোকগুলোর উৎস হচ্ছে প্রধানতঃ সংস্কৃত মহাভারত ও পালি ভাষায় রচিত জাতকের শ্লোক। গল্পাংশে এদের সুষ্ঠ প্রয়োগে গল্পের বর্ণনাকে একটা মাধুর্য দেওয়াই এদের বড় কাজ। এটুকুর জন্যেই বিশেষ করে পঞ্চতন্ত্রের লোকপ্রিয়তা আজও। সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠ্য পুস্তক হিসেবে তাই এ ইংরেজ টিপ্পনাকারদের কাছে 'textus simplicior' বলে পরিচয় পেয়েছে। 'হিতোপদেশে'র খ্যাতি পঞ্চতন্ত্রের পাশেই। 'হিতোপদেশ' আলাদা কোন বিষয়ের গ্রন্থ নয়। পঞ্চতন্ত্রকেই পরিবর্তিত করে নতুন আকারে নতুন ভঙ্গীতে সাজাবার একটা চেষ্টা হয়েচে এতে। এর গল্পগুলো পঞ্চতন্ত্রেরই মত পেয়েচে জনপ্রিয়তা। হিতোপদেশ রচনা করেন নারায়ণ তখনকার একজন বাংলাদেশের বড় পণ্ডিত ধবলচন্দ্রের সাহায্যে। তাই তখন এর খ্যাতি বাংলাদেশেই ছিল বেশি।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের জনপ্রিয়তা শুধু প্রাচ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিস্তৃত প্রচার এদের লোকপ্রিয়তাকে নিয়ে গেছে সুদূর প্রতীচ্যেও। মূল সংস্কৃত থেকে 'পঞ্চতন্ত্র' অনূদিত হয়েছিল ৫৭০ খৃষ্টাব্দে সিরিয়া ও আরবী ভাষায়। অনেক পরে ১২৫২ সালে অনুবাদ করেছিলেন স্পেনের কোন পণ্ডিত।

স্তারপর একে অনুবাদ করা হয় হিব্রু ভাষায়। হিব্রু থেকে ল্যাটিনে অনুবাদ করেন ক্যাপুয়ার জন সাহেব যার অনুবাদ আমরা পাই ইটালী ভাষায় ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে। তারই প্রথম ভাগটা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে স্যার টমাস নর্থ। এইভাবে অষ্টম থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলো যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল প্রায় পৃথিবীর সর্বত্র। ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে ইশপ প্রভৃতি সাহেবরা 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' অনেকটা ধার করেছে গল্প, ভঙ্গী ও চরিত্রসৃষ্টিতে। কবি কিপলিং-এর Jungle Book' নামে বিখ্যাত গল্পগ্রন্থে জীবজন্তুর চরিত্রাঙ্কন ও কথাবার্তায় পঞ্চতন্ত্রের প্রভাব অনেকটা লক্ষ্য করা যায়।

'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশে'র মত নীতিমূলক গল্পগ্রন্থ ছাড়াও আরও অনেক গল্পগ্রন্থ আছে, যেগুলোর দাম আছে যথেষ্ট আনন্দদায়ক ও সুখপাঠ্য হিসেবে। তাদের রচনার উদ্দেশ্য কোন রকম নীতির অবতারণা, লোকশিক্ষা দেওয়া নয়। তাদের গল্প শুধু গল্পেরই খাতিরে। তাদের লক্ষ্য কেবল গল্প ও রস রচনার ভিতর দিয়ে পাঠকের মনকে আমোদ দেওয়া। সাহিত্যিক বিচারে তাদের দাম চরিত্রসৃষ্টি, অলঙ্কার-বৈচিত্র্য, শ্লোক-পাণ্ডিত্য ইত্যাদির বিচক্ষণতায়। এই শ্রেণীর গল্পগুলোকে ইংরিজি Tale বলে পরিচিত করলেই বোঝা যাবে স্পষ্ট। এ রকম গল্পগ্রন্থ হিসেবে 'বৃহৎকথা' ও 'বেতালপঞ্চবিংশতিকা' শ্রেষ্ঠ স্থান নেয়। 'বৃহৎকথা' কথা রচনা করেন মহাপণ্ডিত গুণাঢ্য পঞ্চম শতকের গোড়ার দিকে। 'বৃহৎকথা'য় গুণাঢ্য অধিকাংশেই ব্যবহার করেন পৈশাচি ভাষা। পৈশাচি ছিল তখনকার বিন্ধ্য পর্বতের পার্বত্য জাতিদের জাতীয় ভাষা। এ ভাষা প্রয়োগে লেখকের পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় এর সঙ্গে প্রাকৃত ভাষা সংমিশ্রণে, যার থেকে সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধটা পাওয়া যায় খুব কাছাকাছি। এর প্রভাব খানিকটা পাওয়া যায় কালিদাসের বিখ্যাত নাটকগুলোতে প্রাকৃত সংলাপ প্রয়োগে। বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনের ভেতর দিয়ে গল্পাংশকে পুষ্ট করে তোলার অদ্ভুত এক ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায় 'বৃহৎকথায়' যার জন্যে গুণাঢ্য সংস্কৃত সাহিত্যে আজও অমর। মূল গল্পাংশে অনেকটা দেখা যায় রামায়ণের প্রভাব। রাজা নরবাহন দত্তের বীরত্বজীবন নিয়েই এর বিষয়বস্তু। নরবাহন দত্ত প্রথমে বেগবতী ও পরে গোমুখের সঙ্গে দীর্ঘ প্রবাসে যাত্রা করে হাজির হন এসে বিদ্যাধরের রাজ্যে। সেখানে তিনি রাজকুমারী মদনমঞ্জুকাকে বিবাহ করেন। সে সময়ে মদনমঞ্জুকার রূপে আকৃষ্ট হয়ে দুষ্ট চরিত্র মানসবেগ রাজার শত্রুতা

অর্জন করে, যেমন রামায়ণে দেখা যায় রাবণ আকৃষ্ট হন সীতার প্রতি। সীতার মতই মদনমঞ্জুকাকে লেখক দেখিয়েছেন সতী সাধ্বী করে। রাজা নরবাহন দত্তের বিবাহোত্তর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জীবন অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। মদনমঞ্জুকাব চরিত্রেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব স্পষ্ট করে দেখান হয়েচে। তাই ক'জন টিপ্পনীকার মন্তব্য করেচেন 'বৃহৎকথা'র গুণাঢ্য বৌদ্ধধর্মই প্রচার করেচেন বেশী করে। কিন্তু সাহিত্যিক বিচারে তাঁদের এ মন্তব্য দাঁড়ায় না। কারণ গ্রন্থটাতে বর্ণনাভঙ্গী, চরিতসৃষ্টি, সংলাপ প্রয়োগ, শ্লোক সংযোজন এগুলোর মধ্যে দেখা যায় এমন এক বিশিষ্টতা যার জন্যে এ পাঠক মনে একটা গভীর ছাপ রাখতে পারে চিত্তামোদী সুখপাঠ্য গল্প হিসেবে। গল্পের স্বচ্ছ গতির সঙ্গে এক একটা চরিত্রকে খাপ খাইয়ে তাকে স্পষ্টতর করে পাঠকের মন অধিকার করতে একটা অদ্ভুত কৌশলের পরিচয় আমরা পাই গুণাঢ্যের মধ্যে। পরবর্তী কালের নাট্যকাররাও তাঁর কাছে মনে হয় এবিষয়ে যথেষ্ট ঋণী। 'বৃহৎকথা'র নরবাহন দত্ত, গোমুখ, মদনমঞ্জুকার মতন চরিত্রগুলো সংস্কৃত গল্প সাহিত্যে হয়ে থাকবে অমর।

আমোদদায়ক গল্প হিসেবে 'বৃহৎকথা'র পরই আসে 'বেতাল পঞ্চবিংশতিকা'। 'বৃহৎকথা' রচিত হয়েছিল গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে। 'বেতাল পঞ্চবিংশতিকা' রচিত হয়েছিল প্রধানতঃ সরল গদ্যে। তবে এতে শ্লোক যে নেই একেবারে তা নয়, যা আছে তা খুবই কম আর গুণে 'বৃহৎকথা'র শ্লোকগুলোর তুলনায় নিকৃষ্ট। লেখকের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। তবে শিবদাস যে লেখক ছিলেন তা পণ্ডিতেরা স্বীকার করে নিয়েচেন। গল্পগুলো রচিত হয়েছিল সরল সংস্কৃত ভাষায়। পঁচিশটি গল্প পর্যায়ক্রমে এমনভাবে সাজান হয়েচে যে প্রত্যেকটি গল্পের সঙ্গে আর একটার যোগসূত্র পাঠককে খুঁজে বার করতে হয় না কষ্ট করে। গল্পের শেষে একটা অদ্ভুত অনুসন্ধিৎসা ভাব পাঠককে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত থাকে। এই অনুসন্ধিৎসা ভাব সৃষ্টি করার মুন্সিয়ানাতেই লেখকের কৃতিত্ব। মহারাজ বিক্রমাদিত্য শ্মশানে মৃতদেহ আনতে গিয়ে প্রেতাত্মার অদ্ভুত গল্পের অবতারণায় তাঁকে বিব্রত করার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী নিয়েই 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র রচনা। কাহিনী খুব চিত্তাকর্ষক ও আবালবৃদ্ধবণিতা সব পাঠকের প্রিয় পাঠ্য।

এই সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 'শুকসপ্ততি' নামে আর এক গল্প গ্রন্থের। 'শুকসপ্ততি'র রচয়িতা ও রচনাকাল অজ্ঞাত। একটা শুক পাখীর মুখে সত্তরটা

চিত্তাকর্ষক গল্প এর বিষয়বস্তু। রচনায় অনেকটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায় 'বেতাল পঞ্চবিংশতিকা'র। বিশেষত্ব এই যে সত্তরটা গল্প এমনভাবে পর পর রচিত হয়েচে যে পাঠকের ধৈর্য কখনও ভেঙ্গে যায় না বরং গল্পের পরবর্তী অবস্থা জানবার জন্যে জাগিয়ে রাখে একটা আগ্রহ। সহজ সংস্কৃত ভাষায় গল্পের পর গল্প সুন্দরভাবে প্রকাশ করে সুখপাঠ্য ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে বিশেষ বর্ণনা ও প্রকাশভঙ্গী লেখকের বিশেষত্ব।

গল্পের দিক থেকে সংস্কৃত সাহিত্য অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় ততটা উন্নত না হলেও সংখ্যাল্পতার ভিতরেই পাওয়া যায় যথেষ্ট গুরুত্ব যেটাকে আমরা অন্য ভাবে বলতে পারি বঙ্কিমচন্দ্রের মত, 'এর যা আছে তা এরই'। তাই এর স্বাতন্ত্র্য। গল্পগুলোর বৈশিষ্ট্য শুধু উপমা, অলঙ্কার, শ্লোক, চাতুর্য ও বর্ণনার স্বাভাবিক সরলতার মধ্যে। এতে একদিক থেকে যেমন প্রকাশ পেয়েছে গভীর পাণ্ডিত্য অন্যদিকে তেমনি পরিচয় পাওয়া গেছে গল্পগুলোর জনপ্রিয়তার। বিষয়বস্তুর ভিতর জটিলতা, তত্ত্বালোচনামূলক কিছু দেখা যায় না। তাব সব শ্রেণীর পাঠকদের মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। গল্পগুলোতে বিষয়বস্তুর সরলতার সঙ্গে তুলনামূলক চরিত্র সৃষ্টির দ্বারা গল্পাংশকে একটা সুষ্ঠু গতি দেওয়ার জন্যে সংস্কৃত গল্পের স্থান অনেকটা উঁচুতে। গল্প-বর্ণিত চরিত্রগুলো তাই এতটা পরিচিত আমাদের কাছে, যাদের উদাহরণ আজও আমাদের সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের যথেষ্ট কাজের। এখানেই সংস্কৃত গল্পের জনপ্রিয়তা।

ধলকোবাদের চিঠি

কাল গিয়েচে পূর্ণিমা। বাংলো একটা বনাবৃত ছোট পাহাড়ের চূড়ায়, মধ্যে একটা উপত্যকা। যে দিক থেকেই দেখি নিবিড় অরণ্যানী ও শৈলচূড়া ঘিরে আছে চারিদিকে। গভীর রাত্রে কাল জ্যোৎস্নাস্নাত অরণ্যে যখন ময়ুর ও সম্বর হরিণের ডাক শুনলুম, তখন সত্যই মনে হল কোথায় আছি? বন্য হস্তীর উপদ্রব সর্বত্র। যেখানে সেখানে হাতীর নাদ পড়ে আছে।

কাল বড় মজা হয়েচে। চা খেয়ে আমি, মিঃ সিংহ ও রেঞ্জ্ অফিসার মিঃ গুপ্ত তিন জনে বাংলো থেকে নেমে বনপথে বেড়াতে গেলুম হেঁটে। কি সুন্দর অপরাহ্নের ছায়াবৃত সে অপূর্ব বনকান্তার! ময়ূর-নিনাদিত বনভূমি বাল্মীকির রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের বনবর্ণনা স্মরণ করিয়ে দেয়। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল দেখে মিঃ গুপ্ত বললেন, চলুন অন্ধকারে হাতী বেরুবে। যদিও পূর্ণিমা, কিন্তু এ বনে চতুর্দিকের শৈলমালা ভেদ করে চাঁদের আলো পড়তে এক ঘণ্টা দেরি হয়ে যাবে। এই একঘণ্টা নিবিড় অন্ধকারে আবৃত বনের মধ্যে এক পাথরের ওপর বসে থাকা নিরাপদ নয়। এমন সময় মানুষের গলা শোনা গেল পায়ে-চলা সরু পথটার প্রান্তে। যারা আসচে তারা আমাদের দেখে ভয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েচে। আমরা ডাক দিলুম, দু'জন হো জাতীয় লোক। তারা বললে—বালজুড়ি থেকে চাল কিনে আসচি! হো ভাষায়, বললে মিঃ গুপ্ত জানেন এ ভাষা। বালজুড়ি কোথায়? ওরা বললে, বোনাইগড় স্টেট। কখন বেরিয়েচ? বললে, বেলা দশটায় দক্ষিণ-পশ্চিমে এই অরণ্যভূমির ওপারে উড়িষ্যার বোনাইগড করদরাজ্য। সেখানে চাল ছ'সের টাকায়। লোকদু'টি সেখানকার সীমান্ত-রক্ষীদের চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে বনে বনে পালিয়ে আসচে সস্তা চাল নিয়ে। আমাদের ভেবেচে সারাণ্ডা বনের সীমান্তরক্ষী। তাই এই ভয়।

কিন্তু কি অপূর্ব সৌন্দর্য হল পূর্ণিমার চন্দ্রকরোজ্জ্বল সে বনভূমির। গম্ভীর অরণ্যানী, চতুর্দিকে পাহাড় আর বনাবৃত উপত্যকা। পদে পদে বন্যহস্তী ও ব্যাঘ্রের ভয় সে সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেচে। চলে আসচি, গভীর বনে কুকুর ডাকার মত শব্দ। মিঃ গুপ্ত বললেন, ও কুকুর নয়, লোকালয় নেই, কুকুর কোথা থেকে আসবে? ও বার্কিং ডিয়ার, একপ্রকার হরিণ। কে বর্ণনা দিতে পারে এ জ্যোৎস্নাস্নাত বনভূমির? গভীর অরণ্যে দূরের কোন পার্বত্য নদীর

অবিশ্রান্ত জলপতনধ্বনি ও ঝিঁ ঝিঁ পোকা এবং নৈশ পাখীর কূজনদ্বারা বিখণ্ডিত সেই গম্ভীর নৈঃশব্দ্য বর্ণনার জিনিস নয়, উপলব্ধি করার জিনিস। না দেখলে উপলব্ধি হবেই বা কেমন করে। বনের মধ্যে পাষাণময় তীরভূমির মধ্য দিয়ে কোইনা নদী বয়ে যাচ্চে, জ্যোৎস্নালোকে আজ আমরা সেখানে রাত্রে পিকনিক্ করতে যাব ঠিক হয়েচে।

এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ পর্বতশিখর শশাংদাবুরু ৩০৩৮ ফুট উঁচু। সারা সকাল ধরে বনের মধ্যে দিয়ে পরশু আমরা এই শিখরে উঠেছিলুম। অত্যন্ত দুরারোহ ও ঘন বনে আচ্ছন্ন সরু পথ দিয়ে উঠচি, উঠচি, তার যেন আর শেষ নাই। এক একটা শালগাছ কলের চিনির মত ঠেলে উঠেচে আকাশে, কোথাও বন্য দেবকাঞ্চন ফুলের মেলা, আরও কত কি বন কুসুম ফুটে আছে লোক চক্ষুর অন্তরালে কে তাদের নাম জানে? কোথাও ঝর ঝর ঝরচে পাহাড়ী ঝরণা, শশাংদাবুরু শিখরদেশ থেকে খাড়া নিচে পড়েচে, বনে বনে প্রতিধ্বনিত হচ্চে সে শব্দ। কোথাও বনের মধ্যে বুনো রামকলা গাছ। কে খায় সে কলা হাতী আর বাঁদর ছাড়া। এই সারণ্ডা অরণ্য অবিচ্ছেদে ৪০০ বর্গমাইল জনহীন, শুধু বনবিভাগের বাংলো ছাড়া কোন থাকবার জায়গা নেই, বনবিভাগের তৈরি মোটর রোড ছাড়া রাস্তা নেই। উঠতে উঠতে ঘন ঘন হাঁপাচ্চি, বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা মারচে, পা সামান্য তুলতেও কষ্ট হচ্চে। আবার বনের মধ্যে এত বেলাতেও সূর্যের আলো পড়ে নি, সে নিবিডতা গাম্ভীর্যের তুলনা কোথায়? ধূমপান করবার জন্যে সেই খাড়া পথের এক জায়গায় বসলুম, সামনের দৃশ্য আরও স্পষ্ট করবার জ..ন্য ফরেস্ট গার্ড কুড়ুল দিয়ে একটা আমলকী গাছের ডাল কাটলে। তখন দেখি অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েচি, কত নিচে উপত্যকা—দূরে দূরে শুধুই বননীল শৈলশিখর! যেদিকে চাই, পাহাড়, পাহাড় আর বন, বন! বড় বড় কেলিকদম্বের পাতা বিছিয়ে বসেচি খাড়া বাঁকা পথটার গায়ে। গড়গড়িয়ে যদি পড়ি তবে ২০০ ফুট নিচু উপত্যকার পাষাণময় ভূমিতে পড়ে চূর্ণ হয়ে যাব। ওপরে উঠে গেলুম তখন বেলা দুটো। ওপরে উঠে দেখি—বারে, যেন খয়রামারির মাঠ! অ..নখানি সমতল মাঠ, দু' মাইল লম্বা, প্রায় দেড মাইল চওড়া। বারে মজা! মাঠের মাঝে মাঝে কেলিকদম্ব, দেবকাঞ্চন ও শাল। এক জায়গায় একটা জলাশয়; তার তীরে নরম কাদায় বহু গরু-মহিষের পদচিহ্ন। আমি বললুম, এখানে গরু চরে কাদের? রেঞ্জ অফিসার গুপ্ত হেসে বললেন, গরু কোথা থেকে আসবে এ জনহীন অরণ্যের ৩০০০ ফুট

উঁচু পাহাড়ের মাথায়? ওগুলো বাইসন আর সম্বর হরিণের পায়ের দাগ। ফরেস্ট গার্ড হো জাতীয় বন্য লোক, সে সেসব পায়ের দাগ দেখে বললে, বুনো শূওর, বাইসন আর সম্বরের পায়ের দাগ। হাতীও আছে। বাঘ? বাঘ এখানে জল খায় না।

ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন। সঙ্গে খাবার নিয়ে উঠেচে দু' জন ফরেস্ট গার্ড। এক পাথরে বসে পেট পুরে খেলুম। শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে চা হল। ওঁরা তাড়াতাড়ি করতে লাগলেন, চলুন, বড্ড বাইসন আর হাতীর ভয়। আবার নামি সেই উত্তুঙ্গ পর্বতশিখর থেকে নিম্নের ঘন বনের মধ্যেকার সরু দুর্গম পথ দিয়ে। ওঠাও যেমনি, নামতেও তেমনি। বেলা ৫টার সময় নিচে নামলুম বটে, কিন্তু নামলুম কোথায়? বনের মধ্যেই। বনের ছায়া নিবিড়তর হয়ে সান্ধ্য অন্ধকারে মিশিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েচে। ফরেস্ট গার্ড বলচে, হুজুর হাতী বেরুবে, জলদি চলুন। কিন্তু বললেই তো হয় না। আরও আড়াই মাইল হেঁটে তবে আমাদের মোটর পর্যন্ত পৌঁছব। মোটর পর্যন্ত পৌঁছতে সন্ধ্যা হ'ল। হঠাৎ গার্ড বললে, হাতী! হাতী! চেয়ে দেখি উপত্যকার ওপারে পাহাড়ের গায়ের বনে রাঙা ধূলো মাথা হাতী একটা গাছের তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে। তখন সন্ধ্যা, ভাল দেখা যায় না—কেউ বলে হাতী, কেউ বলে না। আমরা মোটরের ভেঁপু বাজাতেই দেখলুম রাঙা-ধূলো-মাথা জিনিসটি সরে গেল, সুতরাং নিশ্চয়ই হাতী।

শুক্লাচতুর্দশীর অপূর্ব জ্যোৎস্না উঠল। তখন আমরা পার্বত্য কোইনা নদীর উপলাস্তীর্ণ তীরে পৌঁছে গিয়েচি। দু' ধারের নিবিড় অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে কলকল তানে কোইনা নদী বয়ে চলেচে। আমি বললুম চা খাওয়া যাক। চা আছে, চিনি আছে, দুধ নেই। আগুন করা গেল হাতীর ভয়ে। বাংলো আরও দু' মাইল দূরে। ডালপালার আগুনে কেটলিতে জল চড়িয়ে দেওয়া হ'ল। যেদিকে চাই, সেদিকেই ঝিল্লীমুখর বনানী। জ্যোৎস্নাস্নাত প্রাচীন বনস্পতিশ্রেণী ধ্যানমগ্ন ঋষিদের মত শান্ত সমাহিত—জন্ম-মরণভীতিভ্রংশ কোন্ মহাদেবতার উপাসনায় বিভোর। জয় হোক সে দেবতার, যাঁর করুণায় আজ আমার মত দরিদ্রের এ অপরূপ বনস্থলী দর্শনের সুযোগ ঘটল। তাঁরই শব্দহীন বাণী এই বনানীর নিশীথ নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রহরে প্রহরে মুখরিত হয়ে উঠেচে।

[ধলবোবাদ ফরেস্ট রেস্ট হাউস হইতে ১৩-১১-৪৭ তারিখে বনগ্রাম নিবাসী শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত।]

অভিভাষণ-চিঠিপত্র

বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক লর্ড এ্যাক্টন একবার বলেছিলেন যে উনবিংশ শতাব্দীর মানুষের পক্ষে নবম বা দশম শতাব্দীর মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝা বড়ই কঠিন, কারণ রাষ্ট্রে, সমাজে, কার্যে, চিন্তায় ও ধর্মে তারা ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মানুষ—বর্তমান যুগের মানুষের সঙ্গে তাদের কোথাও কোনো মিল নেই। এই মূলসূত্রটি মনে রাখলে ইতিহাসের সকল অবিচার, নৃশংসতা ও অকারণ রক্তলোভের কাহিনী আজকাল আমাদের দুর্বোধ্য বলে মনে হয়, তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে মনে হবে, কারণ সে যুগের মনোবৃত্তির সঙ্গে এদের কার্যকারণ-সম্পর্কটুকু আমরা আবিষ্কার করে ফেলবো।

লর্ড এ্যাক্টনের উক্তিটি ব্যাপকভাবে যদি গ্রহণ করি এবং এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বটুকু বুঝতে চেষ্টা করি, তাহ'লে এই দাঁড়ায় যে শতাব্দীর পর শতাব্দী যতই পার হয়ে যাচ্চে, মানুষ ততই দ্রুত এগিয়ে চলেচে—একযুগের গোঁড়ামী, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার অন্যযুগের মানুষের পক্ষে পরম বিস্ময়ের বস্তু, এ যুগের মিরাকল পরবর্তী যুগের সুপরিচিত দৈনিক ঘটনা—সহস্র শতাব্দীব পারের কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশে তার যাত্রা, এখন সে গৌরবময় বিবর্তনের কাহিনী আমাদের কল্পনারও অতীত।

বিশ্বমানবের এই অগ্রগতির সাহায্যের জন্য মাঝে মাঝে এক একজন লোক আসেন, যাঁরা একাধারে মানুষের সকল দিকে সকল পরিণতির আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে সেই রকম একটি মানুষ। যে অসীমতার তৃষ্ণা মানুষের এই অগ্রগমনের সাথী ও পথপ্রদর্শক রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে দিয়ে তা আমাদের সাহিত্যে সর্বপ্রথম একটি মৌলিক রূপ ধরে দেখা দিয়েচে। এমন এক সময় ছিল যখন আমাদের দেশের লেখকের উৎকর্ষতার পরিচয় দিতে হ'লে প্রতীচীর সেই শ্রেণীর লেখককে মাপকাঠিরূপে ব্যবহার করা হোত—এইটাই ছিল সাহিত্যে তাঁদের স্থাননির্ণয়ের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। তাই দেশবাসীরা বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলার সার ওয়াল্টার স্কট্, মধুসূদনকে বাংলার মিল্টন, কালীপ্রসন্ন ঘোষকে বাংলার এমার্সন নামে অভিহিত করে সাহিত্যে তাঁদের স্থান সুনিপুণভাবে নির্দিষ্ট করা হয়ে গিয়েচে ভেবে পরম আনন্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন। আমাদের সাহিত্যের এই পরমুখাপেক্ষী দাসমনোবৃত্তি দূর করলেন রবীন্দ্রনাথ

তাঁর প্রতিভার অমিত তেজে—তাঁর স্থান এ ধরনে নির্দেশ করতে কেউ সাহস করলে না—মানুষ সেখানে দিশাহারা হয়ে পড়ল, গতযুগের মাপকাঠির উপর আস্থা হারাল, তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল, তারা নিশ্চিন্ত মুরুব্বিয়ানার সুরে তাঁকে বাংলার শেলী কি বাংলার মেটারলিঙ্ক্ বলতে পারলে না, রবীন্দ্রনাথ রয়ে গেলেন একটি unclassified phenomenon—অমুক শেল্‌ফের অমুক নম্বরের অমুক তাকে রবীন্দ্রনাথের স্থান নির্দিষ্ট করা চলল না সহজে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন নানাভাবে। একটা কথাই এখানে বলি। আমার হাতের কাছে একখানা বাংলা উপন্যাস রয়েচে, নাম 'বিজয় বল্লভ', ১৮৮০ সালে সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। লেখক ভূমিকায় বলেচেন, "ইংলণ্ডীয় ভাষায় নবেল নামে মনোহর প্রসিদ্ধ উপাখ্যান গ্রন্থসকল যে প্রণালীতে সঙ্কলিত হইয়া থাকে, সেই প্রণালী অনুসারে এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে" ইত্যাদি। উপাখ্যানভাগ অবশ্য কাদম্বরীর অনুকরণে রচিত, প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে পাই Decadent যুগের সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে আড়ষ্ট ও মামুলী ধরনেব বাঁধিগৎ। পূর্ণিমা থেকে কোকিলের কুহু পর্যন্ত তাতে সবই আছে, নেই কেবল প্রাণ। বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রকৃতি-বর্ণনাও সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবমুক্ত নয়, কিন্তু সর্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথেরই মধ্যে পাই প্রকৃতির বিপুলতা ও রহস্যকে। অনাড়ম্বর বাহুল্যবর্জিত বলেই তা প্রাণবন্ত; অসাধারণ চাক্ষুষ্মান প্রতিভা সেখানে কেতাবী বর্ণনাপদ্ধতির মোহপাশ কাটিয়ে দিয়ে নিজের চোখ ও মনকে বড বলে মেনেচে; সে দর্শনও যেমন নিখুঁত, তেমনি convincing—পদ্মাচরের বিপুল প্রসারের সঙ্গে, পুষ্পিত কাশবনের সৌন্দর্যের সঙ্গে মন সেখানে একদিকে যেমন এক হয়ে মিশে যায়, অন্যদিকে তেমনি নতুন শক্তির উৎসমুখের সন্ধান পেযে নতুন পথে দিগ্বিজযে বার হবার অদম্য স্ফূর্তিকে লাভ করে।

জীবনের ও জগতের ব্যাপারে এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পাই সর্বপ্রথম। আমাদের সাহিত্যের যে আদর্শ ছিল অত্যন্ত খর্ব, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গত পঞ্চাশ বৎসরের সাধনায় তার স্ট্যাণ্ডার্ড এত উঁচু করে দিয়েচেন—সাধারণ গতিতে চলতে চলতে হয়তো দেড়শো বছরেও তা ঘট্‌ত কিনা সন্দেহ। তাঁর নব দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যেক জিনিসটি নতুন করে দেখেচে, বিশ্বমানবের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগসূত্রকে আবিষ্কার করেচে,—দৃষ্টির সঙ্গেই নবসৃষ্টির সূচনা হয়েচে। এমন একটি জীবন্ত, সাদাজাগ্রত মনের পরিচয়

আমরা পাই, পদ্মাবুকের বজ্‌রার কামরায় যা নিদ্রিত হয়ে পড়ি নি—নির্জন রাত্রে রহস্যময়ী প্রকৃতি কখন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন, কখন তাঁর সঙ্গে চোখোচোখি দেখা হবে—তারই আশায় বিনিদ্র রজনী যাপন করেচে।

রবীন্দ্রনাথের দানের তুলনা নেই, জীবনের এমন কোনো দিকও নেই, যেদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েনি, যার সম্বন্ধে তিনি কিছু-না-কিছু নতুন কথা না শুনিয়েচেন, তা শরৎকালীন দুপুর সম্বন্ধেই হোক, বা নাম উচ্চারণ করার পদ্ধতি নিয়েই হোক। এ যুগের বাংলার কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধলেখক—তাঁর কাছে সবারই ঋণের বোঝা বিপুল, বর্তমান চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেচেন তিনি, রূপ দিয়েচেন তিনি—বিশ্লেষণ করে দেখলে সকলেরই চিন্তার উপর রবীন্দ্রনাথের এই প্রভাব ধরা পড়বেই।

একটা ক্ষুদ্র প্রাদেশিক সাহিত্য থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যকে আজ বিশ্বের দরবারে সকলের আসনে বসিয়েচেন, এই বিপুল দানের, মানব প্রতিভার এই অনন্যসাধারণ বিকাশের তুলনা নেই বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে।

তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে আছে যে প্রগাঢ় অনুভূতি, তা সাধারণ মনের ব্যাপার নয়, চেতনা ও অনুভূতির যে স্তর সাধারণের দুরধিগম্য—তাই তাঁর কাছে আমরা যে লোকের সন্ধান পাই, আমাদের দৈনন্দিন তুচ্ছ অনুভূতি পরম্পরার বহু উর্ধ্বে সে এক অপরূপ আনন্দলোক—তাঁকে পথপ্রদর্শক না পেলে সেটা আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাতই রয়ে যেতো চিরদিন। জাতীয় চেতনার এই অগ্রগতি রবীন্দ্র-সাহিত্যের নিকট অপরিসীম ঋণে ঋণী—গত শতাব্দীর অলঙ্কার ও অনুপ্রাস-বহুল বাংলা কাব্যের কথা বাদ দিলেও রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পূর্বের কাব্যের সহিত তাঁর যে তফাত, তা বল্মীকস্তূপ ও হিমালয়ের তফাত। অনুভূতির এই অপরিমেয় ঐশ্বর্যের কথা ভেবে শুধুই এই কথা মনে হয় —এক জীবনে এত বিপুল রসাস্বাদ কি করে সম্ভব হোল, তখুনি আবার তাঁরই কথায় তাঁকে বলতে ইচ্ছা করে—

কোন্ [illegible] রাতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় এস
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো ধরায় এস।

[২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মদিবসের ভাষণ। লেখকের নিজের গ্রামে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।]

বাংলা সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ নতুন করিয়া গড়িয়াছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত সাধনায় এ সাহিত্য যে নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, বিশ্বসাহিত্যে তাহার স্থান অতি উচ্চে। এ কথা আজ আমরা সগর্বে ঘোষণা করিয়া ধন্য হইতেছি। সীমা-সংখ্যাহীন অবদান পরম্পরায় রবীন্দ্রসাহিত্য মহনীয়। জগতের কোন একটি বিশেষ লেখক সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এমনি বহুমুখী যে অল্প পরিসরের মধ্যে সে বিরাট সাহিত্য প্রতিভার সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। কাব্যে, সঙ্গীতে, নাটকে, উপন্যাসে, ছোটগল্পে, সমালোচনায়, ধর্মসম্বন্ধীয় নিবন্ধে, পরিভাষা সঙ্কলনে—সাহিত্যের এমন কোন ক্ষেত্র নাই যাহা তাঁহার দানে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই! বাংলা সাহিত্যের বিরাট মানদণ্ড স্বরূপ যে রবীন্দ্র সাহিত্য আজ আমাদের মুগ্ধ চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশমান, নগাধিরাজ হিমালয়ের মত তাহার উত্তুঙ্গ শিখরদেশ সাধারণ দৃষ্টির নাগালের বাহিরের জিনিস।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূল প্রেরণা সৌন্দর্য ও অনুভূতি। তাহার বাহ্য অলঙ্কার প্রকাশ হইয়াছে অপূর্ব শব্দ-চয়ন, ছন্দধ্বনি ও অলঙ্কার প্রকাশের কৌশলের দ্বারা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকার্যগুলির মূল ভিত্তি হইতেছে সৌন্দর্যানুভূতি। Leonardo-র Gioconda অথবা বেঠোফোনের পরিকল্পিত Symphony-র যে-সৌন্দর্য, ইহাদের প্রথমটির মূলে আছে রেখা ও বর্ণের অপূর্ব সমাবেশ ও দ্বিতীয়টির মূলে সুকৌশল ধ্বনি-সমন্বয়। তথাপি একথাও অনস্বীকার্য যে এই দুইটি শিল্প-কার্য আমাদের চিত্তে যে কল্পলোক রচনা করে তাহা নিশ্চয়ই কেবলমাত্র দৃশ্যমান বর্ণ-সমষ্টি বা শ্রুতধ্বনি সমষ্টি উদ্ভূত হইতে পারে না। বস্তুতঃ এই আনন্দলোক সৃষ্টির মূলে আছে, এই ধ্বনি ও বর্ণনাতীত কোন অদৃশ্য প্রভাব এবং একটি ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি। আবার, যদিও এই বর্ণ ও ধ্বনির মাধ্যমেই সেই অতীন্দ্রিয় আত্মিক অনুভূতির বিকাশ সম্ভব হয়, ইহাও নিশ্চিত যে এই অনুভূতি বর্ণ ও ধ্বনির বহু উর্ধ্বে স্থাপিত এক মহত্তর সত্য। কবি রসবন্ধ বাক্য পাঠ করিয়া বা রচনা করিয়া যে আনন্দানুভূতির সন্ধান পান একজন খৃস্ট, বুদ্ধ অথবা চৈতন্য সদৃশ ব্যক্তি বিশুদ্ধ আত্মিক উপলব্ধির পথেই সে আনন্দের সন্ধান পাইতে পারেন। কিন্তু এ ক্ষমতা নিম্নতর কোন

মানুষের আয়ত্ত হইবার কথা নয়। কাব্য-সাহিত্যের এই মূল সূত্রটি দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলে আমরা দেখিতে পাইব রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভগীরথের ন্যায় নবতীর্থ-জল আনিয়াছেন তাঁহার প্রতিভার গভীর শঙ্খ-ধ্বনির সহযোগে। এই জাতির মর্মস্থল তাঁহার চিন্তার আলোক পাতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় প্রতিভার চারণ তিনি। দেশে যে-প্রতিভার সৃষ্টি আদর লাভ করিয়াছে, যে-ভারতীয় প্রতিভার সৃষ্টি উপনিষদ্ পাঠ করিয়া দার্শনিক সপেনহর বলিয়াছেন—উপনিষদ্ তাঁহার জীবনে সান্ত্বনার কারণ হইয়াছে, মৃত্যুতেও তাহাই হইবে, যে-ভারতীয় প্রতিভার সৃষ্টি শকুন্তলা পাঠ করিয়া কবিবর গ্যেটে বলিয়াছেন—যদি কেহ এক স্থানে শরতের বসন্তের সম্পদ—স্বর্গের ও মর্ত্যের মিলন প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে শকুন্তলা পাঠ করিলে তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ হইবে। রবীন্দ্রনাথ সেই ভারতীয় প্রতিভার মূর্ত প্রতীক, নানাভাবে নানারূপে ভারতীয় অনুভূতি ও ভাবরাশিকে তিনি প্রতীচ্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভার আলোকরশ্মি-সম্পাতে সাহিত্যের যে-শাখায় তিনি হাত দিয়াছেন, তাহাই সোনা হইয়াছে।

উদাহরণস্বরূপ তাঁহার ছোট ছোট গল্পগুলির কথা বলিব। ছোট গল্প বলিয়া কোন জিনিস রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ছিল না। যাহা ছিল, তাহা ছোট গল্প নহে, কাহিনী। অথবা অসার্থক উপন্যাসের কয়েকটি অধ্যায়। কাহিনী এবং ছোট গল্পে প্রভেদ বিস্তর। ছোট গল্প একটি বিশেষ প্রকাশভঙ্গি "কথা"-র। আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে "কথা" ছিল। যেমন, 'কথাসরিৎসাগর' ও 'পঞ্চতন্ত্র'। দণ্ডীর 'দশকুমার চরিত'। গোড়লকৃত 'উদয়-সুন্দরী কথা' ইত্যাদি। ছোট গল্প এই শ্রেণীর "কথা" নয়। ইহাতে একটি বিশেষ ধরনের আর্ট প্রকাশিত। অথবা যে কথা এইরূপ মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাই ছোট গল্প। যে কথায় এই মাধ্যম ব্যবহৃত হয় নাই তাহা ছোট গল্প নহে। কাহিনী মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী সাহিত্যে Conte বলিয়া এক শ্রেণীর 'কথা' বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, মোপাসাঁ, ব্যালজাক, আলফাঁস দোদে প্রভৃতি ক্ষমতাশালী কথা লেখকের হাতে Conte অপূর্ব সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই Conte ক্রমে ফরাসী দেশ হইতে ইউরোপের সর্বস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এদিকে পতিত হইতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইহা একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। ফরাসী Conte বিভিন্ন দেশে গিয়া তাহার রূপ বদলাইয়া ফেলিল; বিভিন্ন লেখকের হাতে একটু আধটু অদল বদল হইতে লাগিল। তথাপি এই মাধ্যমের মূল-কৌশলটি সকলেই যথাযথভাবে অভ্যাস করিলেন। এই মূল-কৌশলটি হইল ছোট গল্পের 'মুহূর্ত' বা moment. এই মুহূর্ত সৃষ্টিই ছোট গল্পের আর্টের প্রাণ-বস্তু। যিনি ইহা যত যথাযথরূপে ও যত সুষ্ঠু ভাবে খাটাইতে পারেন, ছোট গল্প-লেখক হিসাবে তিনি তত সক্ষম, একথা অনস্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যে Conte আমদানী করিলেন, যাহার ফলস্বরূপ আমরা পাইলাম গল্প-গুচ্ছের অপূর্ব গল্পগুলি। ১২৮৪ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁহার প্রথম ছোট গল্প 'ভিখারিণী' বাহির হয়। পরে পরে তাঁহার ছোট গল্পগুলি বাহির হইতে লাগিল। তখন বাঙালী পাঠকের মনে সেগুলি একটি নূতন রাগিনীর মত ধ্বনিলোক সৃজন করিয়া চলিল।

ফরাসী সাহিত্যের গল্পের নিয়মগুলি এত স্থিতিশীল ও সুনির্দিষ্ট যে তাহার সহিত ইউরোপীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন ক্রমগুলির তুলনা করা চলে। প্রথম অংশটি 'ভূমিকা', দ্বিতীয় অংশ 'সম্প্রসারণ', তৃতীয় অংশ 'পুনরাবৃত্তি' চতুর্থ অংশ 'বিরতি' ও সর্বশেষ অংশ Koda বা 'ক্লাইম্যাক্স'। ছোট গল্পের বিভিন্ন অংশেও এইরূপ ক্রম বজায় রাখিতেই হইত; এবং এই স্বর্ণ-নিগড়ের মধ্যে বন্দিনী কথা-সরস্বতী শিল্পীর সাধনা ও উপাসনায় পরিতুষ্টা হইয়া যে অমর বর দান করিতেন শিল্পীকে, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা পাই জুল ক্লারেৎ, ফ্রাঁমোয়া কোম্প, মোপাসাঁ, ব্যালজাক, আনাতোল ফ্রাঁসের অনবদ্য ছোট গল্পগুলি। আনাতোল ফ্রাঁসের 'জুডিয়ার শাসনকর্তা' নামক অপূব গল্পটিকে প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচকরা, ছোট গল্প-শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইহাতে ছোট গল্পের ক্রমগুলিকে গোঁড়া শিল্পীর মত মানিয়া লইয়াও শেষ অনুচ্ছেদে লেখক একটি অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক মুহূর্তের সৃষ্টি করিয়া ছোট গল্প-শিল্পের প্রকৃত রূপটিকে সর্বসমক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোট গল্প এ বিষয়ে একেবারে নিখুঁত ফরাসী আর্ট। যেমন অপূর্ব তাহার পরিবেশ, তেমনি অপূর্বতর তাহার মুহূর্তসৃষ্টি। মুহূর্ত সৃষ্টির সাহায্যেই ছোট গল্প অমর হইয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথ এইরূপ অমর মুহূর্ত সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার 'পোস্ট মাস্টার', 'কাবুলিওয়ালা', 'দৃষ্টিদান', 'ব্যবধান' প্রভৃতি বিখ্যাত গল্পগুলিতে। এই

মুহূর্তগুলি এতই সুস্পষ্ট ও যথাযথ, যে কখনও ছোটগল্প পড়ে নাই বা ছোট গল্পের আর্ট যে জানে না—সেও এগুলির মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি অনুভূতি-প্রধান, সে যুগে বড় বড শিল্পীদের গল্প ছিল এ ধরনের সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিবেশনের মাধ্যম, এ যুগে প্রতীচ্য শিল্পীদের মধ্যে ক্যাথারিন ম্যান্‌সফিল্ডের গল্পগুলি এ দিক দিয়া অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

বলা বাহুল্য, অনুভূতিপ্রধান না হইয়া ঘটনাপ্রধান হইয়াও ছোট গল্প সাফল্য অর্জন করিতে পাবে এবং ভালো ভাবেই পারে—তাহার প্রমাণ আধুনিক যুগের অধিকাংশ লেখকের গল্প। রবীন্দ্রনাথের ঘটনাপ্রধান গল্পের মধ্যে 'গুপ্তধন'-এর কথা হঠাৎ মনে পড়িল। এই গল্পটাকে আধুনিক কালের ঘটনাপ্রধান যে কোনো ছোট গল্পের মধ্যে সাদবে ও সসম্মানে চালানো যায়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের মধ্যে ফরাসী Conte আর ধ্বনিত হয় নাই, যেমন 'বৈষ্ণবী' প্রভৃতি গল্প। ফরাসী শিল্পের মায়াশৃঙ্খল সবলে ছিন্ন করিয়া তাঁহার শক্তিশালী মন তখন গল্প লিখিবার নিজস্ব একটি অপূর্ব ধারা আবিষ্কার করিয়াছে যাহার চরম পরিণতি আমরা দেখিতে পাই 'চতুরঙ্গ' এবং 'দামিনী', 'শ্রীবিলাস', 'জ্যাঠামশাই' প্রভৃতির মধ্যে। ইহারা পৃথক পৃথক নয়। একই সূত্রে গ্রথিত কয়েকটি অমূল্য মণির নিপুণ হার—শুধু বঙ্গ সাহিত্যে নয়, বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে 'চতুরঙ্গ'-এর জুড়ি মেলা ভার। 'চতুরঙ্গ'-এর গভীর অন্তর্দৃষ্টি সাধারণ শ্রেণীর আয়ত্তের বাহিরে।

রবীন্দ্র প্রতিভার বহুমুখী দিকের একটি মাত্র সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। সমস্ত দিকের সম্বন্ধে বলিবার অধিকার আমার নাই। তাঁহার সম্বন্ধে আশ্চর্য ব্যাপার দেখিতে পাই যে তাঁহার বাল্য ও কৈশোর কালেও তাঁহার প্রতিভার দীপ্তি সে-যুগের মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই, এই অদ্ভুত বালক ও কিশোর সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মার্চের সাধারণী হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ বিশিষ্ট প্রমাণ।

"আমরা নিরাশ মনে নবগোপালবাবুকে অভিসম্পাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি এমন সময়ে দেবেন্দ্রবাবুর পুত্র জ্যোতিরিন্দ্র ও রবীন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রবাবু দিল্লীর দরবার সম্পর্কে একটি কবিতা ও একটি গল্প রচনা করিয়াছিলেন। আমরা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষচ্ছায়ে দূর্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কবিতা ও গল্পটি শ্রবণ করি। রবীন্দ্রনাথ তখনো বালক, তাহার বয়স ষোল কি সতেরো বৎসরের অধিক হয় নাই তথাপি তাহার কবিত্বে আমরা

বিস্মিত ও আপ্লুত হইয়াছিলাম। তাঁহার সুকুমার কণ্ঠের আবৃত্তির মাধুর্যে আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম। একজন সুপরিচিত কবি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দ্রবিত হৃদয়ে বলিলেন, যখন এই কবি প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত হইবেন, তখন দুঃখিনী বঙ্গের একটি অমূল্য রত্নলাভ হইবে।"

এই কবি নবীনচন্দ্র সেন। নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' গ্রন্থের চতুর্থ-ভাগে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন।

"স্মরণ হয় ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে [বস্তুত ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দ] আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকিবার সময়ে কলিকাতার উপনগরস্থ কোনও উদ্যানে "নেশনাল মেলা" দেখিতে গিয়াছিলাম।... একজন সদ্যপরিচিত বন্ধু মেলার ভিড়ে আমাকে 'পাকড়াও' করিয়া বলিলেন যে একটি লোক আমার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া উদ্যানের এক কোণার এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলায় লইয়া গেলেন। দেখিলাম সেখানে সাদা ঢিলা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নবযুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮।১৯, শান্ত স্থির। বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন—'ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। দেখিলাম সেই রূপ, সেই পোশাক। হাসিমুখে করমর্দন কার্যটি শেষ হইলে তিনি পকেট হইতে একটি 'নোটবুক' বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন ও কয়েকটি কবিতা গীতকণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনীলাঞ্ছনকণ্ঠে, এবং কবিতার মাধুর্যে ও স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম।"

যে রবীন্দ্রনাথের যশঃগৌরব উত্তরকালে সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইবে—সেই রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়সে খ্যাতিলোলুপ অকুণ্ঠ মনের সমস্ত উৎসাহ ঢালিয়া তৎকালীন প্রসিদ্ধ কবিদের নিজে যাচিয়া যাচিয়া কবিতা শোনইতেছেন ও গান গাহিতেছেন—এ ছবিটি আমাদের বড় মুগ্ধ করে। কল্পনানেত্রে আমরা দেখিতে পাই হিন্দুমেলায় লোকের ভিড়ের আড়ালে একটি নিভৃত বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান যশঃলোলুপ সলজ্জকণ্ঠ কিশোর রবীন্দ্রনাথকে। নবীনচন্দ্র সেনের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের কথা শেষ হইবার নয়, সে চেষ্টা করিব না। তবে একটি কথা না বলিলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না—সেটি হইতেছে রবীন্দ্রনাথের উপর বিশ্ব-প্রকৃতির অদ্ভুত প্রভাব। তাঁহার সারা কাব্যের মধ্যে আমরা দেখিতে

পাই দুইটি উৎসুক নেত্রের পিপাসু দৃষ্টির পরিচয় ও তাহাদের রস দর্শন করিবার লোকোত্তর ক্ষমতা। উপনিষদের ঋষিরা ভারতের কোন্ সুপ্রাচীন বনান্তস্থলীতে বসিয়া নিভৃত ধ্যানে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, জগতের সত্যমূর্তি 'রসো বৈ সঃ।' কিংবা 'আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি সর্বানি ভূতানি জায়ন্তে।'

আজ এই ব্ল্যাকমার্কেটের দিনে, পরস্পর পদগৌরবলোলুপতার হানাহানির দিনে, স্বার্থান্বেষী ভক্তদিগের মিথ্যাবাদিতার দিনে, কে বুঝিবে উদাসীনতার এই সেই অমর বাণী। প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যে যাঁহারা গন্ধমধুর অন্ধকারের পথে দাঁড়াইয়া বন, আকাশ, নক্ষত্র ও নদীতটকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—'পশ্য দেবস্য কাব্যং ন মমার ন জীর্য্যতি অহো', বিশ্বদেবতার এই অমরকাব্য প্রত্যক্ষ কর, যা কখনো জীর্ণ হয় না, কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। চিরানন্দলোক হইতে আমাদের চির নির্বাসন মানব প্রকৃতির মিলন তীর্থ নাই। আজিকার দিনে রবীন্দ্র সাহিত্যের এই একটি অতি বিরাট দিককে আমরা চিনিতে পারিব কজন? যাঁহাদের পেটে অন্ন নাই, দৈনন্দিন অন্ন-সংস্থানের জন্য যাঁহাদের ছুটা-ছুটি করিতে হয় দু-বেলা, তাঁহাদের বনান্ত শীর্ষে বসন্তের শিহরণ দেখিবার অবকাশ নাই। যাঁহাদের আছে, তাঁহারা সহস্র হইতে লক্ষ, লক্ষ হইতে কোটী-পতি হইবার স্বপ্ন দেখিতেছেন—তাঁহাদেরই বা রবীন্দ্রকাব্যের এই অমৃতলোকে বিচরণ করিবার সময় কোথায়?

কবিগুরুকে আজ আমাদের অভিনন্দন জানাই। তিনি প্রকৃতির সহিত শিশুমনের সংযোগ সাধন করিবার জন্য শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় গড়িয়াছিলেন। মুক্ত বাতাসে ছায়াঘন আম্রকুঞ্জে যাহাতে শিশুরা বসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে, শৈশবের মাহেন্দ্রক্ষণে যাহাতে শিশু দুইচোখ মেলিয়া সুন্দর বিশ্বের দিকে চাহিতে শিখে, ইহাই ছিল তাঁর এই ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা শান্তিনিকেতন অমর হোক ও সেই সঙ্গে আমাদের বস্তুবাদী জীবন যাত্রার পথ কিছু ঘুরিয়া যাক। আমরা যেন রবীন্দ্র উৎসবকে প্রাণশূন্য হুজুকে পরিণত না করি, যেন তাঁহার কাব্য আমাদের করে দৃষ্টিদান এবং সে দৃষ্টির সাহায্যে বিশ্বদেবতার অমর কাব্য যাহার ক্ষয় নাই ও যাহা জীর্ণ হয় না—তাহা পাঠ করিবার ক্ষমতা লাভ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের নামে একটি রাজপথ বা একটি উদ্যান অথবা একটি নগরী করিয়া তাঁহার জন্মদিনে অবকাশ ঘোষণা করিয়া আমরা তাঁহাকে কতটুকু সম্মান দেখাইতে পারিব? তাঁহার অমর কীর্তি তাঁহার রচনাবলী বহু যুগ যুগান্তর লোকে তাঁহার বাণী পৌছাইয়া দিতে

পারিবে। আমাদের ইট কাঠ পাথরের স্মৃতি-স্তম্ভ অতদূর যাইতে পারিবে বলিয়া ভরসা হয় না।

হে অমর কবি, স্বাধীন ভারতের মৃত্তিকায় দাঁড়াইয়া আমরা শুভ ২৫শে বৈশাখে তোমার কথাটি স্মরণ করি। তুমি দেশের মুক্তি সাধনার অন্যতম অগ্রদূত, কিন্তু স্বাধীন দেশকে তুমি দেখিয়া যাও নাই। আজ তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর যেন বিশ্বের মাঝে সগৌরবে দাঁড়াইবার শক্তি আমরা লাভ করি। দেশের গৌরবময় ঐতিহ্য যেন আমাদের আচরণে লজ্জিত হইয়া না পড়ে। আমরা তোমাকে অন্তরের সাদর অভিনন্দন জানাই।

[২০শে বৈশাখ রবীন্দ্র-জন্মদিবসে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত সভার সভাপতির ভাষণ।]

সাহিত্যে-বাস্তবতা

সাহিত্যে দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা একটি বড় জিনিস। একই ঘটনা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে বা পাঠকের মনে বিভিন্ন প্রকার রসের সৃষ্টি করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতার নিমিত্ত যে জিনিসটি বেশী প্রয়োজনীয় সেটি হচ্ছে ভূয়োদর্শন। জীবনের নানা বিচিত্র দিকের সঙ্গে পরিচয় যত নিবিড় হয়ে উঠবে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি তত স্বচ্ছ হবে। তারুণ্যের স্পর্ধায় একদিন যে বিশেষ মতবাদকে নিন্দা করে এসেছি, প্রৌঢ় মনের অভিজ্ঞতার আলোকে সে মতবাদকে শ্রদ্ধা করতে শিখবো। সাধারণ বুদ্ধির পিছনে বুদ্ধির অতীত আর একটি চৈতন্য বিদ্যমান। সাধকের সপ্তম ভূমির মত এই চৈতন্যও দুষ্প্রাপ্য ও দুরধিগম্য। তপস্যা দ্বারা একে লাভ করতে হয়। তেমনি একে বুঝতে হলেও তপস্যার প্রয়োজন। মহাপ্রতিভাশালী বহু লেখকের অনেক রচনা সেজন্যে সাধারণে বুঝতে পারেন না। কেমন করে পারবেন? তিনি যে-লেখকের সংবাদ কথায় বা চিত্রে বা সুরে আমাদের কাছে পরিবেশন করতে চাইবেন, সে-লোক হয়ত তাঁর কাছেও সন্থ পরিচয়ের রহস্য কুহেলিকায় তখনও আবৃত। সে গভীর লোকের খবর ভাষার বন্ধনে বন্দী করে প্রচলিত উপমা-সাহায্যে প্রকাশ করা তাঁর কাছেও তখন একটি কঠিন সমস্যা। হঠাৎ বন্ধনের মধ্যে ধরা দিতে চায় না সে অনুভূতি। অনেক অনুভূতি আবার এত অল্পক্ষণ স্থায়ী যে, তার স্থায়িত্বকালে তাকে প্রকাশ করবার সময় হয় না। স্মৃতির সাহায্যে হারানো মুহূর্তটির আনন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হয়ত তার অখণ্ডতা বজায় থাকে না। হয়ত সেই হারিয়ে ফেলার দরুণ কিছু ভুলচুকও হয়। তবুও প্রতিভাশালী লেখকেরাই তা প্রকাশ করতে সমর্থ তাঁদের প্রকাশ-নিপুণতা দ্বারা, তাদের ভাষার ঐশ্বর্য দ্বারা, তাঁদের সহজাত স্থাপন-ক্ষমতা দ্বারা। অক্ষম লেখকের লেখনী সে জিনিসের নাগাল পায় না। ক্ষমতাবান লেখককেও অবুঝের গালাগাল সহ্য করতে হয়। বহু প্রতিভাশালী লেখকের ভাগ্যেই এ ঘটনা ঘটচে। যাঁরাই আজ সাহিত্যজগতের খবর রাখচেন, তাঁরা এটি জানেন।

আজ রবীন্দ্রনাথের কথা তাই বিশেষ মনে পড়ে।

বাংলার রবীন্দ্রনাথ, বাঙালীর রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় সম্পদ ছিলেন, বাঙালী আমরা এখনো তাকে বুঝতে পারি নি। তাঁর যে বিরাট আদর্শ আমাদের

সামনে হিমালয়ের সমান উঁচু হয়ে অবস্থান করচে তার পাশে মেকী সাহিত্যের ও ধার করা বিদেশী আদর্শের কল্পনাকে বসাতে আমরা যেন লজ্জা বোধ করি; পারিপার্শ্বিককে অগ্রাহ্য করে, আমাদের বাস্তব সমস্যাকে উপেক্ষা করে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে সাহিত্যের আদর্শ আমদানী করতে যেন ইতস্ততঃ করি। উৎকেন্দ্রিক বস্তুনিষ্ঠাই যে সাহিত্যের একমাত্র উপাদান নয়, রবীন্দ্রনাথের পরেও কি বাঙালীকে তা মনে করিয়ে দিতে হবে? রবীন্দ্রনাথকে আমরা আমাদের স্বভাব-সুলভ হুজুক-প্রিয়তার কেন্দ্র না ক'রে তুলে প্রকৃতপক্ষে যে সংস্কৃতির ও যে উদার মন্ত্রের তিনি ঋষি ছিলেন—কি আর্টে, কি জীবনে, কি ধর্মে—আমরা যেন সেই মন্ত্রের সাধনা সুরু করি। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর জাতির নব মেরুদণ্ডের স্রষ্টিকর্তা; আমরা হুজুক করে বেড়াই বটে, সেই মেরুদণ্ডের সন্ধান এখনও পেয়েছি কি?

সাহিত্য সমাজের মাপকাঠি। সমাজের বাস্তবপটভূমিতে যে রস-শিল্প রচিত হয়, শিল্পীমানসের প্রকাশ-ভূমি যাহা, তাহাই সাহিত্য। রাজনীতি আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র সব চেয়ে বড় স্থান অধিকার করে রয়েচে। সমাজের বেশীর ভাগ লোক সকালে উঠে পড়েন দৈনিক খবরের কাগজ। তাতে যে আস্বাদ পান, সাহিত্যের মধ্যেও কি তাকেই খুঁজতে হবে? আধুনিক দিনের সমস্যা নিয়ে সাহিত্য রচিত হতে পারে এবং হচ্চেও। 'রেইন-বো'র মত বড উপন্যাসও তৈরি হয়েচে যুদ্ধের আবহাওয়ায়। প্যারিসে জার্মান অধিকারের দুঃস্বপ্ন লুই ব্রমফিল্ডকে প্রলুব্ধ করেচে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসখানি লিখতে।

কিন্তু পাশ্চাত্যজাতির সমস্যা অন্যরূপ। তারা যত ভীষণ দুঃখ অনাচার সহ্য করেচে বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে, আমরা ততটা দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করি নি। আগস্ট আন্দোলনের ব্যাপক সত্তা ছিল না। যে দুটি জিনিস খুব বেশী দোলা দিয়েচে আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনকে—ব্ল্যাকমার্কেট ও মন্বন্তর—সে দুটি বহু লেখকের উপজীব্য স্বরূপে একই করুণ রাগিণীর একঘেয়ে আলাপের মত বিস্বাদ হয়ে পড়েচে ক্রমশঃ। তবু স্বীকার করতে হবে তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর', প্রবোধ সান্যালের 'অঙ্গার', মনোজ বসুর 'দ্বীপের মানুষ' প্রভৃতি এ সময়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। শাশ্বত সাহিত্যের পথে এ রচনাগুলি পা বাড়িয়ে রয়েচে।

এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে লেখা আসে কবি-মানসের অন্তর্নিহিত তাগিদ থেকে। কবি-মানসের বিভিন্নমুখী গতি থেকে বিভিন্ন ধরনের লেখার

সৃষ্টি। যেদিন বাংলার লেখকেরা দেশের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন, সেদিন সেই প্রসারিত চেতনা তাঁদের বাধ্য করবে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সমস্যা ও সমাজ সমস্যাকে আশ্রয় করে গল্প ও উপন্যাস লিখতে। এই ব্যাপক চেতনার লক্ষণ বহু লেখকের সাম্প্রতিক রচনায় সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেচে। একটি জীবন্ত সাহিত্য বিভিন্ন আঙ্গিক ও মাধ্যমে দেশের সমস্যাগুলিকে ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় করে রেখে দিচ্ছে। বহু লেখার আবশ্যক কি? একখানি সার্থক রচনায় এক এক যুগকে অমর করে রাখে। যেমন সোভিয়েট রাশিয়ার দুঃখদুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেচে ওয়েলেস্কির বিখ্যাত উপন্যাসখানিতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে ভারতব্যাপী বিরাট রাষ্ট্র-আন্দোলনের চিত্রকে অমর করে রেখে গেলেন। এঁদের প্রতিভা এ সব রচনাকে অপূর্ব আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে যুগ প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উন্নীত করে দিয়েচে। চেতনা যে কি ভাবে অমর সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, তার খোঁজ নিতে গেলে ওগুলির সঙ্গে সম্যক পরিচয় হওয়া প্রয়োজন।

একটা যুগ চলে যাচ্চে, ভেঙ্গে যাচ্চে—এ খুব সত্যি কথা। এযুগে স্বভাবতই কবি বা শিল্পী-মানস কিছু অব্যবস্থিত। নতুন সময়ের আভাসে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেচে, এমন মন এখন হয়ত বিরল। হয়ত অত্যন্ত নিকট থেকে দেখচি বলে অনেক নতুন রচনাকে, অনেক দুঃসাহসিক এক্সপেরিমেণ্টকে আমরা বাজে অধুনিকতা বলে ভুল করচি। রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী' সংবাদ যখন রচিত হয়েছিল, তখন সেকালের অনেক বিজ্ঞ সমালোচক বলেছিলেন, "মহাভারতের কথা নিয়ে এ আবার কি রকম কাব্যি?" আমরা আবার যেন প্রশ্নকর্তাদের দলে না পড়ি। কবি-মানস কোন দিন হুজুকের বশীভূত হবেন না। দুদিনের হাততালিকে অবজ্ঞা করলেও তাঁর চলবে। অনর্থক কালাপাহাড়ী যেখানে সেখানে তাঁর সত্য শুভ্র ও কল্যাণদৃষ্টি কখনো সায় দেবে না। শিল্পীর সকল রচনার মধ্যে থাকবে একটি চারিত্র। রচনার ওপর এই চারিত্রের দৃঢ় ছাপই পাঠকের মনে এনে দেবে নিঃসংশয় নির্ভরশীলতা।

এ আমরা যেন আদৌ ভুলিনে যে কোন রচনায় আধুনিক যুগের সমস্যা আছে কিনা, রাজনীতির ক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টি স্বচ্ছ না ঘোলাটে, দুর্ভিক্ষের কথা ঠিক করে বলা হল কিনা—এ সব দেখে সাহিত্য বিচার হয় না। আজকাল নানা কারণে আমাদের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেচে, মন হয়ে এসেচে নিস্তেজ। সমালোচনার আদর্শ অন্য রকম হয়ে দাঁড়াচ্চে। জীবনের শাশ্বত ধ্রুব সত্যকে আমরা এখন অস্বীকার করে চলেচি। যে দেশে গীতার মত সাহিত্য রচিত

হয়েছিল, যা আজ দেড় হাজার বৎসর ধরে স্বকীয় আলোয় উদ্ভাসিত, কতশত মনীষীর ভাষ্য-টীকা-টিপ্পনীর অর্ঘ্যপুষ্পে যা এই দীর্ঘ দিন ধরে পূজিত হয়ে এসেচে—আজ আমাদের দুর্ভাগ্য সেই দেশের সাহিত্যের আদর্শ আমাদের আমদানি করতে হয় সমুদ্রপারের দেশ থেকে। সাংবাদিকতা ও সাহিত্য যে এক জিনিস নয় এ কথা আমরা ভুলতে বসেচি। সেদিনও আমাদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ; যে শুদ্ধ নির্মল পরিবেশ ও উদার শুভবুদ্ধি শিল্পী-মানসের একমাত্র একান্ত প্রয়োজনীয়, তিনি তার আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার মধ্য দিয়ে; তাঁর তপস্যাস্তব্ধ, মৌনমুখর মুহূর্তগুলির মধ্য দিয়ে দিনশেষের কল্যাণ-রাগিণী কেমন নানা ভাবে অরূপের ও রূপের ঐশ্বর্য বিস্তার করেচে তাঁর লেখনীর লীলাবিলাসের ছন্দে, আমরা সাহিত্যকে পলিটিকসের দিন-মজুরাতে নিয়োগ করার পূর্বে একথা যেন একবার ভেবে দেখি।

এত কথা বলবার কারণ যে সম্পূর্ণরূপে ঘটেচে এমন উক্তি আমি করচি না। বাংলা সাহিত্য আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েচে, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের তুলনায় সেটি একটি বিশিষ্ট স্থান। অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্য-রসিকগণ বাংলা সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠেচেন এবং মূল বা অনুবাদের সাহায্যে তাঁরা রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নিজেদের পরিচয় স্থাপন করতে ব্যগ্র এ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য। সেজন্যেই আমাদের অবহিত হতে হবে যেন আমরা সাময়িক উত্তেজনার মোহে পথভ্রান্ত হয়ে না পড়ি। ভারতীয় আদর্শ অম্লান রাখবার দায়িত্ব আমাদেরই হাতে—এ কথা আমরা যেন না ভুলি। নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে যেন পথ দেখে নিয়ে চলি সত্য ও সুন্দরের পেছনে, সাময়িক হুজুক থেকে নিজেদের যেন যথাসম্ভব দূরে রেখে চলি। দেশপ্রেমের এ আর এক দিকের বিকাশ, স্পষ্ট কণ্ঠে এ কথা প্রচার করতে যেন লজ্জিত না হই।

আবার রবীন্দ্রনাথের কথা তুলতে হয়। সাহিত্যে কতবড় আদর্শ তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরে রেখে গেলেন। আজ আমরা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষা করচি ঘরে ঘরে, কিন্তু রসক্ষেত্রে বা শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর পূজা ওভাবে হবে না। হবে যখন আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোক-বর্তিকা হস্তে শ্রেয়ের পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হব। সে যে কতবড় সম্পদ, সে যে কতবড় আদর্শ তার সম্যক মাপকাঠি এখনো আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। তাকেও অনেকটা আমরা অনেকটা হুজুকের পর্যায়ে এনে ফেলেচি।

গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের গর্ব করবার জিনিস রয়েচে। নবতর বাহিনীর অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলি দিকচক্রবালে দেখা দিয়েচে। সেই আশার বাণীটি উচ্চারণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেচি বঙ্গবাণীর বেদীমূলে কয়েকজন শক্তিধর নবীন লেখকের আবির্ভাব। এতে এই প্রমাণ হল যে বাংলার প্রাণশক্তির উৎস আজও তেমনি সজীব, যেমন ছিল মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের যুগে, যেমন ছিল ভারতচন্দ্রের যুগে, যেমন ছিল 'নব বাবু বিলাসের' ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগে, যেমন সেদিনও দেখেছি বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্রনাথের যুগে। এঁরা নব্য-বাংলার প্রাণ-স্পন্দন শুনতে পেয়েচেন। সে সুর বেজে উঠেচে এঁদের লেখায়। যে মাটিতে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন সে মাটি অজর অমর। ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাব্যতাকে তা নিজের মধ্যে বহন করচে।

আর একটি কথা সকলের শেষে বলি।

সাহিত্য আমাদের মনকে অমৃতরস দ্বারা বলবান করচে। তা যে কোন আঙ্গিকের মধ্য দিয়েই হোক না কেন। নিগূঢ় বিশ্ব-রহস্যের অন্তরতম বস্তুটির সন্ধানে যে আনন্দ, যে আনন্দ তার আবিষ্কারে—উপনিষদের ঋষির স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের মন্ত্রে তার রূপ আমরা দেখেছি। সুতরাং এও সাহিত্যের যে একটা বড় দিক তা আমাদের মনে রাখা উচিত। সাহিত্য আমাদের পরিচিত করচে জীবনের চরমতম প্রশ্নগুলির সঙ্গে সেবে আমাদের উদার মৃত্যুঞ্জয় দৃষ্টি ; সকল সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে যে অসীম অবকাশ ও তৃপ্তি আমাদের পরিচিত করবে সেই অবকাশ ও তৃপ্তির সঙ্গে।

"তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।"

যে জ্যোতির মধ্যে বিশ্বদেবের কল্যাণতমমূর্তি অধিষ্ঠিত, আমরা যেন দেবতার সেই জ্যোতিকে—দৈনন্দিন জীবনোত্তীর্ণ বৃহত্তর অনুভূতি ও ভাবকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দর্শন করি। সাহিত্য শুধু রসবিলাস নয়। জীবনের দুঃখ, পরাজয় ও ব্যর্থতার দিনে যে সাহিত্যরসিক পাঠক অচঞ্চল থাকেন, দারিদ্র্যের মধ্যেও যিনি নিজেকে হেয় জ্ঞান না করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস রাখেন, সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া তাঁর সার্থক। জীবন সমস্যাগুলির সমাধানের গূঢ় প্রেরণা যে সাহিত্যে তার মধ্যে আমরা পাব কলালক্ষ্মীর কল্যাণতম মূর্তিটির সন্ধান।

আর্টের পুরোনো রস-চক্রে যদি আমরা এখনও ঘুরপাক খেয়ে মরি, তবে

রবীন্দ্রনাথের মত বড আদর্শের উপযুক্ত মূল্য আমরা দিতে পারবো না। বস্তুনিষ্ঠার নামে বা ছদ্মবেশে যাঁরা সাহিত্যের আদর্শকে ইদানীং বিভ্রান্ত করে তুলেচেন, আমাদের দেশের সত্যিকার সমস্যাকে ও পারিপার্শ্বিকতাকে উপেক্ষা করে যাঁরা সোভিয়েট রাশিয়া নিয়ে মত্ত হয়ে আছেন তাঁরা যেন এসব কথা একবার ভেবে দেখেন। যে সাহিত্যের শিকড় এ দেশের মাটি থেকে রস সঞ্চয় করচে না, সমাজের বা দেশের মনে সে ধরনের সাহিত্যের কোন ফলপ্রসূ আবেদন থাকতে পারে না। এরূপ উৎকেন্দ্রিক বস্তুনিষ্ঠার স্বৈরাচার থেকে বঙ্গভারতীকে তাঁরা যেন মুক্তি দেন, এই আমার একান্ত কামনা।

[কুচবিহারে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় সভাপতির ভাষণ।]

সাহিত্য ও সমাজ

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়, সাহিত্য শাখার সভাপতি মহাশয়, সমবেত ভদ্রমহিলাবৃন্দ ও বন্ধুগণ—প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে সমগ্র উত্তর ভারতের বাঙালী সমাজের সাহিত্যিক প্রতিনিধি। আমার সৌভাগ্য যে, আজ বাংলা দেশ থেকে এই সুদূর মীরাটে এসে সেই সম্মেলনের উৎসব স্বচক্ষে দেখবার সুযোগলাভ করেছি।

আপনাদের সম্মেলনে (বঙ্গ-সাহিত্য শাখার) পৌরোহিত্য করতে আহ্বান করে আমাকে আপনারা যে সম্মান দান করেচেন, সেজন্য সর্ব প্রথমেই আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। এই সম্মেলনে যোগদান করার একটি অন্তর্নিহিত তাগিদ আমার আছে; কারণ লেখকের প্রথম প্রয়োজন বৃহত্তর সমাজ ও গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসা। আপনারা এ সুযোগ দান করেচেন আমাদের, বাংলার সাহিত্যসেবিগণ সকলেই এর উপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন।

বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় সুসংবাদ, এ সাহিত্য 'ক্রমশঃ সমাজ-চেতনায় মুখর হয়ে উঠচে। গত মন্বন্তরের পর থেকে বাংলা সাহিত্যে এই লক্ষণটি অতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেচে আরও বেশি করে। তারাশঙ্কর, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি লেখকগণ এ সম্বন্ধে পথপ্রদর্শক। তাঁদের বৈশিষ্ট্য একদিন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পৃথক অধ্যায় সৃষ্টি করবে। এই সমাজচেতনা ব্যক্তিবোধের সঙ্গে বিরোধিতা করেনি, বরং তাকে আরও বাস্তব ও আরও সক্রিয় ক'রে তুলতে চেয়েচে। সেই সমাজবোধ অনিষ্টকর যা কিনা মানুষের দলবদ্ধ জীবনযাপনের দাবী নিয়ে ব্যক্তিবোধকে ক্ষুণ্ণ করে। সাহিত্যের সবচেয়ে বড় কথা এই ব্যক্তিবোধ। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। মানুষ নিয়ে ইতিহাস, মানুষ নিয়েই সাহিত্য। আশা ও নিরাশার অনুভূতিতে সদাচঞ্চল কতকগুলি মানুষ নিয়েই যেমন সমাজ, তাদের প্রত্যেকের অনুভূতির চরিতার্থতা দিয়েই সমাজবোধের সার্থকতা। চরিতার্থ ব্যক্তিবোধের সমষ্টিতেই সার্থক সমাজ গড়ে ওঠে। অতএব ব্যক্তিবোধ সাহিত্যে অবান্তর নয়, মূল উপাদান। মানুষ আকাশে বাস করে না, সমাজে বাস করে; তাই নভোচারী সাহিত্য তাকে স্বপ্নালু করে তুলতে পারে, জীবনযাপনের সমস্যাসমূহের সমাধানে সাহায্য করতে পারে না।

বাংলাদেশ যখন এতবড় মন্বন্তরের সম্মুখীন হলো, বাংলার রসস্রষ্টা সাহিত্যিকদের মনে তা যথেষ্ট বেদনা ও আবেগের সৃষ্টি করে গেল। তাঁরা প্রথমে চোখ মেলে চেয়ে দেখার সুযোগ পেলেন। কল্পনার রসবিলাস নিয়ে সাহিত্য রচনা করলে তা আজ নিতান্ত অসার বলে পরিগণিত হবে জাতির উগ্র বেদনাবোধের সম্মুখে। জাতিকে তা সাহায্য করবে না। পথ দেখিয়ে দিতে পারবে না। দেশকে জাগাতে হবে। মন্বন্তরের করাল ধ্বংসলীলার মধ্যেও বহু নরনারীকে দিব্য আরামে সোনার পালঙ্কে শুয়ে রাজভোগ খেয়ে মোটরচারী বিলাস-ব্যসনের পঙ্কে নিমজ্জিত থাকতে দেখে তাঁরা বুঝলেন, দেশ সজাগ হয়নি। তাঁরা ঘুম ভাঙানোর ভার নিয়েছিলেন। প্রবোধের 'অঙ্গার', মনোজ বসুর 'দ্বীপের মানুষ' প্রভৃতি সেই ঘুম ভাঙ্গানোর গান। ঘুম ভাঙলো কিনা জানি না, কিন্তু লজ্জিত হলো অনেকে।

আজও অনেকে অভিযোগ করেন, বাংলা সাহিত্যে এখনো সমাজবোধ, রাষ্ট্রীয় চেতনা প্রভৃতি অঙ্কুর অবস্থায় মাটি থেকে উঁকি মারচে মাত্র। এত বড আগস্ট আন্দোলন, জাতীয় আন্দোলন এতটুকু দোলা দেয়নি কথাসাহিত্যিকদের মনে। কোথায় সেই বিপ্লবের সাহিত্য, যা দেশকে বল দেবে, দেশবাসীর মনে আশা ও উৎসাহ আনবে, পথ দেখিয়ে দেবে। দু-একজন উন্নাসিক সমালোচক এ নিয়ে সাময়িক পত্রে শুধু অভিযোগ করেই ক্ষান্ত হন নি, বাংলা সাহিত্যিকদের অক্ষমতার ইঙ্গিতও করেচেন।

বাংলার সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে কোন প্রত্যুত্তর দেওয়ার আবশ্যক নেই। লেখা আসে কবিমানসের অন্তর্নিহিত তাগিদ থেকে। কবিমানসের বিভিন্নমুখী গতি থেকে বিভিন্ন ধরনের লেখার সৃষ্টি। যেদিন বাংলার লেখকেরা দেশের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন, সেই প্রসারিত চেতনাই তাদের বাধ্য করবে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সমস্যা ও সমাজ সমস্যাকে আশ্রয় করে গল্প ও উপন্যাস লিখতে। এই ব্যাপক চেতনার লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেচে বহু শক্তিশালী লেখকের সাম্প্রতিক রচনায়। আমরা পেয়েছি দুর্ভিক্ষ, পেয়েছি আগস্ট আন্দোলন। একটি জীবন্ত সাহিত্য বিভিন্ন আঙ্গিক ও মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলি ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় করে রেখে দিচ্চে। বহু লেখার আবশ্যক কি? একখানি সার্থক রচনায় এক এক যুগকে অমর করে রাখে, যেমন সোভিয়েট রাশিয়ার দুঃখ-দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেচে ওয়েলেস্কির 'দি রেনবো' নামক উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে ভারতব্যাপী বিরাট রাষ্ট্র আন্দোলনের চিত্রকে

অমর করে রেখে গেলেন। এঁদের প্রতিভা ঐ সব রচনাকে অপূর্ব আঙ্গিকের মধ্যে দিয়ে যুগ প্রয়োজনের উর্ধ্বে উন্নত করে দিয়েচে। গণ-চেতনা যে কিভাবে অমর সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, তাঁর খোঁজ নিতে গেলে ওগুলির সঙ্গে সম্যক পরিচয় হওয়া প্রয়োজন।

সাহিত্যের মাপকাঠি হচ্চে তার রসোত্তীর্ণতা। যুগের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে জীর্ণ পুঁথির পাতার মত অবহেলিত হয় যে রচনা মানব-মনের প্রয়োজন-সাম্য যা বজায় রাখতে পারে না, তার দুর্গতির কারণই হচ্চে রসোত্তীর্ণতার অভাব। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে সেই বিষয়টি রসোত্তীর্ণ করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে অনেক ক্ষেত্রেই। নিজের ব্যথাবোধ ও নিপীড়িত চেতনা কবিমানসকে যে রচনায় উদ্বুদ্ধ করে, তার প্রতি ছত্রে ফুটে ওঠে অনুভূতির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। আজ যে ব্ল্যাকমার্কেট, যে অসংযত অর্থলোলুপতা, যে বস্ত্রদৈন্য, অন্নকষ্ট দেশব্যাপী হয়ে উঠেচে তাকে নিছক কল্পনাবিলাসের সাহিত্য এখন অসার বলে পরিগণিত হবেই, সঙ্গে সঙ্গে লেখকদের মধ্যে ফুটে উঠচে নবচেতনা, দৃষ্টিভঙ্গীর নবীনতা, দৃঢ় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সুনির্দিষ্ট আদর্শ। এসব যে এখনও দানা বাঁধেনি, এ খুব সত্য কথা। নূতন পরিপাক করতে সময় লাগে। সাহিত্য পরিপাক করতে সময় লাগে। সাহিত্য সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভের রচনা নয় বা রাজনৈতিক প্রচারপত্র নয়, মনের থেকে সত্য ও বাস্তব না হয়ে উঠলে লেখকের হাত দিয়ে যে রচনা বেরোয়, তার রসোত্তীর্ণতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না—সুতরাং লোকের হাততালি, বাহবা বা পরামর্শদাতা সমালোচকদের বিজ্ঞ পরামর্শের প্রভাবে বা অতি আধুনিক যুগস্রষ্টা আখ্যায় ভূষিত হবার লোভে বা তুরা·'য় যাঁরা এ পথে অগ্রসর হবেন, তাঁরা ঠকবেন। সাংবাদিকদের ধর্ম, সাহিত্যিকের পক্ষে পরধর্ম ; এটা তাঁরা জানেন এবং জানেন বলেই আজও আমরা বাংলা সাহিত্যে আশানুরূপ সন্ধান পাচ্চি না আধুনিক দিনের উগ্র সমস্যাগুলির। কিন্তু দিকচক্রবালে নব-বাহিনীর অশ্বখুরোত্থিত ধূলি দেখা দিয়েচে, ওদের শঙ্খধ্বনি দূর থেকে আমাদের কর্ণে এসে ধ্বনিত হচ্চে, ওরা আসচে, হতাশার কারণ নেই। বিজ্ঞ সমালোচকদের দীর্ঘশ্বাস এবং 'কিছু হচ্চে না, কিছু হচ্চে না' ধ্বনির উত্তর এরা দেবে।

আর একটা বড লক্ষণ দেখতে পাচ্চি আমাদের সাহিত্যে। আধুনিক বা পাশ্চাত্যের গণ্ডি বাংলার শ্যাম গ্রামাঞ্চল ছাড়িয়ে বাইরে ছড়িয়ে পডেচে, বাংলার বাইরের বহুদেশের পটভূমিকার আশ্রয় করে। বাংলার বেণুকুঞ্জ ও

বৃহত্তর বাংলার অরণ্য-পর্বত, মরুদেশ, কঙ্করময় রুক্ষ মালভূমি সবই তার সমান আদরের বস্তু। মানুষের মধ্যে যে লেখক, যে শিল্পী বাস করে, তার কাছে দেশ বা জাতের কোন সীমানা নেই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বড় লক্ষণ এই যে, আজ সে উদার মুক্তির ব্যাপ্ত নীলাকাশতলে এসে দাঁড়িয়েচে কি গল্পে, কি উপন্যাসে, কি কবিতায়। এ পথে খনিত্র ধরে আগুয়ান হবেন যাঁরা, তাঁদের কত দল মরু-প্রান্তরে বেঘোরে মারা যাবেন জানি, কত লোকের পাত্তা খুঁজে পাওয়া যাবে না, তবু তাদেরই কপালের ঘামে পথের ধূলো দেবে ভিজিয়ে, একটা সুদির্দিষ্ট পথরেখা ফুটে উঠবে ওদের গীতিপ্রাণ চরণ-ক্ষেপের ধ্বনির তালে তালে।

এই খনিত্র বাহিনী নতুন সাহিত্য রচনা করেচে, যে কোন মাসিকপত্র খুঁজে দেখলে এদের গল্প পাওয়া যাবে, কবিতা পাওয়া যাবে, উপন্যাস পাওয়া যাবে। বহু তিরস্কারের মধ্যে দিয়ে এদের সার্থকতা আসবে একদিন। বহু ব্যর্থতা এদের প্রাণশক্তিকে আরও দৃঢ়, আরও সংহত করে তুলবে। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস হয়তো এদের সম্বন্ধে নীরব থাকবে, জয়-বিজয়ের ইতিহাসে নাম থাকে সম্রাটদের, সেনাপতিদের, খনিত্র বাহিনীর লোকদের নাম তাতে লেখা থাকে না। তাতে কি? আমরা আজ এদের অভিনন্দন জানাই। এদের ক্রমবিকাশের পারম্পর্য আজ আমাদের কাছে পরিস্ফুট নয়, কারণ আমরা এ যুগেরই অধিবাসী, এত নিকটে থেকে দেখতে গেলে অনেক সময় অনেক দুঃসাহসিক এক্সপেরিমেণ্টকে নিছক বাজে আধুনিকতা বলে ভুল করার বিপদ আমাদের পদে পদে। বাংলার উপন্যাস সাহিত্য সত্যিই পেছনে পড়ে আছে অন্য দেশের উপন্যাসের তুলনায়। মননশীল উপন্যাসের কথা বাদই দিলাম, কিন্তু শুধু ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের ক্ষেত্রেই, যে ঘটনাপ্রধান উপন্যাস বহু আধুনিক সমালোচকের চক্ষুশূল এবং যে পর্যায়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি ফেলতে দ্বিধা করেন না, সেই ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের ক্ষেত্রেই বা টলস্টয়ের War and Peace বা ডস্টয়ভস্কির Brother Karamzov-এর মত উপন্যাস কোথায়?

অবশ্য একটা আশার কথা এখানে বলে রাখি। বৈদেশিক সাহিত্যেও আদর্শস্থানীয় মননপ্রধান উপন্যাসের সংখ্যা হাতে গুণে ঠিক করা যায়। গত মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপীয় সাহিত্যক্ষেত্রে ফরাসী লেখক ও সমালোচক জুলিয়ান বেন্দা এই মননপ্রধান কথাশিল্পের ক্ষেত্র তৈরী করেন, তাঁর আন্দোলনকে তখন

অনেকে সাময়িক হুজুগ বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আজ এই শ্রেণীর উপন্যাস ইউরোপীয় সাহিত্যে ক্রমশঃ দেখা দিতে শুরু করেচে। যদিও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, নামজাদা ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে প্রায় সকলেই সাবেক পন্থী। ওদেশের পাঠক মনেরও গ্রহীষ্ণুতার প্রসারতা যে আমাদের দেশের চেয়ে বেশী নয়, বৃটিশ সাহিত্যের দরবারে জয়েসের মত খাঁটি মননপ্রধান লেখকের অভ্যর্থনা লক্ষ্য করলেই সেটি অনুমিত হয়।

শরৎচন্দ্রের কিছু পূর্ব থেকে আমাদের সাহিত্যে একটা অস্পষ্ট ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুর ধ্বনিত হচ্ছিল। ব্যষ্টি সমষ্টির মুখ চেয়ে কেন নিজের সুখ-সুবিধা বিসর্জন দেবে এই একটি কঠিন সমস্যামূলক প্রশ্ন ক্রমশঃ ঠেলে উঠছিল সাহিত্যে—শরৎ-সাহিত্যে সেই ব্যষ্টিকেন্দ্রের সুর অতি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এইটিই আসলে শরৎ-সাহিত্যের মূল সুর। সহৃদয়তা ও মানবতা শরৎ-সাহিত্যের আর একটি সুর।

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ বইগুলির রচনা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেচে তখন বাংলা সাহিত্যে একটি আন্দোলন সুরু হলো, এই আন্দোলনটি অতি উগ্রভাবে ব্যষ্টিকেন্দ্রিক। 'কালি-কলম' ছিল এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দিগের অন্যতম মুখপত্র। ব্যক্তিত্বের উদ্দাম সাধনাই এই সময়ের বহু গল্প ও কবিতার মূলতত্ত্ব। ঐ একই মূলতত্ত্বের অঙ্গ হিসেবে নানা যৌন সমস্যা বাস্তব বা কাল্পনিক, বিভিন্ন রঙে প্রতিফলিত হয়ে দেখা দিতে লাগলো পাঠকদের সামনে। এই আন্দোলন যথেষ্ট তিরস্কৃত হয়েছিল সে সময়, সে কথা সে যুগের পাঠকের অজ্ঞাত নয়, কিন্তু সেই নব আলোড়নের সংহত শক্তি বাংলায় একদল নতুন শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা তৈরী করেছিল। লেখকদের নব দৃষ্টিভঙ্গী অলক্ষ্যে আশ্রয় করেছিল পাঠকদের। সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বড় সুলক্ষণ এই যে, নব আন্দোলনের লেখকরা গ্রহীষ্ণু পাঠকদল সৃষ্টি করেন। যাদের রসবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ব যুগের পাঠক সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক অগ্রসর। শরৎপূর্ব বা রবীন্দ্রপূর্ব যুগের উপন্যাস বর্তমানের অতি তরুণ পাঠক-পাঠিকার কাছে জোলো এবং ফিকে ঠেকবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অবিশ্যি এ পর্যায়ে পড়ে না—তিনি ছিলেন যুগপ্রবর্তক আচার্য, তাঁর অসামান্য প্রতিভা সাধারণ লেখকদিগের দুরধিগম্য, তাঁর দুঃসাহসিকতা এখনও পর্যন্ত বাঙ্গালার লেখকদের নিকট আদর্শস্থানীয় হয়ে আছে এবং চিরকাল থাকবে।

কবি বা শিল্পী মানসের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ থেকে রসসৃষ্টি সম্ভব হয়। এবিষয়ে শিল্পীর স্বাধীনতা অনস্বীকার্য। অন্তর্নিহিত প্রেরণা ভিন্ন শিল্পী কখনও অগ্রসর হবেন না। বাইরের লোকের তাগিদে বা বিরুদ্ধে সমালোচনার ভয়ে বা সস্তা হাততালি পাওয়ার লোভে অতি আধুনিক হওয়ার যে চেষ্টা, লেখকের পক্ষে তা মৃত্যুর পথ। এই কথাটি আমাদের সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। এটি একটি বড় সত্য সাহিত্য ক্ষেত্রে এবং এই সত্যটি না মানার দরুণ বহু তরুণ আশাবাদী লেখকের ও লেখিকার ক্ষমতাকে বিপথে গিয়ে নষ্ট হতে দেখেছি। সাহিত্যের চক্ষেও অন্যান্য মত শক্তিকে ও অভিজ্ঞতাকে অর্জন করতে হয় সাধনার দ্বারা। তখন অন্তর্দৃষ্টি আপনিই খুলে যায়, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অপরের বই পড়ে লাভ করতে হয় না—আপনি এসে আশ্রয় করে শিল্পীকে। এ যেন যোগীর তৃতীয় নয়ন খুলবার মত ব্যাপার। কিন্তু যতক্ষণ সেই দুর্লভ ঘটনা ঘটবে ততক্ষণ শিল্পী যেন কারো প্রসংসার লোভে বা ধমকের ভয়ে স্বধর্ম ত্যাগ না করেন। এতে যদি তাঁর অদৃষ্টে হাততালি না জোটে, নাই জুটবে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—আত্মসংজ্ঞাহীন ভীরুচিত্ত শিল্পী নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনেন।

লেখক ও কবির মধ্যে একটি সহজাত নিঃসঙ্গতা আছে। দৈনন্দিন জীবনোত্তীর্ণ বৃহৎ আনন্দলোকের আবাহন তাঁদের লক্ষ্য, যার জন্যে লেখকের প্রয়োজন আপনার ভাবজগতের মধ্যে যত বেশীক্ষণ সম্ভব এবং যত গভীরতমরূপে সম্ভব বাস করা। নিরাসক্ত আনন্দের বা দুঃখের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি। আপনাকে প্রতি মুহূর্তে পূর্ণ করে ও প্রতি মুহূর্তে অতিক্রম করে তিনি অগ্রসর হন। চারিপাশের মানবহৃদয়ের অন্তরতম স্পন্দনটিকে তিনি প্রকাণ্ড ভাবের অনুভবের চেষ্টা করেন বলেই তো তাঁদের শ্রেষ্ঠ প্রেরণার ক্ষণে যখন কথা বলেন, তখন তাঁর মধ্যে বিশ্বমানবের কণ্ঠ বেজে ওঠে, জীবনের মূলতম রহস্যের আবেগ একান্তভাবে সঞ্চারিত হয়। বাস্তবকে বুঝতে হলেও দূর থেকে তাকে দেখতে হয় লোকলোচনের অতি স্পষ্ট পাদপ্রদীপের সামনে অনুক্ষণ থেকে তা সব সময় সম্ভব হয় না। এর জন্যে চাই নির্জনতা, খৃষ্টের চল্লিশ দিনের নিঃসঙ্গ অবকাশ, বুঝবার ও বোঝাবার প্রয়াসে তপস্যা। সৃষ্টির আনন্দ আসে যে বিরাট অনুভূতি থেকে—যাকে বলেছেন আনন্দ—"আনন্দাদ্ধেব খলু ইমানি সর্বানি ভূতানি জায়ন্তে"—সে আনন্দ সহজপ্রাপ্য নয়, সে আনন্দ আপন রস আহরণ করে

বিশ্বের তাবৎ সৌন্দর্যরাজির মধ্যে থেকে, পুরাতন সৃষ্টির নব উদ্বোধনের দ্বারপথে তপস্যা ভিন্ন সে জগৎ, সে পথ চির অপরিচিতই থেকে যায়। এক শীতের নির্জন অপরাহ্নে ছন্নছাড়া দরিদ্র সরাইখানা ও সরাইওয়ালীর দুঃখময় জীবন আলফাঁস দোদের মনে যে করুণ অনুভূতি, যে ব্যথা ও বেদনাবোধ জাগিয়েছিল, আমাদের মনেও সেই জীবনের ছবিটি রেখাপাত করে গেল, কারণ—লেখকের অনুভূতি তাঁর তপস্যাভূমি সেই সরাইখানার প্রাঙ্গে। একটি শীতের সন্ধ্যায় জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। এযুগেই হোক বা সে-যুগেই হোক, নিজের রচনা সম্বন্ধে প্রত্যেক লোক সচেতন থাকেন। কবিমানসের রসবোধ থেকে এ চেতনার উৎপত্তি। সর্বপ্রথম তাঁর নিজের তৃপ্তির জন্যে লেখেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কমবেশী পরিমাণে একটি মানুষ আছে, যে নাকি স্বপ্ন দেখে, কোনো ক্ষণে আদর্শবাদের বা অভিজ্ঞতার অভিঘাতে তীব্র প্রেরণা অনুভব করে, জীবনের ধ্যানে সহসা হয় উন্মনা। রস-সাহিত্যের প্রধান কথা হচ্ছে এই স্বপ্নালু লোকটির তৃপ্তিবিধান করা। পাঠকের কথা ওঠে তার পরে। সাংসারিক সামাজিক প্রশ্ন ওঠে তার পর।

কিন্তু সহানুভূতিসম্পন্ন শিল্পী মানস যুগের স্পর্শ এড়িয়ে চলতে পারে না। যে সময় যে যুগে তিনি জন্মেছেন তার সার্বিক অভিজ্ঞতা তাঁর নিজেরও। লোকান্তরিত ছবি আঁকবার সাধ্য তাঁর নেই। রাষ্ট্রনীতিক বা সামাজিক অভাববোধ বা অভিজ্ঞতা তাঁকে সুদৃঢ়ভাবে আত্মপ্রত্যয়ী হতে দেয় না। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য এক শ্রেণীর শ্রেণীচেতনাকে আশ্রয় করে স্থির পথে অগ্রসর হচ্ছে, যে শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে শ্রেণীচেতনা জড়িত, তাদের মধ্যে লেখনী ধরবার যদি কেউ থাকে, ভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের মধ্যে যাদের জন্ম তাঁদের রচনায় পূর্বোক্ত শ্রেণীর বক্তব্য ফুটে উঠবে কি না তা সার্থক বা পরিপূর্ণ কি না, এসব মূল্যবিচার বর্তমানে করে কোনো লাভ নেই। সময়ের কষ্টিপাথরে এ সবের মূল্য নির্ধারিত হবে একদিন। তবে একটা কথা, দলের হুজুগে বা মতবাদের হুজুগে কেউ যেন এ শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করতে না যান। তিনি ঠকবেন।

আত্মসমাহিত শিল্পী মানসের স্বনিহিত প্রেরণা থেকে যে সাহিত্য রচিত হয় না, তার মূল্য বড় কম। দুদিনের হাততালির পরে তা নিঃশব্দে যায় মিলিয়ে। এ দায়িত্ব তাঁর নিজের কাছে নিজের, পাঠক গোষ্ঠীকে সচেতন করবার পূর্বে তাঁকে বিচার করে দেখতে হবে তিনি নিজে এসম্বন্ধে কতদূর সচেতন। তাঁর কবিমানস তৃপ্ত হয়েছে কি না। আমার নিজের কাছে এ

কথাটি সবচেয়ে বড় মনে হয়, যিনি যাই নিয়েই লিখুন না কেন, প্রত্যেক রস-সাহিত্যিকের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। তাঁর নিজের কাছে যা পরিস্ফুট নয়, যা তাঁর কবিমানসকে তৃপ্ত করে না, জনসাধারণের কাছে প্রশংসা পাওয়ার লোভেই হোক বা সমালোচকের ভয়েই হোক, তেমন সৃষ্টিতে তিনি কখনো হাত দেবেন না। তাঁর মন তখনই সক্রিয় হয়ে উঠবে, যখন তিনি বুঝবেন তাঁর সমগ্র ব্যক্তি সত্তাকে আশ্রয় করে এ লেখা তৈরী। এ কঠিন আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের জন্যে চান সাহস, যা প্রত্যেক সত্যিকার সাহিত্যিকেরই আছে। নতুবা তিনি লেখক হোতেই পারতেন না। সাহিত্য ও আর্টের মস্তবড় কাজ সমসাময়িক সমস্যার উল্লেখ করা, সমাজসচেতন হওয়া, জনগণের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়া নবদৃষ্টিভঙ্গীর আবাহন—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে তাদের অপর উদ্দেশ্য হচ্চে সৌন্দর্য সৃষ্টি, যা সমসাময়িক সমস্যারও অতীত। স্বধর্ম ত্যাগ করা অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের ন্যায় আর্টের ক্ষেত্রেও ভয়াবহ।

গভীর রহস্যময় এই মানবজীবন। এর সকল বাস্তবতাকে, এর বহু বিচিত্র সম্ভাব্যতাকে রূপ দেওয়ার ভার নিয়েছেন কথাশিল্পী। তাঁকে বাস করতে হবে সেখানে মানুষের হট্টকোলাহল যেখানে বেশী, মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের সুখদুঃখকে বুঝতে হবে। যে লেখক পাশের বাড়ীর প্রতিবেশীর সত্য চিত্র এঁকেচেন, তিনি সকল যুগের সকল মানুষের চিত্রই এঁকেচেন।

এত বড় মন্বন্তর ঘটে গেল বাংলাদেশে, অথচ চিত্রে ও রঙ্গমঞ্চে আমরা তার কি ছবি পেলাম? আমরা পেলাম নায়িকার নাকেকান্না প্যান-প্যানানি গান, মিষ্টি মিষ্টি কথায় নায়কের প্রেমনিবেদন আর মান্ধাতার আমলের যাত্রার পালার ট্র্যাডিশনে কতকগুলি পৌরাণিক নাটক। অথচ যাঁরা পুরাণ রচয়িতা জনগণকে বাদ দিয়ে তাঁরা চলেন নি। পুরান দিনের গণমনের কত ব্যথা-বেদনার ইতিহাস ব্যাস-বাল্মিকীর অমর মহাকাব্যগুলির মধ্যে অক্ষয় হয়ে আছে—কত গাথা, কত কাহিনী, কত কথা। সে যুগের পটভূমিকায় রচিত কথাশিল্প হচ্চে ওগুলি, যে কথা ভুলে গেলে চলবে না। সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল কত গাথা, কত কাব্য—রাজসভায় মহাকবি সেগুলি আবৃত্তি করে যেতেন শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে।

এইজন্যে পুনরায় বলি সমাজ-সচেতনতা লেখকের মস্তবড় গুণ। যিনি দেশের অভাব-অভিযোগের প্রতি উদাসীন থেকে সাহিত্য রচনা করেন, তিনি নিজের কবিমানসের প্রতি অবিচার করেন। জীবনবোধের দায়িত্ব তিনি

কিছুতেই এড়াতে পারেন না, জনসাধারণের প্রতিঘাতমুখর জীবনধারা হইতে বহুদূরে একটি কল্পলোক সৃষ্টি করে তিনি কল্পনাবিলাস চরিতার্থ করতে পারেন, কিন্তু জীবনের ওপর তার কোন স্থায়ী ফল ফলে না।

গল্পে ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের হতাশার কারণ নেই, নবতর অশ্ববাহিনীর অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলি দিকচক্রবালে দেখা দিয়েচে, আগেই বলেছি। আর একবার সেই আশার বাণীটি উচ্চারণ করে আমি বক্তব্য শেষ করবো। এই তরুণ লেখকের অভ্যুদয়কে আমি অভিনন্দন জানাই। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করচি কয়েকজন শক্তিধর নবীন পূজারীর আবির্ভাব। এতে এই প্রমাণ হলো যে, বাংলার প্রাণশক্তির উৎস আজও তেমনি সজীব যেমন, তা ছিল মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের যুগে, যেমন ছিল ভারতচন্দ্রের যুগে, যেমন ছিল নব বাবু বিলাসের ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগে, যেমন ছিল বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্রনাথের যুগে। কলালক্ষ্মীর অর্ঘ্য এঁরা নিপুণহস্তে রচনা করেচেন, এঁরা নব্যবাংলার প্রাণস্পন্দন শুনতে পেয়েচেন, এঁদের লেখার মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠেচে সে প্রাণস্পন্দনের সুর। যে মাটিতে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, সে মাটি অজর অমর। ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাব্যতাকে তা নিজের মধ্যে বহন করচে।

আর একটা কথা। সাহিত্য আমাদের পরিচিত করবে নিগূঢ় বিশ্ব-রহস্যের সঙ্গে, জীবনের চরমতম প্রশ্নগুলির সঙ্গে, দেবে আমাদের উদার, মৃত্যুঞ্জয় দৃষ্টি, সকল সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে যে অসীম অবকাশ ও তৃপ্তি, আমাদিগকে পরিচিত করবে সেই অবকাশের সঙ্গে—এও সাহিত্যের একটা মস্তবড় দিক। তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি যে জ্যোতির মধ্যে বিশ্বদেবের কল্যাণতম মূর্তি অধিষ্ঠিত, আমরা যেন দেবতার সেই জ্যোতিকে, দৈনন্দিন জীবনোত্তীর্ণ বৃহত্তর ভাবকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দর্শন করি। জীবনের দুঃখের দিনে যে সাহিত্যরসিক অচঞ্চল থাকেন, শোকের মধ্যেও যিনি নিজেকে শান্ত রাখতে পারেন, দারিদ্র্যের মধ্যে যিনি নিজেকে হেয় জ্ঞান করেন না, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস রাখেন—সাহিত্যপাঠ তাঁরই সার্থক। সাহিত্য শুধু রসবিলাস নয়, জীবন সমস্যার সমাধানের গূঢ় ইঙ্গিত থাকবে সাহিত্যের মধ্যে, তাঁরই মধ্যে আমরা পাবো কলালক্ষ্মীর কল্যাণতম মূর্তিটির সন্ধান।

জাত লেখক যিনি, তিনি কখনো নিজের আদর্শ ত্যাগ করে পরধর্মকে আশ্রয় করেন না, একথা ঠিকই। তাঁর শিল্পীমানস যে রচনাদ্বারা তৃপ্তিলাভ

করবে না, সে লেখা তিনি কখনো লিখতে পারেন না। সাহিত্যের বিশাল উদারক্ষেত্রে সব শ্রেণীর লেখার স্থান আছে, সব রকম মতবাদের স্থান আছে। অমুক লেবেলে আঁটা সাহিত্যই আসল সাহিত্য, আর সব অপাংক্তেয়—এমন গোঁড়ামি সাহিত্যের ক্ষেত্রে মারাত্মক। সাহিত্যিকের চাই সেই সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, সেই উদার সহানুভূতি, যার ফলে জীবনকে অখণ্ডরূপে তিনি বুঝতে ও জানতে পারেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও সেই সহানুভূতিই তাঁর স্থাপন-ক্ষমতার মোড় ফিরিয়ে দেবে। সমাজ, দেশ, রাজনীতি সবকিছুরই রূপ সাহিত্যে ফুটে উঠবার অধিকার আছে, যদি তা রসোত্তীর্ণ হয়। রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের একমাত্র মাপকাঠি, এ কথা যে কোন সাহিত্যিক জানেন, যে কোন শিল্পী মানেন।

পরিশেষে যাঁরা অনুগ্রহ করে আমায় এ সভায় এনে আমার বক্তব্যটি বলবার সুযোগ দিয়েছেন, তাঁদের আর একবার ঐকান্তিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বন্দে মাতরম্।

[মীরাটে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ।]

চিঠি-পত্র

১

৪১, মির্জাপুর স্ট্রীট
৩রা আশ্বিন, '৪৭ সাল, বৃহস্পতিবার

কল্যাণীয়াসু,

আজই ওবেলা তোমার পত্র পেলুম এবং তোমার শরীর ভাল আছে জেনে আনন্দ হলো। তোমার রাগের আমি মূল্য দিইনে, কল্যাণী? তোমার রাগের ভয়ে কতবার যা তুমি বলেচ তাই শুনেচি। তবে সেদিন ওই ব্যাপারটা ছিল তাই তোমার সাগ্রহ আহ্বানের সম্মান রাখতে পারি নি, সেজন্য কিছু মনে করতে পারবে না কিন্তু। কিছু মনে আসে যদিও, স্নেহভরে উপেক্ষা করো।

সেদিন ওরা মানপত্রের সঙ্গে এই যে চিঠির কাগজে তোমায় লিখচি, এরকম তিনশো কাগজের প্যাড বাঁধিয়ে দিয়েচে—নাম ছাপানো সুদ্ধ। আর দিয়েছে একটা পার্কার vacumatic পেন, একটা রুপোর সিগারেট কেস। এ ছাড়া অনেক ফুস, মালা, ফুলের তোড়া ইত্যাদি। অনেক লোক এসেছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেছিল। গান, আবৃত্তি প্রবন্ধ-পাঠ, কবিতা-পাঠ হয়েছিল। যখন জিনিসগুলো নিয়ে বিশেষতঃ ফুসগুলো নিয়ে মেসে ফিরলুম, তখন তোমার কথা এত মনে হচ্ছিল! তুমি থাকলে ফুলগুলো দিয়ে দিতুম, জিনিসগুলো দেখাতুম, মায়াকে সভায় আনবো ভেবেছিলুম—কিন্তু তারাশঙ্কর আর একটা কোথাকার সভা সেরে কখন আসবে তার স্থিরতা ছিল না বলে মায়াকে আনা হয় নি—বিশেষ করে বেলা ২॥০ টার সময় বৌবাজারে আমায় 'কৃষ্টিকলা' সাহিত্য সমিতিতে সভাপতিত্ব করতে হয়েছিল। মায়াকে আনার সময়ই পাওয়া গেল না।

ধূমকেতু দেখার সুযোগ ঘটে নি। ছেলেবেলায় হ্যালির ধূমকেতু উঠেছিল শুনেচি মাত্র, কিন্তু তখন খুব ছেলেমানুষ, পাড়াগাঁয়ে থাকি—কেউ দেখায় নি। সে আজ ত্রিশ বছর আগের কথা। তোমার ভাল লাগবে বলে তোমার ফরমাশ মত তো ধূমকেতু উঠতে পারে না। এখনও ৪৫ বছর দেরি আছে আবার সেটা ফিরে আসতে। ততদিন অপেক্ষা কর।

এখন তোমার বয়েস ১৫ তো? ১৫+৪৫=৬০ বছর যখন তোমার বয়েস

হবে, তখন যদি ধূমকেতু দেখতে পাও—আমার কথা তোমার মনে হবে কি তখন? আমি তখন মরে ভূত হয়ে যাবো। তুমি তখন বৃদ্ধা, নাতিপুতি বেষ্টিতা হয়ে গল্প করবে বসে সন্ধ্যাবেলায়। নাতনীকে আঙুল দেখিয়ে বলবে—ওই ছাখ রেখা, হ্যালির ধূমকেতু উঠেচে—বিভূতিবাবু বলে একজন লোক আমার ছেলেবেলায় আমায় বলেছিল, এ ধূমকেতু আমি দেখবো। আজ বিভূতিবাবুর কথা তাই মনে পড়চে।

রেখা বলবে—কে বিভূতিবাবু ঠাকুরমা?

তুমি বলবে—ওই আমাদের সেকেলে একজন লেখক ছিল, বেশ বইটিই লিখতো—

রেখা ভবিষ্যত যুগের মেয়ে তো—তাই ছোট বোন শিপ্রার দিকে চেয়ে মুচ্‌কি হেসে বলবে—ঠাকুরমার যেমন কথা ভাই! কোথাকার কে বিভূতিবাবু, সে নাকি আবার বই লিখতো! আমাদের নবজীবনবাবু কি প্রদীপবাবুর মত লেখক কোন কালে বাংলা দেশ দেখেচে? ঠাকুরমার সব সেকেলে ঢং—তারপরে দুইবোনে খিলখিল করে হেসে উঠবে।

আর আমি? কোথায় তখন আমি?...হায় রে!

মৃত্যুলোকের পার থেকে হয় তো সস্নেহ দৃষ্টিতে ভবিষ্যত যুগের নবীনা বালিকা দুইটির দিকে চেয়ে ভাববো—একদিন ওদের ঠাকুরমা ওইরকম বালিকা ছিল, ওদের মতই। তার নাম কল্যাণী—কিন্তু নাতনীরা হয়তো সে নাম জানে না। বুড়ী ঠাকুমার নাম জানবার জন্য তাদের তত আগ্রহ নেই, নিজেদের প্রসাধন নিয়েই ব্যস্ত। তরুণ মাত্রেই স্বার্থপর কিনা—নিজেদের কথা ছাড়া অপরের কথা ভাববার অবকাশ বা স্পৃহা ওদের বড় একটা থাকে না।

জ্যোৎস্নার কথা তুমি লিখেচ, আমার ভাই লিখেচে ঘাটশিলার মাঠবন জ্যোৎস্নালোকে অদ্ভুত হয়েছে দেখতে, সেবা লিখেচে শিলং-এ এবারে নাকি অদ্ভুত জ্যোৎস্না। গত শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না নিশ্চয় খুব অদ্ভুত না হলে তিন জায়গা থেকে তিনজনে লেখে নি—কিন্তু হায়! আমি জ্যোৎস্নার এতটুকু দেখি নি। আকাশের চাঁদ দেখেচি হয় তো, ভেবেচি—আজ দেখেচি চাঁদ বেশ বড়, বোধ হয় একাদশী কি চতুর্দশী তিথি হবে—এই পর্যন্ত। সে চাঁদের জ্যোৎস্না মাটির পৃথিবীতে পড়তে দেখি নি—বেচারী চাঁদের সাধ্য কি বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতম সুসভ্য শহর কলিকাতার বৈদ্যুতিক আলোর ব্যূহ ভেদ করে তার আলো পাঠাতে সাহস করে সেখানে?

আমি তোমার জন্মভূমিকে ভালবাসি কিনা জিগ্যেস করেচ—নিশ্চয়ই ভালবাসবো। তোমার যখন জন্মভূমি তখন সে আমার শ্রদ্ধার পাত্রী নিশ্চয়ই। তবে চোখে না দেখলে তো ভালবাসা যায় না, একদিন সুতরাং দেখার আগ্রহ রইলো। ফটো নিশ্চয়ই পাবে। আমার মনে আছে—তবে এই সময়টা বড় ব্যস্ত আছি বলে পরিমলকে দিয়ে ফটো তুলবার অবসর পাচ্ছিনে। পূজার সময় ঠিক পাবে।

আচ্ছা আমার ভ্রমণ তালিকা বনগাঁয়ে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করা যাবে। তোমাদের মানে তুমি আর বেলু, আর অবিশ্যি মায়া যদি ওখানে সে সময় থাকে। তবে চাটগাঁ যেতেই হবে যদি গোয়ালিয়র যাওয়া না ঘটে—রেণু আবার একখানা চিঠি দিয়েচে। চাটগাঁয়ে যেতেই হবে নইলে সে নাকি রাগ করবে। এ মাসের প্রবাসীতে আমার 'সুলোচনার কাহিনী' গল্পটা বেরিয়েচে। ওখানে 'প্রবাসী' পাও তো পড়ে দেখো—নয় তো আমি নিয়ে যাবো এখন। সেদিনকার সেই প্লটটা নিয়ে 'বাক্সবদল' নাম দিয়ে গল্পটা লিখেচি—কার্তিক মাসের শারদীয়া সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে বেরুবে। মায়ার সেই বাক্স-বদলের কথা—মনে আছে তো?

আশা করি কুশলে আছো। তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ নিও—বেলু ও অন্যান্য বালক-বালিকাদের স্নেহাশীর্বাদ জানিও।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ—তোমার জন্য ভাল কাঁচের চুড়ি নিয়ে যাবো। হাতের মাপ দরকার হবে না? সুতো দিয়ে হাতের মাপ পাঠালে কেমন হয়? এসব কারবার কখনো করি নি, জানা নেই মোটেই। তাই পরামর্শ দিয়ে সাহায্য কোরো লক্ষ্মীটি।

তুমি অমন কেন লিখেচ 'অনেক অপরাধ করেচি, ক্ষমা করুন'। ওতে মনে ভারি কষ্ট পাই, কল্যাণী—অমন লিখো না।

২

প্যারাডাইস লজ
৪১ মির্জাপুর স্ট্রীট
কলিকাতা
১৬ই আশ্বিন, '৪১ সাল

কল্যাণীয়াসু,

এসে অবধি মন সত্যিই বড্ড উতলা হয়ে রয়েচে, কল্যাণী। এবার যেন

কিছু ভাল লাগচে না। ঘাটশিলা যাইনি, কাজ এখনও মেটাতে পারি নি, আগামী কাল (বুধবার) সকালে নাগপুর প্যাসেঞ্জারে নিশ্চয়ই যাবো। তুমি সঙ্গে থাকলে কি ভালই লাগতো! আমি চলে এলুম, সেই যে তুমি, মায়া, বেলু জানলায় দাঁড়িয়ে রইলে সেই কথাই মনে হচ্ছে। তুমি যে অত ভোরে উঠে এলে, আমায় অনুরোধ করলে থাকবার জন্যে, তোমার সেই ছবি কেবল মনে হচ্চে।

আজ মহালয়ার ছুটি ছিল, কিন্তু আমার এখানে সকাল থেকেই কেবলই লোকের ভিড়। একদল যায়, আর একদল আসে। বিরক্ত হয়ে বেলা সাড়ে নটার সময় বেরিয়ে পড়লুম। সজনীর ওখানে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড আড্ডা বসেছে সেখানে—তারাশঙ্কর, ব্রজেনদা, সাঁতারু শান্তি পাল, সম্বুদ্ধ, সজনী, নির্মলদা, শৈলজানন্দ, বিভূতি মুখুয্যে, ডাঃ সুশীল দে (ঢাকা ইউনিভার্সিটির খুব বড় একজন অধ্যাপক, লণ্ডনের ডি-লিট) প্রভৃতি উপস্থিত। রীতিমত সাহিত্যিক আড্ডা। ওরা সবাই কেউ পুরী যাচ্চে, কেউ নাগপুর যাচ্চে, ডাঃ দে বোম্বে যাচ্চেন, সজনী ও তারাশঙ্কর গোয়ালিয়র যাচ্চে (সেই গোয়ালিয়র)—আমায় সজনী বললে—আপনি গেলে বেশ আড্ডা দিতে দিতে যাওয়া যেতো—কিন্তু আপনি রাঁচীতে সভাপতিত্ব নিয়ে আমাদের আমোদ মাটি করে দিলেন নইলে আপনাকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতাম।

ভালোই হয়েচে গোয়ালিয়র যাই নি, তাহলে তো তোমাদের সঙ্গে পুজোর ছুটিতে আর দেখাই হোত না। ও আমার ভাল লাগে না হৈ হৈ করে বেড়ানো, চির জীবনটাই তো হৈ হৈ করেই কাটিয়ে দিলাম। ইচ্ছা করে নিভৃত নিরিবিলি কোথাও দুদিন বিশ্রাম করি, অলস শরতের দুপুরে দূরশ্রুত ঘুঘুর উদাস কণ্ঠের সঙ্গীত শুনে জীবনস্বপ্নে বিভোর থাকি, জ্যোৎস্নারাতে ছাদে শুয়ে বিরাট তারা ভরা আকাশের দিকে চেয়ে আপন মনে কত কথা ভাবি—

> প্রকৃতির কোলে শুয়ে সৌন্দর্যে ভাসায়ে আঁখি
> সাধ যায় দিবানিশি অনিমেষে চেয়ে থাকি।
> নিঝুম নীরবে সেথা কি যেন চোখের 'পরে
> উজল জ্যোছনা সম নিয়ত ঝরিয়া পড়ে।
> পরমাণু নিভে যায় ভাঙিয়া জড়ের কারা,
> কেতুমি ডাকিছ মোরে করিয়া পাগলপারা?

তবে এ সব সাধই। সাধ হলে কি হবে, তা হবার নয় তাও জানি। জীবনের জটিল কর্মভার থেকে আমার মুক্তি নেই কোনদিন।

চিঠি দিলাম এই লোভে, বৃহস্পতিবার পেয়ে যদি শুক্রবারে উত্তর দাও—তবে আমি রবিবারে পাবো। চিঠি দিও, ভারি আনন্দ পাবো তা হোলে, পূজোর ষষ্ঠীর দিন তোমার চিঠি পাই যদি। কেমন তো?

অনেক রাত হয়েচে। এখুনি চিঠি ডাকে দেবো—নইলে কাল সকালে তাড়াতাড়িতে সময় হবে না।

আমার স্নেহাশীর্বাদ নিও ও বেলু, খোকা ও অন্যান্য বালক-বালিকাদের জানিও।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[১ ও ২ এই পত্র দুইটি বিবাহের পূর্বে ভাবী-পত্নীকে লিখিত]

৩

প্রিয়তমাসু,

আজই বনগাঁ থেকে এসেচি সকালের ট্রেনে। কাল তোমাদের বাড়ি বদল করা হোল—কানুমামা সেজন্যে গিয়েছিল, জিনিসপত্র সব নিয়ে যাওয়া হোল, রাত নটার পরে আমরা জগহরি শা'র কন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণ খেতে গেলাম, যতীনদা, মন্মথদা ও আমি। শনিবারে গিয়ে দেখি গুটুকে এসেচে, সে কাল ছিল। সে গিয়েছিল খোকা, বাচু ওদের সঙ্গে। খেয়ে এসে আমরা বাড়ী বদল করলুম, অর্থাৎ শুতে গেলাম নতুন বাসায়।

যাবার আগে আমাদের ছোট ঘরটিতে এসে একা দাঁড়ালাম একবার। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরে, নির্জন বাড়িটা,—কারণ বেলু, টুনু, খোকা ইত্যাদি সকলে জগহরির বাড়ি থেকে তখনো ফেরেনি। আমার কেবল মনে হচ্ছিল, যে বালিকার সঙ্গে এই ছোট্ট ঘরটির অতি ঘনিষ্ঠ ও মধুর সম্পর্ক, যার কতদিনের কত কথাবার্তা, ঝগড়া, বকুনি, আদর, ভালবাসা, হাসি ও কান্না এই ঘরের হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে আছে—সে যেন এইমাত্র এখানে ছিল, কোথায় গিয়েচে, এখুনি এল বলে। কতক্ষণ তার নীরব প্রতীক্ষায় একা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম জ্যোৎস্নার আলোয়, আধ-অন্ধকারে খাবারের ঘরের মেজেতে তার পদশব্দ শুনবার প্রত্যাশা করছি যেন প্রতিমুহূর্তে—কিন্তু সে কই এল না তো? সত্যিই এত কষ্ট হল মনে! যেন কাকে ছেড়ে যাচ্চি

এই বাড়িতে—গত একটি বৎসরের কতদিন, কত রাত্রির উদ্বেগবিহীন আসরে যার ডাগর চোখের দৃষ্টি আমার নিঃসঙ্গতাকে দূর করেছে,—মনে আনন্দ পরিবেশন করেচে—এই বাড়িতে তার আঠারো বৎসরের যৌবন ও নব-বিবাহিতার বহু অনভিজ্ঞ সাধ-আহ্লাদকে ফেলে গেলাম চিরকালের জন্যে—এই বাড়িতেই তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনগুলি আনন্দপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, বিবাহের পরে বহু বিনিদ্র রজনীর মধুময়ী স্মৃতিতে এই গৃহাভ্যন্তর আবেশাতুর, আজ সে পরিবেশ ত্যাগ করে যেতে হচ্ছে। আমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস কেউ দেখেনি, কিন্তু আমার মনে যে বেদনার সুর বেজেছিল, কারো মনে কি সে সুরেব প্রতিধ্বনি নিজেকে মুখর করে নি ?

কল্যাণী, পরশু আমাদের বিবাহের দিনটি। আমার মনে আছে। কাল চিঠি ডাকে দিলে, আমাদের বিবাহের দিনের প্রভাতে চিঠি তোমার হাতে পড়বে। বহুদূরের যন্ত্রসঙ্গীতের মত ধ্বনিত হোক তার মধ্যে আমাদের গত এক বৎসরের হাসি, গল্প ও গান, প্রত্যাসন্ন মিলনযামিনীর মত আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠুক তার প্রতিটি ছত্র—যে আনন্দ সৃষ্টির আরম্ভ থেকে নর ও নারীর পরস্পরের পরিচয়ের পথে বিচিত্র সেতু রচনা করে রেখেচে, যা আলস্যকে বহন করে আনে না, মনে জাগায় শক্তি ও উৎসাহ।

আজ স্কুলে পদত্যাগপত্র দিয়েছি। তোমাকে বোধ হয় বলেছি, বনগ্রামে মেয়ে-স্কুলে হেডমাস্টারের পদ নেবার জন্যে হরিদা বলেছেন আমায়। এদিকে পদ্মপুকুর স্কুলের হেডমাস্টার সুশীল মজুমদার সজনীকে বলে রেখেচেন জানুয়ারী মাস থেকে আমি যেন তাঁদের স্কুলে চাকরি নিই। বোধ হয় ওঁরা কিছু বেশি মাইনে দেবেন—অবিশ্যি তার পরিমাণ আমায় বলেন নি—কিন্তু আজ আমি ডি. এম. লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম কিছু আগে—তারা বলে চাকরি ছেড়ে যখন দিলেন, তখন ও আর করবেন না। বই লিখে আপনার বেশ চলেই যাবে। আমাদের হেডমাস্টার খুব দুঃখিত হয়েচেন আজ আমি নোটিশ দিতে।

মিত্রের সঙ্গে কাল বনগাঁয়ে দেখা। অনেকদিন পরে দেশে গিয়ে তার খুব আমোদ হয়েছিল, কিন্তু দুপুরে একটু গুরু ভোজনের পরে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাল হজম হয়নি বলে বনগাঁয়ের জলের বড় নিন্দে করলে লিচুতলার আড্ডায়। ঘাটশিলায় জলের গুণে সেখানে অত নেমতন্ন ইত্যাদিতে যথেষ্ট খেয়েও শরীর খারাপ হতে দেখা যায়নি।

বনগাঁয়ের আর খবর ভাল। তবে বীরেশ্বরের বড় অসুখ—পেটের পীড়া,

হজম হয় না, শূলবেদনা—রক্তাল্পতা, চোখ হলদে—শরীর শীর্ণ। উনি ঘাটশিলা যেতে চান—আমি বলেচি দেবীপ্রসাদরা যে ঘরে ছিল, ওই ঘরদুটোর কথা। শরীবে একটু বল পেলে এবং শীত কিছু কমলে বোধ হয় যাবেন। আদিত্য দেবকে চেন? তুমি যদি না চেন, উমাকে বলো, আদিত্যের ছেলে সুখদার কাল বিয়ে হয়ে গেল কোঁড়ার বাগানে। জ্ঞানদা, সব্যসাচীর সম্পাদক আমার কাছে এসে তোমার আর একটা গল্প চেয়ে গিয়েচে—তোমার যে দুটো গল্প এখানে আছে—তার মধ্যে থেকে একটা দিয়ে দেব?

আমি যশোহরে যাই নি—গেলে বড্ড ঠাণ্ডা লাগিয়ে সেই রাত্রের ডাউন মেলে ফিরতে হত—সে বড কষ্ট। বিষ্ণুপুরের ওরা আবার চিঠি লিখেচে, দেখি কি হয়। আমি ১০ই থেকে ১২শের মধ্যে ঘাটশিলায় যাচ্চি। তার আগে মেসের দ্রব্যাদি ও বই বনগাঁয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে—কিছু বই তোরঙ্গ ভর্তি করে ঘাটশিলায় নিয়ে যাব। এই মাসের পর আর মেসে থাকব না।

আজ কলকাতায় বড় একটা ঘটনা হয়ে গিয়েচে। দুপুরে ক'খানা এরোপ্লেন 'War Savings Week' উপলক্ষে উড়নেব ও ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শনের মহড়া দিচ্ছিল, তার মধ্যে একখানা হঠাৎ dive করতে গিয়ে বড়বাজারে আমড়াতলা গলির মধ্যে পড়ে চূর্ণ হয়ে গেছে। শুনছি নাকি দুজন পাইলট মারা গিয়েচে। দেখতে গিয়ে দেখি পুলিশ ও সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে, লোকে লোকারণ্য—পুলিশ কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না—ব্যাপার বুঝে চলে এলুম। আর একটা খবর, হক্ মন্ত্রিমণ্ডলী আজ পদত্যাগ করেচে। এই দুই ব্যাপারে শহর তোলপাড়। ট্রামে করে দলে দলে ছাত্রেরা চীৎকার করে slogan উচ্চারণ করতে করতে যাচ্চে, খুব চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েচে এই উপলক্ষে।

আজ আসি। খেতে যাব চাকর ডাকতে এসেচে দুবার। আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ কোর। নুটু, বৌমা, উমা, শান্তি ও রাজেনকে স্নেহাশীর্বাদ জানিও।

ইতি

পুঃ। রেণু ও তার দাদা ঘাটশিলায় যেতে চেয়েছিল বড়দিনের সময়। যদি ওরা যায় তবে কি ঘরদোরের কোন অসুবিধে হবে? অবিশ্যি ওরা থাকবে মোট ৪।৫ দিন। নুটুকে বোলো।

ঠিক হয়েছে আমরা সবাই একত্র হলে এখানে…অর্থাৎ তুমি বনগাঁয়ে এলে বারাকপুরে ঠিক সেই রকম পিক্‌নিক্ করব। সেই বনসিমতলার ঘাটে, সেই

জায়গায়। জগদীশবাবু নাকি আবার আসবেন। মায়া কি কানুমামা, বেলু, তুনু, বাতু…জগদীশবাবু, আমি ও তুমি…ভারী মজার পিক্‌নিক্। বছর বছর বনসিমতলায় আমরা একবার রেঁধে খাব, বারাকপুরে আসবার সময়েও… কেমন তো? ওটা করতেই হবে আমাদের। আর কেউ না আসে, বারাকপুরে এসেই তুমি আর আমি, আর অবিশ্যি আসবে গুটকে ও ইন্দু এবং বুধো ও মানী…আমরা একদিন ওখানে পিক্‌নিক্ লাগাব।

সোমবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ। ১লা ডিসেম্বর '৪১।

৪

মঙ্গলবার
১০।৯।৪০

কল্যাণীয়াসু,

আমিও ভেবেছিলুম আজ তোমার পত্র আসবে। বেশ চমৎকার পত্র, তোমার প্রকৃতি বর্ণনা আমার এত ভাল লাগে! এবার যে 'পড়চে' ক্রিয়াপদের ব্যবহার এত কম? কেন? সংশোধন করে দিয়েছিলাম বলে রাগ করোনি তো?

ভয়ঙ্কর লেখার ভিড় পড়ে গিয়েচে। এই সপ্তাহের মধ্যে লেখা না দিলে আর কোন কাগজ নেবে না। এবার পূজোর কাগজগুলো একটু তাড়াতাড়িই বেরুবে। তোমার নীলোৎপল গল্পটা আমার বেশ ভাল লেগেচে, ওটা 'গল্পিকা' কাগজে দেবো। সম্পাদক আমার এখানে আমার লেখার তাগাদায় আসবে, যদিও আমি বলেচি আমি আর দিতে পারব না—তোমার লেখাটা দেবো।

তোমার বুনো শটী ফুলের গল্প বেশ লাগলো। সামান্য ঘটনা গুছিয়ে লিখবার গুণেই পড়তে ভাল লাগে এমন। বেশ ভাবুক মন কিন্তু তোমার, সময়ে সময়ে ভাবি, এত অল্প সময়ে এমন ভাবুক মন কোথায় পেলে?

আমার যখন তোমার বয়েস (সে যুগের কথা অবিশ্যি), তখন বনগাঁয়ের বোর্ডিংয়ে থেকে পড়ি, বারাকপুর ছেড়ে এসে মায়ের জন্যে বাবার জন্যে বিশেষ করে বারাকপুরের নদীতীর, গাছপালার জন্যে আমার মন খারাপ হোত এবং পুরানো দিনের কথা মনে পড়তো। যখন আমি ভাগলপুরে কাজ করি তখনও বারাকপুরের জন্যে মন কেমন করতো, তা থেকেই বোধ হয় পথের পাঁচালী'র উৎপত্তি।

চিরকাল বারাকপুর ভালবাসি। কেউ নেই সেখানে আপনার বলতে,

তবুও যে যাই সেখানে, সে শুধু বারাকপুরের প্রকৃতির টানে, কি জানি কি দিয়ে আমার মন বেঁধেচে ওখানকার পল্লী প্রকৃতি! যদি সম্ভব হয় একদিন পূজোর ছুটিতে তোমাদের ওখানে যাবো নিয়ে। আমার মনে হয় তোমারও ভাল লাগবে।

হ্যাঁ, একটা ব্যাপার। গোয়ালিয়রে পূজায় পূর্ণিমা থেকে ভারতবর্ষের কবি ও সাহিত্যিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে—রাজদরবার থেকে নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়েচে বাংলাদেশের কয়েকজন সাহিত্যিকের উপস্থিতি প্রার্থনা করে। তার মধ্যে আছে সজনী দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, মণীন্দ্রলাল বসু ও আমি। ১২ অক্টোবর তারিখে আপ দিল্লী এক্সপ্রেসে ওরা সবাই এখান থেকে যাবে। ১৫ দিন সেখানে থাকতে হবে। সাহিত্যিকদের থাকবার জন্য রাজদরবার থেকে খুব ভাল বন্দোবস্ত করবে এবং মোটবে ও-অঞ্চলের অনেক দ্রষ্টব্য স্থান দেখাবে। সজনীবাবুর বিশেষ অনুরোধ আমি যেন যাই। কাল সকালে সজনীবাবুর বাড়ী গিয়েছিলাম, সেখানে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিল। সবাই বললে, একসঙ্গে বেশ আড্ডা দিতে দিতে যাওয়া যাবে। তাছাড়া যাতায়াতের খরচ স্টেট থেকে দেবে স্থির হয়েচে। সজনীর নামে ওরা টাকা পাঠিয়ে দেবে।

আচ্ছা, এখন কি করি আমি? যদি ১২ই অক্টোবর গোয়ালিয়র যাই দিল্লী এক্সপ্রেসে—তাহলে যেখানেই থাকি ১১ তারিখে অর্থাৎ পূজোর পরে—একাদশীর দিন আমায় কলকাতায় আসতে হয়। ১৫দিন গোয়ালিয়রে কাটালে ২৭শে অক্টোবর পর্যন্ত সেখানে থাকতে হয়, কলকাতায় এসে পৌছুতে আরও দুদিন··· অক্টোবর মাস শেষ হয়ে গেল। ছুটি বাকি রইল আর মোটে দশ দিন। এর মধ্যে কবে বা যাই চাটগাঁ, কবে বা থাকি বারাকপুর, কবে বা যাই বনগাঁ।

এবাদে ঘাটশিলাতেও যেতে হয় তাহোলে ২রা বা ৩রা অক্টোবর...থাকা হয় মোটে ৭ দিন। এই সব বিবেচনা করে দেখে এখনও বুঝতে পারিনে কি করা উচিত। ভীষণ মুশকিলে পড়ে গিয়েচি কল্যাণী।

তারপর ধরো, যাওয়া নিজের ইচ্ছাতে, কিন্তু আসা পরের ইচ্ছায়। যদি সেখানে থাকার ভাল ব্যবস্থা বন্দোবস্ত দেখে সঙ্গীরা বলে বসেন একেবারে পূজোর ছুটিটা কাটিয়েই যাওয়া যাক, তবে তো আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে আসতে পারবো না, সুতরাং ছুটির গোটা দিনগুলো গোয়ালিয়রেই কাটিয়ে আসতে বাধ্য।

হয়ে গেল বারাকপুর, হয়ে গেল বনগাঁ, হয়ে গেল চাটগাঁ।

তোমার কি মত কল্যাণী? আমি কিছুই বুঝতে পারচি নে এখনও, মন এদিকেও টানচে ওদিকেও টানচে।

যদি কোন কারণে গোয়ালিয়র যাওয়া না হয়, তবে আমার আগের ভ্রমণ তালিকা অনুসারেই কাজ করা যাবে। একটা বড় বাধা এই দাঁড়াবে যা বুঝচি, একখানা উপন্যাসের Contract হবার কথা হচ্চে, মিত্র ও ঘোষ কোম্পানী প্রকাশকের সঙ্গে। তা যদি হয়, তবে যাওয়া হবে না কারণ হৈ হৈ করে ছুটিটা কাটিয়ে দিলে নিরিবিলি লিখবার সময় পাবো না।

আগের লাইনটা লিখবার পরে আমার ঘরটার নীচে রেডিওতে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'মরণ' কবিতার আবৃত্তি করলে...সেই যেটা আমি একদিন বনগাঁয়ের পুরনো বাসায় করেছিলুম, 'অতি চুপি চুপি কেন কথা কও'... সেইটি মনে আছে? এতক্ষণ চিঠি লেখা বন্ধ করে আবৃত্তি শুনছিলাম, বেশ করলে। দু'এক জায়গায় বেশ ভাল লাগলো ...তবে বড্ড চীৎকার করতে হয় ওটাতে, ভাল দম রাখতে না পারলে ওটা ভাল করে আবৃত্তি করা যায় না। পরিশ্রমের কাজ ওটা আবৃত্তি করা। নৃপেনের যেন দু'জায়গায় দম রইল না... তাই আবার খুব নীচু সুরে আরম্ভ করলে। আমি ছুটির সময় ওটা আবৃত্তি করে শোনাব এখন।

'চাঁদের পাহাড়' ভাল লেগেচে মায়ের, খুব আনন্দের কথা। বেশ, ও-ধরনের adventure আরও লিখবো...আমারও ইচ্ছে রয়েচে লিখবার। তুমি তো আগেই পড়েছিলে, না? কি রকম লেগেচে লিখো। তোমাকে একটা কবিতা আবৃত্তি করতে হবে কিন্তু এবারে বনগাঁয়ে ছুটির সময়। কেমন?

হায়, হায়, এবার পূজোর ছুটিটা মাঠে মারা গেল!

তবে ঘাটশিলা আমরা কিন্তু যাবোই। যে ক'দিনের জন্যেই হোক। মুশকিল হোল বেচারী রেণু-মায়ের। হয়তো সে মিথ্যেই অপেক্ষা করে থাকবে, সেখানে যাওয়া ঘটবে না। নিজের অনিচ্ছাতেও যে কত লোকের মনে কষ্ট দিই। এতে পাপ হয় কল্যাণী? তোমার কি মত? আচ্ছা তোমার চিঠিতে 'পূজোর ছুটিতে যে আপনি—'এই পর্যন্ত লিখে বলেচ 'থাক সে বলবো না'— ও কথার মানে কি? সত্যি, কিছু বুঝতে পারি নি। পূজোর ছুটিতে আমি কি করব বলেছিলুম? বলবে না কল্যাণী? আমি বুঝি রাগ করতে জানিনে, না? আমার ভারি কষ্ট হয়েচে ও কথা কেন লিখেচ 'আমার মত সামান্যা

মেয়ে কি জন্ম আপনাকে তার কথা জানাবে ইত্যাদি। কি কথা, বল তো? কিছুই বুঝলাম না। কি করবো বলেছিলুম বলো তো? লক্ষ্মীটি, না যদি বলো রাগ করবোই।

বুধবার চিঠির উত্তর চাইলে কি হবে, ওবেলা তোমার চিঠি পেলুম তখন স্কুলে বেরিয়েচি, স্কুল থেকে এসে উত্তর লিখলুম কাল বেরুবে এখান থেকে, পরশু বৃহস্পতিবার সকালে পাবে। অতএব রাগ করো না। বেলু কেমন আছে? বেশ মেয়ে বেলু। তাকে আমার স্নেহাশীর্বাদ দিও এবং বালক-বালিকাদেরও জানিও। তুমি আমার স্নেহাশীবাদ গ্রহণ কোরো।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫

৪১নং মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা।

কল্যাণীয়াসু,

কাল যথাসময়ে এসে পৌঁছেচি, অতএব কিছু ভেবো না। এখন সেদিনকার সেই ভ্রমণ আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে—তুমি ওখানে আছ, সামনে এখনও পাহাড় দেখতে পাচ্ছ—কিন্তু আমার সামনে শুধু ইটকাঠের স্তূপ আর ধোঁয়া, প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য চোখের সামনে থেকে মুছে গিয়েচে। মনের অবকাশ মানুষের জীবনে যে কতবড় দরকারী জিনিস, তা এই কর্মব্যস্ত, যন্ত্রযুগের অত্যন্ত হিসেবী ও সময়নিষ্ঠ মানুষেরা কি বুঝবে? এতে মানুষকে টাকা রোজগার করায়, ভাল খাওয়ায়, ভাল পরায় ভাল গাড়ী-ঘোড়া চড়ায়—কিন্তু জীবনকে মরুভূমি করে রেখে দেয়। প্রকৃতির শ্যামল বন পত্রসম্ভার নীল আকাশ, পাখীর কূজন, নদীর কলমর্মর, অস্ত দিগন্তের সান্ধ্য মায়া এসব থেকে বহুদূরে এক জলহীন, বৃক্ষলতাহীন মরু।

তাই এখানে এসে আজ বেশী করে মনে পড়চে সেদিন দু'জনে পাহাড়ে, ঝর্ণার ধারে ও বনাঞ্চলে যে সুন্দর প্রভাতটি একত্রে বেড়িয়ে ছিলুম—সেই কথা—এখানে কেউ কল্পনা করতে পারে তেমনতর গোলগোলি ফুলের শোভা? Sir Richard Hooker একজন ..াত উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ১৭৭৬ সালে ভারতে এসে বহু বনপ্রদেশ থেকে এদেশের গাছপালার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে Himalayan Journal—৫।৬ ভলুমে সম্পূর্ণ বিরাট বই। এই বইয়ের মধ্যে গোলগোলি ফুলের শোভার খুব প্রশংসা করে গিয়েছেন Hooker, তাঁর নিজের হাতে আঁকা এই ফুলের রঙিন ছবিও

আছে ওই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে। আমি তাঁর হাতে আঁকা এই ছবি দেখেই প্রথম বুঝতে পারি উনি কোন্ ফুলের কথা বলছেন।

…আমি শিবরাত্রির আগের দিন যাবো—এবং নিয়ে আসবো। ঝুটুকে বোলো যদি গাড়ী যোগাড় করতে পারে তবে একবার যেন তোমাদের মুসাবনী ঘুরিয়ে নিয়ে আসে।

কেন, তোমার চিঠি পড়ে দেখলুম তুমি ঘাটশিলাতেই তো থাকতে চেয়েছিলে—তবে? ঘাটশীলা সত্যই ভাল জায়গা। বৌমাও খুব ভাল। থাক না দুদিন।

তোমরা আর একদিন ফুলডুংরি বেড়াতে যেও বিকেলের দিকে। অমন Space-এর রূপ আর কোথাও দেখবে না। বাংলাদেশে তো নয়ই। বনগাঁয়ে কি আছে, বনগাঁয়ে?

বেশি লিখবার সময় পেলুম না। সাড়ে ন'টা বেজেছে। এতক্ষণ অনেক লোকের ভিড় ছিল—একটু সময় করে চিঠিখানা লিখলুম। অনেক দিন পরে এসেচি বহুলোক দেখা করতে আসচে।

'যুগান্তরে' সেদিনকার মিটিংএর খবর বেরিয়েচে দেখলুম। আমার বক্তৃতাও বার হয়েচে। বনগাঁয়ে দেখেচেন সবাই নিশ্চয়ই।

সামনের শনিবারে ভাবচি বারাকপুর যাবো, রবিবার দুপুরে খেয়ে দেয়ে হেঁটে বনগাঁ যাবো। রাত্রিটা থেকে সকালে কলকাতা আসবো। তবে এখনো কিছু পাকাপাকি ঠিক নেই।

প্রীতি ও ভালবাসা নিও। পত্রের উত্তর কালই চাই কিন্তু…বৌমা, উমা, শান্ত, ঝুটুকে স্নেহাশীর্বাদ জানিও।

প্রীতিবদ্ধ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চঃ শিবরাত্রি সোমবারে, সুতরাং ঝুটুকে বলো শনিবার ২২শে ফেব্রুয়ারী বম্বে মেলের সময় স্টেশনে থাকতে। যদি কোন কারণে বম্বে মেলে না যাওয়া হয়, তবে রাঁচি এক্সপ্রেসে নিশ্চয়ই যাবো।

Cambala Hills
বম্বে, আলটামণ্ট রোড
রবিবার, ২৮।১২ ৪৭

কল্যাণীয়াসু,

খোকার নামে একখানি চিঠি ইতিপূর্বে দিয়েছি। আজ ৪ দিন হয়ে গেল বোম্বাই সহরে। খুব একজন বড়লোকের বাড়ি আছি। খাওয়া-দাওয়ার রাজসূয় ব্যবস্থা। যেখানে আছি, সেটি বম্বে সহরের একপ্রান্তে একটি দ্বীপ, তার ওপর একটি পাহাড়। পাহাড়ের ওপর বাড়িটা। ঘরে তেতলার জানালা থেকে শুয়ে শুয়ে সমুদ্র দেখা যায়। কি সুন্দর সহরটি! যখন সমুদ্রতীরে সারি সারি আলো জলে বড় বড় পাহাড়ের মত বাড়িগুলিতে তখন অনেক রাত্রে উঠে কি মায়াময় যে দেখায়! তোমার কথা মনে হয় তখন। এখান থেকে সভাস্থল ৭ মাইল, রোজ এঁদের মোটরে যাতায়াত করি। দু'বেলাই। অনবরত সভা হচ্চে। এখানকার দ্রষ্টব্যস্থান বহু, তবুও মালাবার উদ্যান, মহালক্ষ্মী মন্দির, এপোলো বন্দর, Gateway of India ইত্যাদি দেখা হয়েচে। আজ গজেনরা নাসিক গেল মোটরে, ওরা অনেক দূরে থাকে, ৭ মাইল দূরে। সকালে ফোন করেছিল কিন্তু যেতে পারিনি। প্রবোধ সান্যাল ও আমি এইমাত্র সভাস্থলে বসে পরামর্শ করলুম, কাল এলিফ্যাণ্টা যাবো। ফিরবার পথে ঘাটশিলা নামবো। তুমি ভেবো না আমার জন্যে।

কাল জ্যোৎস্না রাত্রে মালাবার হিল-এর উদ্যান থেকে দূরের আরব-সমুদ্রের দিকে চেয়েছিলুম। সঙ্গে ছিল প্রবোধ, গজেন ও সুমথ। তোমার কথা এত বেশী করে মনে পড়ছিল। ভাবছিলুম বারাকপুরের বাড়ির পিছনে ঘরে জ্যোৎস্নালোকিত বাঁশবনের কথা—তুমি আর আমি গভীর রাত্রে কতবার জানালা খুলে চেয়ে চেয়ে দেখতাম সে কথা মনে পড়লো। বোম্বাই সহরে তোমাকে একবার নিয়ে আসবো বাবলু বড় হোলে। যাঁদের বাড়ি আছি তাঁরা তোমাকে নিয়ে আসতে বলেচেন এখানে। নাসিকে ওঁদের বাড়ি আছে সেখানেও থাকতে বলেচেন। একদম শীত নেই এখানে। কখনো নাকি শীত পড়ে না এখানে। এখানকার আবহাওয়া নাকি এই রকম। দুপুরে রোদের বড় তেজ। সহ্য করা যায় না এত গরম। রাত্রে গায়ে একখানা পাতলা চাদরও লাগে না—শেষরাত্রেও না। বড় সুন্দর সহর। সমুদ্র ও

পাহাড়ের এমন সমাবেশ এক জায়গায় কখনও দেখি নি। যেদিকে চাই সে দিকেই নীল সমুদ্র। ইলেকট্রিকে ট্রেন চলে, তার কত যে স্টেশন—গ্রান্ট রোড, ওয়াডেলা, বোরিভিলি, চার্চগেট, দাদর, মাতুঙ্গা—আরও কত স্টেশন শুধু সহরের মধ্যেই।

তুমি আশীর্বাদ নিও। বাবলুকে স্নেহাশীর্বাদ দিও। বাবলুর নামে যে চিঠি দিয়েচি তা বোধ হয় এতদিনে পৌঁছেচে। মাকে সভক্তি প্রণাম জানিও। বালক-বালিকাদের আশীর্বাদ দিও। ভাল আছি। ঘাটশিলায় নামবো। কাল বোম্বাইয়ে সাধারণ ধর্মঘট। রেল, বাস, ট্রাম, কুলি, দোকান সব বন্ধ। কাল এলিফ্যান্টা যাওয়া হবে কিনা কি জানি। স্টিমারে চড়ে আরবসমুদ্র দিয়ে ৩,৪ ঘণ্টার পথ ঐ দ্বীপটি। ওখানকার পাহাড়ের গায়ে হিন্দু দেব-দেবীর অপূর্ব মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর তৈরি। ঐতিহাসিক ডাঃ সুরেন সেন আমার সঙ্গেই আছেন, তিনিই বললেন পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর আগেকার নয় এ শিল্প।

বোম্বাইয়ে মারহাট্টা ও গুজরাটি বুলি সবাই বলে। হিন্দিও বলা হয় তবে খুব কম। হিন্দি বললে অনেকে বুঝতে পারে না। বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা চমৎকার মারহাট্টী বলচে।

তুমি ঘাটশিলার ঠিকানায় এর উত্তর দিও। কেমন তো? এখন বেলা দুটো। গাড়ি তৈরি, এখুনি আবার ৭ মাইল দূরবর্তী সভায় যেতে হবে। পথে কি সুন্দর আরবসমুদ্র পড়ে রাস্তার ধারে। ওলি বলে একটা জায়গায়। তার ডান পাশে মহালক্ষ্মী Race course—ঘোড়দৌড়ের জায়গা।

বারাকপুরে ফুচুর মাকে একখানা চিঠি দিও। ইতি—শ্রীবিভূতি

৭

চোটনাগরা ফরেস্ট বাংলো
(সাবাণ্ডা)
২৬।১১।৪৯

কল্যাণীয়াসু,

আজ আমরা এখানে এসেছি, ঘন জঙ্গলের মধ্যে ক'দিন মোটরে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে থাকি। চারিদিকে শৈলশ্রেণী মণ্ডিত অপূর্ব দৃশ্য। বন, খুব বন, যেমন বামিয়াবুরুতে দেখেছিলে। কাল এক জায়গায় বনে বেড়াতে গিয়ে ভালুকের ও বাইসনের পায়ের চিহ্ন অজস্র দেখেছি। এখানে বাঘের বড়

উপদ্রব সুরু হয়েছে আজ ২।৩ মাস। গত ১৫ দিনের মধ্যে তিন জন লোককে বাঘে নিয়েচে এই বাংলোর আশে পাশের জঙ্গল থেকে। ধনকুমার হো বলে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল কাল, সে বললে ২৩ ফুট লম্বা একটা পাইথন সাপ সে মেরেছিল আজ কয়েক মাস হোল এই জঙ্গলে। কি সুন্দর সে বনের শোভা, কত ফুল ফুটে আছে সর্বত্র। কাল রাত্রে বাংলো থেকে ময়ূরের ডাক শুনেছি।

বাবলু কেমন আছে? আমার নাম করে কি না? আমি ৩০ তারিখে মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময়ে যে চক্রধরপুর লোকাল ট্রেন যায় ওখানে ৭টায়, ওতে ঘাটশিলায় পৌছুবো। যদি ও দিন না যাই, তবে পরের দিন নিশ্চয়। কেতো যেন স্টেশনে থাকে। আজ এখুনি আমরা এখান থেকে থলকোবাদ যাচ্চি। পথে বারুডেরা নামক এক গভীর বনমধ্যস্থ বাংলোয় দুপুরের আহার সেরে নেবো। এখন বেলা নটা। চা খেয়ে বেরুচ্চি। হরদয়াল সিংয়ের গাড়ি—দু'খানা মোটর আমাদের সঙ্গে আছে। নুটু ও বৌমাকে আশীর্বাদ দিও। নুটু এ সময় এখানে আসতে পারলে খুব ভাল হোত।

তুমি আশীর্বাদ নিও ও কেতোকে দিও।

ইতি—বিভূতি

৮

ইং—১৯।৮ ৫০, সোমবার

কল্যাণীয়াসু,

বেশ মানুষ, নীরব কেন? তোমাদের আসবার কথা ছিল ও-সপ্তাহে, রোজ চাবিটা দরওয়ানের কাছে রেখে যেতাম আর রোজ ভাবতাম আজ গিয়ে দেখবো ঠিক কল্যাণী এসেচে। তোমার জন্যে Rowntree চকোলেট কিনে রাখলুম, ঘরে ফিরে রোজ রোজ নিরাশ হয়ে একদিন রাগ করে চকোলেট নিজেই খেয়ে ফেললাম। তারপর অবশ্য তোমার বাবার পত্র পেলুম, পেয়ে জানলাম আসা তোমাদের হোল না। নিরাশ তো হয়েই ছিলাম, তোমার ওপর অকারণ রাগও হয়েছিল। সত্যি কথা বলাই ভালো।

এবারও বনগাঁয়ে দুদিন আনন্দে কেটেছিল, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। বেলুর জন্মতিথির শুভ অনুষ্ঠান ও আনন্দের মধ্য দিয়ে আমি আমার নিজের বাল্যদিনের অনুভূতি ফিরে পেয়েছিলাম। বিশেষত এই বর্ষাকালে। কেন

যে বর্ষা ও শরত এই দুটি ঋতু আমার এত প্রিয় তা জানিনে—কিন্তু আমার শৈশবের সকল স্বপ্নলোক যেন এক সময় জন্ম নিয়েছিল এই ঋতুর মধ্যে, তাই শরতের নীল আকাশ, পরিপূর্ণ ঝলমলে রৌদ্র, ঘন সবুজ বনঝোপ আমার মনে শৈশবের সেই হারানো জগতকে আবার ফিরিয়ে আনে, সে জগতের রহস্য আমার কাছে কোনোদিন শেষ হবে না, জন্মান্তরের পথে কতবার যার সঙ্গে পরিচয় ঘটবে।

কল্যাণী, তোমার মধ্যে একটি ভাবুক মনের পরিচয় পেয়েই তোমায় ও-কথা লিখলুম। এ জগতে বেশির ভাগ লোকে বস্তুকে, অর্থকে, বিষয়কে, পদগৌরবকে বেশি করে বোঝে, ভাবানুভূতিকে বোঝে না। কিন্তু সেদিন যখন বালুরঘাটের জীবনের প্রতি তোমার পিছুটানের কথা ও নানা জায়গার প্রকৃতি বর্ণনা শুনলাম, তখনি আমার মনে হয়েচে তুমি এসব বোঝো ও ভালোবাসো। ছেলেমানুষ হলেও এই কল্যাণময়ী প্রকৃতির রূপ অন্ততঃ আবছায়া ভাবেও তোমার চোখে ধরা পড়েচে। সকলের পড়ে না।

এবার শরতে একদিন বনগাঁয়ে আমরা সবাই বৈকালের আকাশের তলা দিয়ে নদী বেড়াতে যাবো, নৌকোয় করে। নিশ্চয়ই তোমার খুব ভাল লাগবে, আমি বলতে পারি। শরতের নদীচরলগ্ন কাশবনের শোভা আশা করি পূর্বে অনেক দেখেচ, এবারও দেখাবো। তোমার গল্প লিখবার খোরাক জুটবে।

তোমার চিঠি না দেওয়া ভুল হয়েচে। রোজই দেখি চিঠি এসেছে কি না। ভাবি অন্যায় কল্যাণী। পত্র পেয়েই চিঠি দেবে। তোমায় এ কদিন পত্র লিখবো ভেবেছিলাম ; রাগ করে লিখিনি—এখন সত্যি আর থাকতে পারলুম না। কেন না মন উদ্বিগ্ন হয়েচে। ভাবচি, অসুখ বিসুখ হয়নি তো কল্যাণীর ?

আমি একটা কবিতা লিখেচি। তোমায় পাঠালুম। ভাল করে নকল করে আমায় দিও না ? কেমন হয়েছে ? আমি সাধারণতঃ তো কবিতা লিখি না।

তুমি স্নেহাশীর্বাদ নিও। খোকাখুকীদের জানিও। ষোড়শীবাবুকে সশ্রদ্ধ নমস্কার দিও।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ—তোমার জন্য আমার মন সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়েচে, চিঠি পত্র পেয়েই দিও। ভুল না হয়, না হয়, না হয়।

পুঃ—কপি করে তোমার বাবাকে কবিতাটি দেখিয়ে তাঁর মত নিও। তাঁর কেমন লাগে জানিও ঠিক আমাকে। তোমরা ভালো বললে একটা কাগজে দেবো।

নবযুগের কবি

দুঃখ হতে ক্ষতি হতে যে অমৃত করেছি সঞ্চয়
নিত্য পলে পলে
মৃত্তিকার ধরণীতে কণ্ঠ ভরি গাহি তারি জয়
নানা কুতূহলে
রজনীর অন্ধকারে অগণিত তারকার দ্যুতি
গগন অঙ্গনে
কি বিস্ময়ে হেরিয়াছি পুলকিত একা সারারাতি
মুগ্ধ শিহরণে—
মনে হবে জন্মে জন্মে জন্ম হতে নব জন্মান্তরে।
মৃত্যুলোক পারে
সেই কথা রেখে যাব অরণ্যের পল্লব মর্মরে
ধরার দুয়ারে
দুঃখ ভরা পৃথিবীর কবি আমি নামগোত্রহীন
অখ্যাত অনামী
মানুষের চিত্ত মাঝে তবু ক'বে মোর মর্মবীণ
শাশ্বত সে বাণী
অনন্ত বেদনা মাঝে চিরন্তন সৃষ্টির সম্ভার
আনন্দ স্বরূপে
আমি যে দেখেছি তার প্রশান্ত স্বভাব
অপরূপ রূপে
তাই মোর কাব্যকথা নবছন্দে হয়েছে মুখর
অশ্রুজল মাঝে
কুসুম সঙ্গীতে তাই ধরিত্রীর ব্যাকুল অন্তর
ক্ষণে ক্ষণে বাজে।

৯

৪১, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা
৬ই ভাদ্র, '৪৭ সাল, বৃহস্পতিবার রাত্রি

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠিখানা আজই আশা করেছিলুম, কিন্তু যখন চিঠি পেলাম তখন স্কুলে বার হচ্চি, কাজেই আজ উত্তর দেওয়া সম্ভব হোল না, যদিও আজই উত্তর দিলে তবে শুক্রবারে পাও। আজ আবার বারবেলা ক্লাবের বৈঠক ছিল, সুতরাং সেখান থেকে রাত্রে ফিরে তবে চিঠি লিখচি, শনিবারে পাবে। তাতে একদিন দেরি হোল বটে, রাগ করতে পাবে না বলে দিচ্চি।

আমার চিঠি দিতে না হয় দেরি হয়েচে, তুমি তো চিঠি দিলে পারতে? কেন দিলে না? যদি মরে যেতাম? কি করে জানলে আমার খুব অসুখ হয়নি? শুধু আমার দোষ দিলেই বুঝি চলবে? আমি তোমাকে চিনি না এমন সব ব্যবহার করি? বোলো না ও কথা, কল্যাণী। অমন বল্লে আমার মনে কষ্ট দেওয়া হয়।

আমার কবিতা তোমাদের ভাল লেগেচে, ষোড়শীবাবুর ভাল লেগেচে জেনে খুব আনন্দ পেলাম। আজ ওটা বারবেলায় পড়া হয়েচে। আমার গল্প পড়ার কথা ছিল, কিন্তু গল্পটার আধখানা এখনও বাকি বলে পড়লাম না। ভাবচি, সামনের শনিবারে ঘাটশিলা যাবো, সেখানে 'সুবর্ণ সঙ্ঘে'র অধিবেশনে গল্পটা পড়বো।

নিশ্চয়ই যাবো তোমার জন্মদিনে। তোমাদের সাদর নিমন্ত্রণ কি উপেক্ষা করতে পারি, কল্যাণী? এই অল্প দিনের মধ্যে তোমাদের সঙ্গে যে আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েচে—এখন মনে হয় যেন কতদিন থেকে তোমাকে জানতাম; বেলুকে জানতাম, মায়াকে জানতাম, ষোড়শীবাবুকে জানতাম। কি জানি কেন এমন হয়?

আমার বইখানা (মরণের ডঙ্কা বাজে) তোমাদের ভাল লেগেচে, এতে সত্যিই আনন্দ পেলাম। তোমাদের সমজদারিত্ব আছে, তোমাদের ভাল লাগলে অনেকেরই ভাল লাগবে এ আমার ধারণা।

তোমার উপর রাগ করেছিই তো। নিশ্চয় করেছি। উচিত ছিল না তোমার একখানা চিঠি দেওয়া? কত আশা করে থাকতাম প্রতিদিন তা যদি জানতে? আমি মরে যাই নি কি করে জানলে? হায়রে! আমি মরে গেলে কারই বা কি!

বেলু রাগ করলো তাকে খোকাখুকির দলে ফেলেচি বলে! হাসি পেল কথাটা পড়ে। সে খোকাখুকির দলে না তো কি? আচ্ছা যাক্ এখন থেকে ওকে সে দলে ফেলবো না। বেলু কেমন আছে? বেলু? হয়েচে তো? বেলুর ওপর আমি রাগ করেচি কে বললে? ও ছেলেমানুষ, সব বলতে পারে, তুমি বিশ্বাস কোরো না সে কথা।

পরশু ঘাটশিলায় যাবো, সোমবার ছুটি আছে, মঙ্গলবার সকালে আসতেই হবে, থাকবার উপায় কি স্কুল কামাই করে? তুমি বেশ লোক, অমনি বলে দিলে তোমার কথা শুনিনে? তোমার কোন্ কথা কবে না শুনিচি। বেলু সাক্ষী আছে। তোমার জন্মদিনে একটা গল্প পড়বার ইচ্ছে রইল। সেদিন কি সম্ভব হবে সাতভেয়েতলা যাবার—হবে না বোধ হয়। আগের দিন যদি হয় দেখা যাবে।

আমার কেবল ভয় হয় বনগাঁ থেকে তোমরা চলে যাও, তবে কি দুঃখই পাবো! এমন বন্ধুত্ব চলে যাবে ভাবলে মন বড খারাপ হয়ে যায়।

অল্প লইয়া থাকি তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়—

মানুষের জীবনে যে ক'দিন আনন্দ করা যায়, আমি এই বুঝি। এই সম্বন্ধে গ্রীক কবি হিপোলিটাসের একটি বিখ্যাত কবিতার অনুবাদ আছে—'The apple tree, the singing and the gold.' কবিতার একটি অতি বিখ্যাত ছত্র এটি।

যদি সম্ভব হয় এবার তোমাকে ছুটি ভূতের গল্প শোনাবো। মনে করে দিও। তবে ভয় পেলে চলবে না কিন্তু। ভয়টয় আমি দেখতে পারি নে। অন্য দেশে মেয়েরা যুদ্ধে যাচ্চে আর আমাদের মেয়েরা ভূতের ভয়ে রাত্রে এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে পারবে না, এ কি ভাল কথা?

রাত হয়েছে অনেক। আজ এই পর্যন্ত। তোমার জন্মদিনের আগের শনিবারে আবার দেখা হবে। আমার স্নেহাশীর্বাদ নিও ও বেলুকে এবং খোকাখুকিদের দিও। বেলু কেমন আছে? বেলু বড় ভাল মেয়ে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[৩ থেকে ৯ সংখ্যক পত্রগুলি পত্নী রমাদেবীকে লিখিত]

পোষ্টমার্ক ১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৫ ইং
বারাকপুর,
৭ই জানুয়ারী।

শ্রীচরণেষু—

মা,

কানপুর হইতে লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলাম। সেখান হইতে আগ্রা যাওয়া ঘটে নাই, তবে আসিবার পথে এলাহবাদ ও মোগল সরাই হইয়া আসি। আমাদের রিজার্ভ সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় দিল্লী মেলে হাওড়া হইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কোন কষ্ট হয় নাই। তবে পশ্চিমাঞ্চলের দুরন্ত শীত সহ্য করিতে হইয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে দেরী হইল, তাই আমতা যাইতে পারিলাম না। ২রা জানুয়ারী স্কুল খুলিয়াছে। সরস্বতী পূজার সময় ঘাটশিলা যাইব, ধলভূমগড়ে সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে হইবে। যতশীঘ্র হয় আপনার শ্রীচরণদর্শনে যাইব ইচ্ছা আছে। আপনার শরীর কেমন আছে? কল্যাণী ও উমা ভাল আছে! বৌমা গত শনিবারে ঘাটশিলায় গেলেন। হুটু লইয়া গিয়াছে। মায়াদিদি কোথায় ও কেমন আছে? বেলু ডুনুকেও বহুদিন দেখি নাই। খোকা আশাকরি পড়াশুনা করিতেছে। শ্বশুর মহাশয়কে আমার সভক্তি প্রণাম জানাইবেন ও আপনি গ্রহণ করিবেন। আমতা এমন স্থান যে সেখানে ইচ্ছা করিলেও যখন তখন যাইবার কোন উপায় নাই। নতুবা এই এক বৎসর সেখানে যাই নাই! বনগ্রাম বা ঝাড়গ্রামে কতবার যাইতাম। আমতা যাওয়া অপেক্ষা কাশী যাওয়া সহজ। ছোটখুকি কেমন আছে? সে কি আজকাল কথাবার্তা বলিতে শিখিয়াছে? আশা করি সে আমায় দেখিয়া আর ভয় পাইবে না।

লক্ষ্ণৌ সহরটি সুদৃশ্য ও সুন্দর। হজরতগঞ্জ, বাদশাবাগ প্রভৃতি স্থান কলিকাতার চৌরঙ্গির মত দেখিতে। লক্ষ্ণৌর Zoo দেখিবার মত জিনিস। বাঘ, সিংহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক অরণ্য সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে রাখা হইয়াছে। জিনিসপত্রও খুব সস্তা। আমিনাবাদের বিখ্যাত রাবড়ি ১৲ সের। কানপুরে গঙ্গার ধার জ্যোৎস্না রাত্রে পরম রমণীয় হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ হইতে একটা বেডকভার কিনিয়াছি ৭৲ টাকা দামে—কলিকাতায় সে জিনিসই পাওয়া যাইবে না। পাইলেও দাম ১৬৲ টাকার কম নয়। মাংস ||/০ সের, মাছ ৸৴০/১৲ টাকায় বড় রুই মাছ।

পত্রোত্তরে কুশল জানাইয়া সুখী করিবেন। বালক-বালিকাদের আশীর্বাদ দেবেন। ইতি—

প্রণত—

বিভূতি

[তার শাশুড়ী সাধনা দেবীকে লিখিত]

১১

ঘাটশীলা

২১।৪।৪০

কল্যাণীয়াসু,

মায়া, ৪।৫ দিন হোল এখানে এসেছি। এসে পর্যন্ত পাহাড়ে জঙ্গলে সময় পেলেই বেড়াই—কিন্তু বৃষ্টির জন্যে বড় ব্যাঘাত হচ্চে। কল্যাণীর পত্রে দেখতে পাবে এখানকার বৃষ্টির ধরন কি। আমরা এখানে 'সুবর্ণ সঙ্ঘ' বলে একটা সাহিত্য সমিতির প্রতিষ্ঠা করেচি। মাসে মাসে হয়, বনগাঁয়ের সাহিত্য বাসরের মত। আজ তার একটা অধিবেশন হবে—বিশেষ করে হবে ৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেদিন তাঁর ঘাটশীলার বাড়ীতেই মারা গিয়েচেন, তাঁরই মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করবার জন্যে—অবিশ্যি প্রবন্ধাদিও পড়া হবে। কল্যাণীর একটা লেখা যদি আনতুম, ওবেলা সভায় পড়া হোত, আমার কথাটা মনেই ছিল না। ওর 'নীল শালুক' গল্পটাও এখানে নেই।

সেদিন বনগাঁয়ে বেশ ভাল কেটেচে। আমার মনে একটা দুঃখ আছে, কল্যাণী ও বেলু অনুরোধ করেছিল সিনেমাতে যাবার জন্যে, যেতে পারিনি। তারপর কতবার ভেবেচি, গেলেই হোত—কেন অত তাড়াতাড়ি করলাম কলকাতা আসবার জন্যে? বনগাঁ গেলে নিশ্চয়ই একদিন সিনেমা দেখবো।

তুষারকূট বলে একটা ছোট পাহাড় আছে সুবর্ণরেখার ওপারে। মাইলটাক দূরে আমাদের বাড়ী থেকে। নামটা অবিশ্যি দিয়েচে এখানকার বাঙালী ভদ্রলোকেরা। সোদা কোয়ার্জ জাতীয় পাথরের পাহাড। এপার থেকে বেশ দেখায়—একদিন বিকেলে সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সুবর্ণ-রেখার ওপারে সাধারণতঃ বড্ড বন বলে কেউ যায় না। পাহাড়টাও অসংখ্য কাঁটাগাছে দুর্গম এবং বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের সমাবেশে দুরারোহ। ওর মাথায় যখন উঠলুম, তখন বেলা আর নেই, পাহাড়ের পেছনে চেয়ে দেখি

ঘন বনভূমি মুসাবনী পর্যন্ত বিস্তৃত। নির্জন পাহাড়, অস্তসূর্যের রাঙা আলোয় আকাশের রঙ অদ্ভুত দেখতে হয়েছে—ভারি ভালো লাগলো, অনেকক্ষণ বসে রইলাম। বাংলাদেশের একঘেয়ে সমতলভূমি ছেড়ে এসে বেস লাগে, তবে বাংলার সে শ্যমলতা এখানে নেই। ভূমির প্রকৃতি রুক্ষ, খালি পাথর আর বালি, নদী আছে কিন্তু জল নেই, হেঁটে পার হবার সময় পায়ের পাতাও ডোবে না।

ওখানে এতদিনে নিশ্চয়ই আম উঠেচে? এখানে একটা আমও চোখে দেখবার যো নেই। ভাবচি, একবার দেশের দিকে যাবো। গাছের আমগুলো নষ্ট হয়ে গেল, কাঁটালও যাবে, এখন যদি না যাই।

আশা করি ভাল আছ। আমার স্নেহাশীর্বাদ নিও। চিঠি দিও—ঠিকানা কল্যাণীর চিঠিতে আছে।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পত্রটি শ্রীমতী মায়া মুখোপাধ্যায়কে লিখিত। কল্যাণী—পত্নী শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী ডাকনাম। বেলু—বেলা গোস্বামী, রমা দেবীর ভগ্নী।]

১২

মাঠাবুরু (মানভূম)

১৫।৩।৪৩

সোমবার

কল্যাণীয়াসু,

সকাল বেলা, ৮টা। মাঠাবুরু শৈলশ্রেণীর ঘন বনে কোকিল ও বন্যকুক্কুট ডাকচে। ডাকবাংলোর ঠিক পেছনেই এই বন আরম্ভ; হাজার ফুট খাড়া হয়ে আছে কালো পাথরের তিনটি শৈলশিখর পাশাপাশি, যেন দৈত্যপুরীর প্রাসাদের গম্বুজ। পর্বতশিখরে মাঠা দেবীর স্থান দেখে এসেচি। খাড়া উত্তুঙ্গ পর্বত, নিম্নের ঘন ছায়াবৃত বনানী ঠেলে বড় বড় কালো পথেরের চাঁই ডিঙিয়ে, শাল, পিয়াল, কেঁদ গাছের তলায় তলায় ওপরে উঠলাম। সেখান থেকে নীচের সমতলভূমির দৃশ্য যেন ম্যাপের মত। সত্যিই অপূর্ব দৃশ্য। কাল জ্যোৎস্নারাত্রে বনের মধ্যে বেড়াতে গিয়েছিলাম—করঞ্জা নামে একরকম বড় বড় গাছে জুঁই ফুলের মত সুগন্ধি পুষ্প। বাতাস সুবাসে

ভরপুর করে রেখেছে। শৈল-সানুতে অজস্র গোলগোলি ফুল—আর কি পলাশ! চারিদিকে পলাশের মেলা। এত পলাশ কোথাও দেখিনি। আমাদের বাংলোর পূর্বদিকে দূরে এই শৈলশ্রেণীর সর্বোচ্চ চূড়া গুর্গাবুরু (২২১৮ ফুট) বৈকালের ছায়ায় বিরাট কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত দেখাচ্ছিল। তার বাঁদিকে আর একটা কালো পাথরের চূড়া দূর থেকে বিশাল হস্তী-মুণ্ডের মত দেখতে, ঠিক হাতীর মাথা—মায় শুঁড়টি পর্যন্ত বাদ নেই। এর নাম কাঁড়দাবুরু। এ আরণ্য প্রকৃতি দেখবার মত জিনিস বটে।

এই চিঠি লিখে আজ পুরুলিয়া যাবার পথে এখান থেকে ১০ মাইল দূরবর্তী রাঙাড়ি ডাকঘরে ফেলে যাবো। এখন ৮টা, ১১টার সময় পুরুলিয়া রওনা হবো খেয়েদেয়ে। রান্না চড়ে গিয়েছে। কাল পুরুলিয়া থেকে আদ্রা যাবো। পরশু সেখান থেকে চাঁইবাসা। তোমার কথা বড্ড মনে হচ্চে; এসব একা দেখে আনন্দ নেই। তুমি মানকু থাকলে কত আনন্দ হোত।

১৮ই বা ১৯শে তুমি চলে এসো ঘাটশিলায়। আমিও ঐ দিন ফিরবো। তোমাকে গিয়ে দেখতে পেলে কত খুশি হবো। আমার মাঠাবুরু থেকে আগে লেখা চিঠিখানা ও চাঁইবাসার নিভাদের লেখা পত্রগুলো পেয়েচ তো? সুবোধ ঘোষ এখানে নেই। পরশু ঝালদা চলে গিয়েছে রাস্তার তদারক করতে। মহাজঙ্গলের মধ্যে আছি, সাড়ী কাপড তো দূরের কথা, একপয়সার বিড়ি পর্যন্ত পাওয়া যায় না এখানে। আগে জানা ছিল না বন্য অঞ্চলে আসচি। সাঁওতালী গ্রাম ছাড়া আর কোনো লোকালয় নেই। দশমাইল দূরে ডাকঘর। শুনেই বুঝবে কোথায় আছি। তবে পুরুলিয়ায় দেখবো।

তোমার বাবা ও মাকে সভক্তিপ্রণাম দিও। খোকাখুকীদের সস্নেহ আশীর্বাদ জানিও ও তুমি নিজে প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ কোরো। বেলু কি করে? মায়াদি কোথায়?

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ—পুরুলিয়া যাবার পথে বনের ছায়ায় বসে উত্তুঙ্গ কাঁড়দাবুরু পর্বত চূড়ার ভীম দৃশ্য দেখতে দেখতে এ ক'টি লাইন লিখচি। বিরাট অনাদৃত পাষাণময় পর্বতচূড়া ৪০০ ফুট খাড়া দাঁড়িয়ে। ভয় হয় দেখলে। কেউ উঠতে পারে না। পড়ে যাবে। বেলা ১টা।

আসবার আগে বৌমাকে লিখো। গুটকে ষ্টেশনে থাকবে। ধলভূম

থেকে নুটু উঠবে। ওঃ, কি বিরাট পর্বতচূড়াটা সামনে। মিঃ সিন্‌হা ওর ছবি আঁকচেন পাশে বসে। আমি চিঠি লিখচি।

[পত্রটি শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত। নিভা—চাঁইবাসার বাসিন্দা। সুবোধ ঘোষ—বিহার সরকার পূর্তবিভাগের এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। গুটকে—আশ্রিত গ্রামবাসী। নুটু—ভ্রাতা ৺নুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। মিঃ সিন্‌হা—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হা, বিহার সরকারের প্রাক্তন ফরেস্ট অফিসার।]

১৩

কল্যাণবরেষু,

নুটু, তোমার পত্র পেলাম। কলকাতায় দোকান-পসার সব বন্ধ। গুটকেকে বলেছিলাম মিত্র ও ঘোষের দোকানে এসে টাকা নিতে। কিন্তু খবরের কাগজে যা দেখলাম, তাতে মনে হোল দোকান এখনো খোলেনি। কাজেই টাকা মাত্র ২০টি দিলাম। দোকান বন্ধ থাকার দরুন টাকা কলকাতা থেকেও নিতে পারচি নে। এখানে সব ভালো আছে। বর্তমানে আর টাকা দিতে পারবো না। গুড়ের টাকাও দিলাম। ও কাল কিনে নিয়ে যাবে। আমি আজ কলকাতায় যাচ্চি।

এখানে সব ভাল। বেশ ঘেঁটুফুল ফুটেচে। তবে এখনো ম্যালেরিয়ার আঁচ রয়েচে এদেশে—বা ম্যালিগনাণ্ট ম্যালেরিয়াও হচ্চে। আরও গরম পড়লে আশা করি অসুখ আর থাকবে না।

তোমরা আমার আশীর্বাদ নিও। উমা ও বৌমাকে আশীর্বাদ দিও। আমি ৭ই মার্চ কুচবিহার যাবো বোধহয়। সুবোধকে চিঠি দিলাম, সে লিখেচে পশুপতিনাথের মেলাতে যাবার জন্যে নেপালে। কিন্তু যাওয়া হবে না কারণ সেই সময়েই কুচবিহার সাহিত্য সম্মেলন। মিতে এখানে একদিন এসেছিল। শীঘ্র নাকি ঘাটশিলা যাবে আবার। ইতি—

আঃ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[পত্রটি ভ্রাতা ৺নুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত। পত্রের তারিখ নাই। কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলাকালে সম্ভবত ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে লেখা। মিত্র ও ঘোষ—গ্রন্থ-প্রকাশক। উমা—ভাগিনেয়ী।]

মৌচাকের স্মৃতি

১৯২৫ সালের কথা।

৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম সুধীরবাবুর ['মৌচাক' সম্পাদক ৺সুধীরচন্দ্র সরকার] দোকানে যাই। সেখানে তখন প্রতি বিকালে একটি সাহিত্যিক আড্ডা হোত। আমি তখন নতুন সাহিত্যিক, 'প্রবাসী'তে কয়েকটি ছোট গল্প লিখেছি মাত্র এবং 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের খসড়া করচি। এঁদের এই বৈকালিক আড্ডাটি আমার বড় ভাল লাগতো। কাজকর্মের অবসরে মাঝে মাঝে 'মৌচাক' আপিসে এসে এই আড্ডাতে যোগ দিতাম। ১৯২৯ সালে আমি কলিকাতায় ফিরে আসি, কয়েক বৎসর বিহার প্রবাসের পর। ঐ বৎসরেই 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হয়। ঐ সাল থেকে 'মৌচাক' আপিসে আমার যাওয়া-আসা বাঁধা নিয়মে সুরু হয়ে গেল।

অনেক সাহিত্যিক, শিল্পী, মজলিসি ও রসিক ব্যক্তির সমাগমে 'মৌচাক'-এর আড্ডা গমগম করতো। এইখানেই বন্ধুবর হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণীন্দ্রলাল বসু, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। সুধীরবাবুর আদর-আপ্যায়নে কত বর্ষার বৈকাল ও শীতের সন্ধ্যার চায়ের মজলিস এখানে সরস ও অনন্দময় হয়ে উঠেচে, কত ঠোঙা ঠোঙা 'অবাক জলপান' ফেরিওয়ালার ঝুলির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে বাদল দিনে অতিথি সৎকারে সহযোগিতা করেচে ; 'মৌচাক'-এর ইতিহাসের সঙ্গে সে-সবের ইতিহাসও জড়ানো।

একদিন সুধীরবাবু বললেন– বিভূতিবাবু, মৌচাকের জন্যে লিখবেন ?

আমি একপায়ে খাড়া। বল্লুম—নিশ্চয়ই।

—কি লিখবেন বলুন।

—কি ধরণের লিখি আপনিই বলুন।

—ছেলেদের উপন্যাস দিন। কি বলেন ?

এভাবে ছেলেদের জন্য লেখা উপন্যাস 'চাঁদের পাহাড়' এর সূত্রপাত। সুধীরবাবুর উৎসাহ না পেলে হয়তো ও বই লেখাই হোত না।

আজকাল কলকাতা থেকে দূরে বাস করি। কিন্তু 'মৌচাক'-এর বৈকালিক আড্ডার আকর্ষণ এমন মোহ বিস্তার করেচে মনে, যে, কলকাতায় এলেই ওখানে

না গিয়ে পারি না, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও যাওয়া চাই-ই। বন্ধুবর সরোজ রায়চৌধুরী আসে, মণীন্দ্র বসু আসে, সুধীরবাবু ও অপূর্ববাবু তো থাকেনই—অতীত দিনের আনন্দ মুহূর্তগুলি আবার যেন সজীব হয়ে ওঠে, সে-সব দিনের হারানো অনুভূতিগুলি আবার যেন ফিরে পাই। সেজন্যই 'মৌচাক' কাগজের ওপর আমার কেমন একটা ব্যক্তিগত টান আছে—এর ভালমন্দ ব্যক্তিগত লাভক্ষতির দৃষ্টি নিয়েই দেখি।

আমি জানি, 'মৌচাক' শুধু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ বর্ধন করে না, তাদের পিতামাতারাও অবসর-বিনোদনে যথেষ্ট সাহায্য করে।

চাঁইবাসায় একটি বন্ধু গভর্ণমেণ্টের এনজিনিয়র ও বিদ্বান ব্যক্তি। আমায় বল্লেন—এবার 'মৌচাক'-এ হেম বাগচীর 'গরমেণ্টো' কবিতা পড়েছেন?

আমি বল্লুম—এখনও পড়িনি।

—পড়ে দেখবেন। চমৎকার রস আছে ওর মধ্যে। আজ দুপুরে মসগুল হয়েছিলাম 'মৌচাক'খানা নিয়ে।

এ রকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। একটিমাত্র মনে হোল।

'মৌচাক'-এর লেখা যখন লিখতে বসি, তখন কল্পনানেত্রে দেখি বহু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও তাদের কর্মক্লান্ত পিতাঠাকুরদের উৎসুক দৃষ্টি। সবাই যেন লেখার দিকে চেয়ে রয়েচে একদৃষ্টে—তবে অক্ষমতার জন্যে তাদের সে ঔৎসুক্য চরিতার্থ হয়তো সব সময় করে উঠতে পারি না—যে কথা আলাদা।

রাজপুত্র

কাঞ্চীর রাজপুত্র এবার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন। রাজ্যময় ধূমধাম পড়ে গেছে। কাঞ্চীর উত্তরপ্রান্তে গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুমন্দির। পুরোহিত গেছেন সেখানকার আশীর্বাদী নির্মাল্য আনতে, লোক পাঠানো হয়েচে, প্রয়াগতীর্থ থেকে জল আনবার জন্যে। সেই জলে স্নান করিয়ে বিষ্ণুর পূজা-নির্মাল্য তাঁর কপালে দিয়ে রাজপুত্রকে পুরনারীরা বরণ করবেন।

রাজা বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করচেন। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। কোশলরাজের দূত কি এক প্রস্তাব নিয়ে এসেচে, রাজা তাই আজ সারাদিন ধরে মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন—শরীর ও মন দুই বড়ো ক্লান্ত। এমন সময়ে রাজকুমার কক্ষে ঢুকে পিতাকে প্রণাম করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজা বললেন, 'চন্দ্রসেন, তোমার কিছু বলবার আছে?'

রাজপুত্র বিনীত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, 'বাবা, গত বছর যখন গুরুগৃহ থেকে ফিরে আসি, তখন আপনি বলেছিলেন—আমায় কিছুদিন দেশভ্রমণে যাবার অনুমতি দেবেন। আপনার অসুখের জন্যে এতদিন কোনো কথা বলিনি। আমি এইবার সে বিষয়ে অনুমতি চাই।'

—'তুমি জানো, তোমার যৌবরাজ্যের অভিষেকের সব আয়োজন করা হয়েচে?'

—'সেই জন্যেই তো আরও বেশী করে যেতে চাই, বাবা। আমি কাঞ্চী ছাড়া জীবনে কখনও কিছু দেখলুম না, জানলুম না—কানে শুনেচি, উত্তরে হিমবান পর্বত আছে, দক্ষিণে সমুদ্র আছে, পশ্চিমে সিন্ধুনদ আছে—কাঞ্চী ছাড়া আরও কতো রাজ্য-দেশ আছে, কিন্তু উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সে আমি চোখ থেকেও অন্ধ। যার জীবনে কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তাকে দিয়ে দেশ শাসন কি করে হবে! আমায় যেতে দিন, বাবা।'

এর দু'দিন পরে রাজ্যের লোক সবিস্ময়ে শুনলে রাজকুমার চন্দ্রসেনের অভিষেক-উৎসব সম্প্রতি স্থগিত থাকলো—কারণ, তিনি চলেচেন দেশ ভ্রমণে—একা, সঙ্গে তিনি কাউকে নিতে রাজী নন।

সত্যাই রাজকুমার কাউকে সঙ্গে নেন নি।

আজ সপ্তাহ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, চন্দ্রসেন তাঁর প্রিয় সাদা ঘোড়াটিতে চড়ে একা পথ চলেছেন। তাঁর সঙ্গে থাকবার মধ্যে বাঁ দিকে খাপে-ঝোলানো পিতৃদত্ত তলোয়ারখানি। আর আছে চোখে অসীম তৃষ্ণা, বুকে অদম্য সাহস ও নির্ভীকতা। কাঞ্চী রাজ্যের সীমা ছাড়িয়েও দু'দিনের পথ চলে এসেছেন, কতো গ্রাম, মাঠ, বন, নদী পার হয়ে চলেছেন—সবই অচেনা, এ তাঁর নিজের রাজ্য কাঞ্চী নয়, এখানে তিনি একজন অজানা পথিক মাত্র।

তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। এক নদীর ধারে তাঁর ঘোড়া এসে পৌঁছালো তাঁকে নিয়ে। প্রকাণ্ড নদী—বিকেলের রাঙা আলোয় ওপারের বনরেখা অপূর্ব দেখাচ্ছে। অতবড়ো নদী কি করে পার হবেন, রাজকুমার চিন্তায় পড়লেন। কোনোদিকে মানুষের বাসের চিহ্ন নেই—সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে ধূসর হয়ে এলো। বিজন নদী—তীরের ছন্নছাড়া চেহারাটা সুমুখ-আঁধার রাতে গাঢ় ছায়ায় যেন আরও বেশী ছন্নছাড়া হয়ে ফুটে উঠলো।

ওপারে দূরে একটা পাহাড়—নীল চূড়া একটু একটু চোখে পড়ে। রাজকুমার চেয়ে থাকতে থাকতে পাহাড়ের ওপর থেকে আগুন-রাঙা একটা হল্‌কা হঠাৎ আকাশের পানে লক্‌-লক্‌ করে জ্বলে উঠেই দপ্‌ করে নিবে গেলো। রাজপুত্র অবাক হয়ে সেদিকে চেয়েই আছেন, এমন সময়ে একটা প্রকাণ্ড বাজপাখী সন্ধ্যার আকাশে ডানা মেলে নদীর উজান দিক থেকে উড়ে এসে তাঁর মাথার ওপর তিন-চার বার চক্রাকারে ঘুরে আবার কোন্‌দিকে অদৃশ্য হলো।

রাজকুমারের নির্ভীক মনও একটুখানি কেঁপে উঠলো। তিনি জানতেন, তাঁদের বংশে কারুর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মাথার ওপর গৃধ্রজাতীয় পাখি তিনবার ওড়ে—কেউ কেউ বলেচেন, বিশেষ করে শাকুন-শাস্ত্রবিৎ কোনো গণৎকার সেবার বলেছিলেন যে, এই গৃধ্র তাঁদের পূর্বপুরুষদের হাতে অন্যায়ভাবে অবিচারে নিহত কোন শত্রুর আত্মা—বহুকাল ধরে সে পৈশাচিক উল্লাসের সঙ্গে জানিয়ে দিয়ে যায় নিজ-শত্রুর বংশধরের মৃত্যুর পূর্বাভাস। কোথা থেকে আসে, কোথায় আবার উড়ে চলে যায়—কেউ বলতে পারে না।

রাতের সঙ্গে সঙ্গে এলো হাড়-কাঁপানো ধারালো শীত। একটা বড়ো গাছও কোথাও নেই, যার তলায় আশ্রয় নিতে পারেন। অবশেষে একটা মাটির ঢিপির পেছনে ঘোড়া থেকে নেমে রাজপুত্র নিজের আসন বিছোলেন—সেখানটাতে হাওয়া বেশী লাগে না—শুকনো লতা-কাটি কুড়িয়ে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করে সে রাত্রের মতো তিনি সেইখানেই রইলেন। উপায় কি?

গভীর রাত্রে রাজপুত্রের ঘুম ভেঙে গেলো! বহুদূরে যেন কাদের আর্তনাদ—মৃত্যু-পথের পথিকদের অন্তিম চীৎকারের মতো করুণ। রাজপুত্র নিজের অলক্ষিতে একবার শিউরে উঠলেন। শয্যার পাশের আগুন নিবে গিয়েচে, রাজপুত্র উঠে ভাল করে আগুন জ্বালালেন। সারারাত্রির মধ্যে ঘুম আর এলো না কিন্তু।

ভোরের দিকে একটা ডিঙি পাওয়া গেলো। তাতে পার হয়ে রাজকুমার ওপারে গিয়ে উঠলেন। ডিঙির মাঝি আধ-পাগলা এবং বোধহয় কানে কম শুনতে পায় না। রাজকুমারের প্রশ্নের কোনো উত্তর সে দিতে পারলে না।

প্রথমে একটা মরুভূমির মতো মাঠ—ঘাস, খড়, গাছপালা কিছুই নেই—কটা রঙের বালির পাহাড় এখানে-ওখানে। অনেক দূরে গিয়ে একটা জনপদ। কিন্তু কেমন একটা নিরানন্দ ভাব চারিদিকে। পথ দিয়ে পথিক চলে না, দোকান-পসারে খদ্দের নেই, নদীর ঘাটে স্নানার্থীর দল নেই, মাঠে চাষারা চাষ করে না—যেন কেমন একটা বিষাদ ও অমঙ্গলের ছায়া চারিদিকে।

রাজকুমার ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় বড়ো কাতর হয়েছিলেন। কাছেই গৃহস্থের বাড়ি। সেখানে গিয়ে আশ্রয় চাইতেই তারা খুব যত্নের সঙ্গে আশ্রয় দিলে। অনেকদিন পরে রাজকুমার ভালো খাবার খেলেন, ভালো বিছানায় বিশ্রাম করতে পেলেন, মানুষের সঙ্গ অনেকদিন পরে বড়ো প্রিয় মনে হলো। কয়েকদিন সেখানে রয়ে গেলেন তিনি। গৃহস্থের একটি ছোটো মেয়ে ও ছেলের সঙ্গে রাজকুমারের বড়ো ভাব হলো। তারা তাঁকে ফুল তুলে মালা গেঁথে দেয়, দুপুরে তাঁর কাছে বসে গল্প শোনে. তাদের শত আবদার প্রতিদিন তাঁকে সহ্য করতে হয়। ছোটো ছেলেটির উপদ্রবের তো আর অন্ত নেই!

অল্পদিনের মধ্যে রাজকুমার সে বাড়ির সবার তো বটেই, গ্রামের সকলেরও প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলেন। এতো সুন্দর মুখশ্রী, এমন সুন্দর কান্তি, এমন মিষ্টি স্বভাবের মানুষ তারা কখনও দেখেনি। রাজকুমারের আসল পরিচয় কেউ জানেনি। তিনি কাউকে সে কথা বলেন নি। সবাই ভাবে, তিনি একজন গৃহহীন পথিক—হয়তো তাঁর কেউ কোথাও নেই। এতে সবারই স্নেহ তাঁর ওপর আরও বেড়ে যায়, কিসে তিনি সুখে থাকবেন, কিসে আত্মীয়হীন নিঃসঙ্গ প্রবাস-কষ্ট তাঁর কমবে—সবারই এ চেষ্টা।

তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, এমন সুন্দর চেহারার ছেলে নিশ্চয়ই কোনো বড়ো-ঘরের হবে। গ্রামের যিনি মণ্ডল, তাঁর এক মেয়ে পরমাসুন্দরী

—সবাই বলে, ওই ছেলেই এ মেয়ের উপযুক্ত হবে। বিধাতা ওর জন্যেই যেন এই দেবতার মতো সৌম্যকান্তি ছেলেটিকে কোথা থেকে জুটিয়ে এনেচেন। মণ্ডলগৃহিণীও রাজকুমারকে একদিন দেখে এতো পছন্দ করলেন যে, তিনি স্বামীকে জানিয়ে দিলেন—যদি ঐ ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয় ভালোই—নইলে মেয়ে চিরকুমারী থাকুক, তাঁর আপত্তি নেই।

রাজকুমার কিন্তু কিছুতেই তেমন আমোদ পান না। তাঁর মনে কি একটা বিপদের ছায়া সকল আনন্দকে ম্লান করে রাখে। একবার ভাবেন, হয়তো বাপ-মাকে অনেকদিন দেখেন নি বলে এমন হয়—কিন্তু তাঁর মন বলে তা নয়, তা নয়—ও-সব সামান্য সুখ-দুঃখের ব্যাপার এ নয়—এমন একটা কিছু, যার কারণ আরও গভীর, জীবন-মরণ নিয়ে এর কারবার।

ক্রমে এলো সে মাসের কৃষ্ণপক্ষ। রাজকুমার অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, বাড়িতে সবারই চোখে জল—গ্রামসুদ্ধ সকলে বিষণ্ণ, নিরানন্দ। কেউ কোনো কথা বলে না, কারণ জিগ্যেস করলেও উত্তর পাওয়া যায় না। সবাই কিসের ভয়ে জুজু হয়ে আছে যেন।

অবশেষে রাজকুমার কথাটা শুনলেন। এখান থেকে এক যোজন দূরে গৃধ্রকূট পাহাড়ের ওপর রাজগুরু এক কাপালিকের সাধন-পীঠ। প্রতি অমাবস্যায় সেখানে নরবলির জন্যে প্রতি গ্রাম থেকে পালাক্রমে একটি তরুণ বয়স্ক লোক পাঠানো চাই-ই। রাজার হুকুম। এবার এ গ্রামের পালা।

শোনামাত্র রাজকুমার কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। তাঁর পিতৃদত্ত তূণের তীক্ষ্ণ ইস্পাতের ফলা-পরানো যে বাণ, তা কি শুধু নিরীহ পশুপক্ষী শিকারের জন্যে?

"খেত হতে ত্রাণ করে এই সে পরাণ—মহান ক্ষত্রিয় নাম বিদিত জগতে।"

—অস্ত্রগুরুর সে উপদেশ রাজকুমার কি ভুলে গিয়েচেন!

অমাবস্যার দিন মণ্ডলের বাড়িতে পাশার সাহায্যে নির্ধারিত হবে এবার কে যাবে গ্রাম থেকে। রাজকুমার এ-কথা শুনলেন। অমাবস্যার পূর্বদিন গভীর রাত্রের অন্ধকারে তিনি চুপি চুপি শয্যাত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন—কেউ জানে না। সকালে উঠে তাঁকে আর কেউ দেখতে পেলে না।

মণ্ডলের বাড়িতে পাশার মজলিসে যার নাম উঠলো সে গৃহস্থের একমাত্র পুত্র। সবাই চোখের জলে ভেসে তাকে বিদায় দিলে। তার বৃদ্ধ পিতা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চললো কাপালিকের কাছে—যদি হাতে-পায়ে ধরে ছেলেকে ছাড়িয়ে আনতে পারে। এই দুরাশায়।

গৃধ্রকূট পর্বতের পাদদেশে গিয়ে তারা যা দেখলে, তাতে তারা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলো। বড়ো জামগাছটার তলার দুটো মৃতদেহ : একটা তাদের গ্রামের সেই তরুণ অতিথির, আর একটা কাপালিকের—দেখে মনে হয়, দু'জনেই পরস্পরকে অস্ত্রাঘাত করেচে। দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ সবাই ছুটে এলো দেখতে, যে নিজের প্রাণ দিয়ে তাদের চিরকালের জন্যে বিপদ-মুক্ত করে গেলো —রাজার ভয়ে গোপনে চোখের জলে ভেসে তার শেষ সৎকার সম্পন্ন করলে।

রাজকুমারের আসল পরিচয় সে-দেশের লোক তখনো জানেনি।

চ্যালারাম

দিল্লীর এক পার্কে চ্যালারামের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। ভীষণ জোয়ান, পুরো ছ-ফুট ছ-ইঞ্চি লম্বা, হাতের কব্জি এই মোটা, এই গোঁফ দাড়ি। এই বুকের ছাতি। কথায়-কথায় জানতে দেরী হোল না যে চ্যালারাম একজন অসাধারণ লোক। তার মুখের ভাব এমনি যে, দেখলে মনে হয়, জীবনের অনেকখানি এ দেখেচে। এমন ব্যাপার ঘটেচে এর জীবনে, যা সচরাচর মানুষের জীবনে ঘটতে দেখা যায় না।

তার ওপর মুশকিল হয়েচে আমরা বাঙালী, আমাদের জীবনে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ! তবু অমৃতসরে, দিল্লীতে, করাচীতে, ডেরাগাজিখাঁতে যারা জন্মায়—তারা অনেক কিছু দেখে, অনেক কিছু করে। আমরা যারা খুব কিছু করি, বাপের পয়সার-খই ছড়াতে ছড়াতে বিলেতে গিয়ে উঠি। আমাদের চেয়ে মাদ্রাজী, তেলেগু, নোয়াখালি ও চাটগাঁয়ের মুসলমানেরা ভালো—তারা তবুও পাঁচটা দেশ দেখে, জাহাজের খালাসী-টালাসী হয়, যা হোক তবুও কিছু।

চ্যালারাম আমার কৌতূহল আকৃষ্ট করবে বেশী কথা নয়, যখন সে প্রথমেই বললে সে ফ্রান্সে গিয়েছিল যুদ্ধের সময়. যুদ্ধ শেষ হবার পরে সে আবার একটা কিসে ভর্তি হয়ে মেসোপটেমিয়ায় যায়। মরুভূমিতে আরবদের হাতে পড়েছিল, টাইগ্রিসে নৌকোর বাচ খেলে এসেচে। বেবিলনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে চুরোট খেয়েচে।

আমি বললুম—তোমার জীবনে সকলের চেয়ে একটা বড় ঘটনার কথা বলো না, শুনি।

চ্যালারাম বলতে আরম্ভ করলে—

অমৃতসর জেলায় আমার বাড়ি। আমাদের গ্রামে সবাই এমন গরীব যে একজন একুশ টাকা মাইনে পেতো কলকাতায় কি কাজ করে—গ্রামের মধ্যে সেই ছিল বড় লোক ও বড় চাকরে। সে বলতো কলকাতায় সে পুলিসের দারোগা।

আমার স্বভাব ছিল দুর্দে ও নির্ভীক। আঠারো বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে দিয়ে কিছু টাকা জোগাড় করে কলকাতায় এলাম। ভাবলাম, পুলিশের দারোগা যদি হঠাৎ না হতে পারি, হেড কনস্টেবল হওয়া কে আটকাবে?

কলকাতা এসেই ভুল ভেঙে গেল। গ্রামের সেই লোকটাকে খুঁজে বার করে দেখলাম সে এক বড়লোকের বাড়ির দরোয়ান। সে আমার কলকাতায় থাকবার একমাসের খরচ দিতে চাইলে, যদি কাউকে গাঁয়ে ফিরে তার দরওয়ানী করার কথাটা বলে না বেড়াই। তারই পরামর্শে মোটর গাড়ির কাজ শিখলাম। কিছুদিন কলকাতায় মোটর চালাবার পরে ইউরোপের মহাযুদ্ধ বাধলো। আমি সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে করাচী ও সেখান থেকে গেলুম ফ্রান্সে। এ সব দিনের অভিজ্ঞতা খুব বিচিত্র হোলেও বিস্তৃত বর্ণনা করবার দরকার নেই। যুদ্ধ শেষ হবার পরে গ্রামে ফিরে গেলাম, কিন্তু বেশীদিন ভাল লাগলো না। আবার একটা চাকরিতে ভর্তি হয়ে চলে গেলুম মেসোপটেমিয়া। তিন বছর পরে মেসোপটেমিয়া থেকে ফিরে বম্বে এলাম। হাতে তখন কিছু টাকা হয়েচে, ভাবলাম একটা ট্যাক্সি গাড়ি কিনে বম্বে কি কলকাতার রাস্তায় চালাবো। কিন্তু দু-তিন দিন পরে একটা সরাইখানায় জন কয়েক পাঠান গুণ্ডার সঙ্গে একটা ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া বেধে ছুরি মারামারি হোল। আর একজন পাঠান জখম হোল। আমার সঙ্গে আমার এক বন্ধু ছিল। পুলিশের ভয়ে দু-জনে রাতারাতি বম্বে ছেড়ে চম্পট দিলাম।

অনেক বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হয়ে দু-জনে আমরা কোয়েটা হয়ে মরুভূমির পথে কাবুল পৌঁছে গেলাম। তখন নতুন বাস ও লরি চলচে কাবুলে, অনেক বড় লোকের মোটর হয়েচে। কিন্তু ভালো মোটর ড্রাইভারের সংখ্যা তত বেশী নয়। আমাদের মোটর চালানোর কাজ পেতে দেরী হোল না।

কয়েক বছর কেটে গেল। বেশ সুখেই আছি! আগে হাতে পয়সা ছিল, সেই পয়সায় নিজে একটা লরি কিনে কাবুল কান্দাহারের পথে চালাই।

জিনিসপত্র সস্তা, অনেক বন্ধু-বান্ধবও জুটে গেল, লরি চালিয়ে ক্রমশঃ উন্নতি হতে লাগলো। কাবুলে ভোলানাথ বলে একজন লোক ছিল, বিখ্যাত লোক। সে জাতে গুজরাটী ব্রাহ্মণ, অনেক দিন থেকে কাবুলে আছে। এখানে পুরুতের কাজ করে। মীরমকুদ্ বাজারের দক্ষিণে ছোট একটা গলির মধ্যে তার একটা ছোট মন্দির আর বাড়ি।

ভোলানাথের মন্দিরটি এক অদ্ভুত জায়গা।

সন্ধ্যার পর থেকে নানা ধরনের লোক সেখানে এসে আড্ডা দিতে আরম্ভ করে। চা হরদম চলচে, মোটা কড়া তামাকের ধোঁয়ায় মন্দিরের চাতাল অন্ধকার হয়ে যায়। এদিকে ঘণ্টা বাজে, আরতি হয়, প্রসাদ বিতরণ হয়। রাত বারোটা একটা পর্যন্ত লোকের পর লোক আসচে। তার মধ্যে খুব বড় প্রতিপত্তিশালী ব্যবসাদার থেকে আমার মত বাজে লোকও আছে। আর সবারই ওপর ভোলানাথের প্রভাব খুব বেশী। সবাই তাকে মানে, খাতির করে, তার কাছে পরামর্শ নেয়।

একদিন রাত আটটার সময়ে ভোলানাথের মন্দিরে গিয়েচি।

চা পান শেষ হয়ে গিয়েচে। ভোলানাথ আমায় বললে—চা খাবে নাকি?

বললাম—থাক, রাত হয়েচে এখন আর চা খাবো না।

হঠাৎ আমার নজর পড়লো দলের মধ্যে একজন আফগান রাজকর্মচারী বসে। আমি তাঁকে অনেকবার পথে ঘাটে মোটর হাঁকিয়ে যেতে দেখেচি। অত বড় লোককে এখানে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু মুখে কোনো কথা কাউকে বলা উচিত না বিবেচনা করে চুপ করে রইলাম।

একটু পরে আফগান অফিসারটি চলে গেলেন।

শুনলাম আমাদের মধ্যে কে কে মেসিনগান চালাতে জানে আফগান অফিসার তাই জিগ্যেস করতে এসেছিলেন।

—ব্যাপার কি? মেসিনগান কি হবে? লড়াই কোথায়?

অনেক রাত্রে উঠে আসচি, আমার এক বিশেষ বন্ধু জোয়ালা-প্রসাদ আমায় চুপি চুপি বললে—টাকাকড়ি যদি ব্যাঙ্কে থাকে, উঠিয়ে নাও এই বেলা—

অবাক হয়ে বললাম—কেন, কি হয়েচে?

—আমানুল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হবে শীগগির।

—কে বিদ্রোহ করবে?

—আমার কাছে অত খবর তো পৌছায় নি। তুমি নিজে সাবধান হও

মিটে গেল। দু-একদিনের মধ্যে আগুন জলবে। বেশী রাতে রাস্তায় চলাফেরা করো না।

মীরমকুদ্ বাজারের নীচ শ্রেণীর কাফিখানাগুলোতে তখনও আমোদ-প্রমোদ চলচে। এসবগুলো ভয়ানক জায়গা রাতে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, বেখাপ্পায় ছোরার ঘায়ে কত লোক যে প্রাণ হারিয়েচে তার ঠিকানা নেই।

বাজার ছাড়িয়েচি, এমন সময় হঠাৎ দূরে দুমদাম বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পট্-পট্-পট্-পট্ মেশিন গানের আওয়াজ।

বাচ্চা-ই-সাকোর বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেল।

মীরমকুদ্ বাজারের লোকজন হুড় হুড় করে দোকান কাফিখানা ছেড়ে বার হয়ে এল, কেউ কিছু জানে না, সবাই কানখাড়া করে শুনচে।...

বিদ্রোহ কথাটা কিন্তু শীগগির তুলোর আগুনের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই সন্ত্রস্ত ভীত হয়ে উঠলো—বিদ্রোহ মানে খুন, মানে লুটপাট, মানে গৃহদাহ, মানে পৈশাচিক অরাজকতা ও নিষ্ঠুরতা। বিশেষতঃ এই সব জায়গায়।

ঠিক তাই ঘটল। বাচ্চা-ই-সাকোর বিদ্রোহ যখন পুরোমাত্রায় চলেচে, তখনকার কথা সবই জানি, কিন্তু সে সব কথা বলব না। চোখের সামনে যে সব ব্যাপার দেখেচি, এতদিন পরেও সে কথা ভাবলে শরীর শিউরে ওঠে। মীরমকুদ্ বাজারে রক্তের স্রোত বইল। কে যে কাকে মারে, তার ঠিকানা নেই কিছু। সুযোগ পেয়ে বদ্‌মাইস খুনী গুণ্ডার দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেচে—বাচ্চা-ই-সাকোর সৈন্যেরা করেচে রাজনৈতিক বিদ্রোহ—সুবিধা পেয়ে শহরের সাধারণ গুণ্ডা ও দস্যুর দল দিন-দুপুরে খুন রাহাজানি শুরু করে দিলে। আরও কত কি করলে, তার আর উল্লেখ না করাই ভালো।

একদিন রাত্রে আমার বন্ধু জোয়ালাপ্রসাদ এসে আমায় বললে—চুপি চুপি উঠে এসো ভোলানাথের ডেরায়—কোনো কথা জিগ্যেস কোরো না।

মীরমকুদ্ বাজার পার হবার সময়ে তার অন্ধকার চেহারা দেখে মনটা দমে গেল। ভোলানাথের মন্দিরে গিয়ে দেখি শিখ ও জাঠ যে ক-জন ড্রাইভার কাবুলে উপস্থিত ছিল, সবাই জড় হয়েচে—জনদশেক সবসুদ্ধু। আর উপস্থিত আছেন সেই আফগান অফিসার আর তার সঙ্গে আর একজন দীর্ঘকায় সুপুরুষ আফগান, সাহেবী পোশাক পরা। মন্দিরের অস্পষ্ট আলোয় ওদের মুখ ভাল দেখা যায় না।

আফগান সর্দার বললেন—তোমাদের মধ্যে কে কে এই রাত্রেই কাবুল থেকে কান্দাহারের পথে মোটর নিয়ে যেতে পারবে? সেখান থেকে কে কে বোম্বাই পৌঁছুতে পারবে?

আমি তো অবাক। কোথায় কান্দাহার, আর কোথায় বোম্বাই। তাছাড়া যাবার পথ কৈ?

বিদ্রোহীরা তো খাইবারের পথ আটকেচে। আপাততঃ কাবুল নদী পেরুনো যাবে কিনা সন্দেহ। কেন, কাকে নিয়ে যেতে হবে?

আফগান অফিসার বললেন—চামানের পথে কোয়েটা হয়ে বোম্বাই পৌঁছুতে হবে। দশখানা লরি চাই। প্রাইভেট মোটর দু-খানা থাকবে। তা চালাবার লোক চাই। যত টাকা চাও পাবে।

আমরা সবাই ঘাড় নাড়লুম। অসম্ভব। চামানের পথে কোয়েটা হয়ে বোম্বাই। এই ভীষণ দিনে।

আফগান অফিসারটি অনেকক্ষণ তর্কবিতর্ক করলেন, ভয়ও দেখালেন—কোনো ফল হোলো না।

এমন সময় সাহেবী পোশাক পরা সেই সুপুরুষ লোকটি অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—কেন, তোমাদের আপত্তিটা কি?

আমার ডাইনে বাঁয়ের দু-তিন জন শিখ ও জাঠ চমকে উঠেই আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করলে। জোয়ালাপ্রসাদ বিস্ময়ে কাঠ হয়ে কলের পুতুলের মত বলে উঠল—জাঁহাপনা!…

আমিও তখন চিনলাম। কি সর্বনাশ! স্বয়ং রাজা আমানুল্লা।

আমানুল্লা বললেন—শোনো। যা চাও তাই পাবে। আমার দশখানা লরি দরকার। কে কে রাজি আছ? আমাকে বোম্বাই পৌঁছে দিতে হবে। বড্ড বিপদে পড়ে তোমাদের ডেকেচি। তোমাদের বিশ্বাস করতে পারি?

আমরা সমস্বরে বলে উঠলুম—জা॰ কবুল, হুজরালি—আমরা তৈয়ার। হুকুম করুন কোথায় গাড়ি আনতে হবে। আমানুল্লা রিস্টওয়াচে সময় দেখে বললেন—এক ঘণ্টার মধ্যে গাড়ি এইখানে নিয়ে এসো। তারপর কোথায় যেতে হবে ইনি বলে দেবেন।

সেই রাত্রে দশখানা লরি ও দু-খানা প্রাইভেট মোটর চুপি চুপি কাবুল ছেড়ে কান্দাহারের পথে রওনা হোল। চারখানা লরিতে বোঝাই হোল শুধু টাকা

—তামার চওড়া পাতে আঁটা কাঠের ভারী বাক্স বোঝাই নগদ টাকা। প্রাইভেট মোটর দু-খানায় রাজা, রানী, ছেলেমেয়ে। সামনে পেছনে দু-খানা লরিতে তেরপল চাপা মেসিনগান।

শেষ রাত্রে কুয়াশার মধ্যে কাবুলের নিঃশব্দ রাজপথ দিয়ে দেশের রাজা রানীকে নিয়ে আমরা তীরের বেগে গাড়ি উড়িয়ে দিলাম।

কাবুল নদী পেরিয়ে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর বিদ্রোহীদের একটা ঘাঁটি। এতগুলো গাড়ি গেলে নিশ্চয়ই ওরা সন্দেহ করে পথ আটকাবে। জাঠ পূরণমল মেসিন গানের পেছনে তৈরী হয়ে বসলো। আমরা কি করবো ভাবচি—স্বয়ং আমানুল্লা হুকুম, দিলেন, কেটে বেরিয়ে চলো—

গম্বুজের কাছে ওরা অনেকে জড় হয়েচে দূর থেকে দেখতে পাচ্চি। আমরা এ্যাকসিলারেটরে পা দিয়ে সজোরে চাপলাম—চালাও! হু হু করে স্পিডো-মিটারে ত্রিশ মাইল থেকে ঠেলে উঠল চল্লিশ···পঞ্চাশ—চক্ষের নিমেষে ওদের ঘাঁটিটা একটা রাঙা কালো আবছায়ার মত পাশ দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল—দুমদাম রাইফেল চললো···পট্‌পট্‌ মেসিনগান উত্তর দিলে আমাদের দিক থেকে। একখানা টাকা বোঝাই লরি টায়ার ফেটে অচল হয়ে পড়লো। রইলো সেটা পড়েই। কেই তার দিকে চাইলাম না।

পেছনে ওরা এবার তাড়া করবে নিশ্চয়ই। আমাদের সময় ছিল না; কান্দাহারে খবর পেলাম, কোয়েটা যাবার পথ বিদ্রোহীরা আটকেচে। ঘুরে হেলমন্দ নদী পার হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আমরা আফগানিস্থানের সীমানা পার হই। তারপর বেলুচিস্তানের দুর্গম মরুভূমি···কালো কালো গাছপালাহীন পাহাড় আর কটা বালির মরুভূমি···মরুভূমি আর পাহাড়।

এই মরুভূমির মধ্যে কালাত থেকে চামানের পথে বেলুচ দস্যুরা আমাদের অক্রমণ করলে, ভাবলে লরি বোঝাই সওদাগরী মাল যাচ্চে। মেসিনগান খেয়ে হটে গেল। একবার জল গেল ফুরিয়ে। এঞ্জিনের ট্যাঙ্কের গরম জল রাজা রানীকে খেতে দিলাম নিজেদের বঞ্চিত করে। হয়তো সেবার সবসুদ্ধ মরতে হোত মরুভূমির মধ্যে; কারণ ঠিক সেই সময় বেজায় বালির ঝড় উঠলো। রাস্তা নেই, দিক মুছে গেল, তার ওপর মুশকিল একখানা সেলুন গাড়ির এঞ্জিন অকর্মণ্য হয়ে পড়লো, কি যে সেটার ঘটল, কিছুতেই আমরা তা ধরতে পারলাম না। বাকী গাড়িখানায় ঐ গাড়ির ছেলেমেয়েদের তুলে দিলাম—সেই ভীষণ গরমে, তৃষ্ণায় আর ঠাসাঠাসিতে তাদের কি কষ্ট!

একেবারে নেতিয়ে পড়লো গাড়ির মধ্যে। আমানুল্লা নেমে এসে লরিতে ড্রাইভারের পাশে বসলেন। সৌভাগ্যক্রমে ঘণ্টা-দুইয়ের মধ্যে কালাত থেকে করাচীগামী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ডাক মোটরের সঙ্গে আমাদের দেখা হোল। ডাক পাহারা দেবার জন্যে সঙ্গে একখানা সাঁজোয়া গাড়ী, কারণ ঐ সময়টা বেলুচ দস্যুদের বড উৎপাত চলছিল মরুভূমির পথে। একদিনে চামান, পরদিন দুপুরে করাচী। ঠিক হোল সেখান থেকে ট্রেনে রাজা রানী বম্বেতে যাবেন। আমরা ফিরলাম সেইদিনেই কাবুলে। জনপিছু দুশো টাকা বকসিস মিললো, গাড়িভাডা ও তেলের দাম বাদে। বিদায় নেবার সময় আমানুল্লা আমাদের প্রত্যেকের করমর্দন করলেন। বললেন—যদি কখনও ফিরি, তোমাদের ভুলবো না। চেয়ে দেখি রানীমার চোখে জল। আমাদেরও চোখ সে সময় শুষ্ক ছিল না, বোধহয় কঠোর প্রাণ দুর্ধর্ষ জাঠ পূরণমলেরও না, নইলে সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল কেন?

বামা

আমার যখন বাইশ-চব্বিশ বছর বয়স—তখন নানা দেশ বেড়ানোর একটা কাজ জুটে গেলো অদৃষ্টে। তখন আমি দৈব-ওষুধের মাদুলি বিক্রী করে বেড়াতুম। চুঁচড়োর শচীশ কবিরাজের তরফ থেকে মাইনে ও রাহাখরচ পেতুম। অল্প বয়সের প্রথম চাকরি, খুব উৎসাহের সঙ্গেই করতুম।

আমাকে কাপড়চোপড় পরতে হতো সাধু ও সাত্ত্বিক বামুনের মতো। ওটা ছিলো ব্যবসায়ের অঙ্গ। গিরিমাটির রঙে ছোপানো কাপড পরণে, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, গলায় মালা, হাতে থাকতো একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ, তারই মধ্যে মাদুলি ও অন্যান্য ওষুধ থাকতো।

বছর-তিনেক সেই চাকরি করি, তারপর শরীরে সইলো না বলে ছেড়ে দিলুম।

একবার যাচ্ছি বর্ধমান জেলার মেমারি স্টেশন থেকে মাখমপুর নামে এক গ্রামে। এটা মাদুলি বিক্রীর জন্যে নয়; মাখমপুরে শচীশ কবিরাজ মহাশয়ের শ্বশুরবাড়ী। সেখানকার জমিজমার ওয়ারিশান দাঁড়িয়েছিলেন শচীশবাবু—

শ্বশুরের ছেলেপুলে না থাকায়। আমাকে পাঠিয়েছিলেন পৌষ-কিস্তির সময় জমিজমার খাজনা যতটা সম্ভব আদায় করে আনতে।

কিন্তু তা হলেও পরণে আমার গেরুয়া কাপড়, হাতে মাদুলি ও ওষুধভরা ক্যাম্বিসের ব্যাগ ইত্যাদি সবই ছিলো, যদি পথে-ঘাটে কিছু বিক্রী হয়ে যায়, কমিশনটা তো পাবো!

কখনও ও অঞ্চলে যাইনি। মেমারি স্টেশনে নেমে বেলা দুটোর সময়ে হাঁটচি তো হেঁটেই চলেচি, পথ আর ফুরোয় না। এক জায়গায় একটা ছোটো বাজার পড়লো, সেখানে কিছু খেয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম।

গ্রামে গ্রামে ওষুধ বিক্রী করে বেশ রোজগারও করা গেলো, দেরীও হলো বিশেষ করে সেইজন্যে। আর একটা বাজার পড়লো। পথে সেখানে দোকানদারদের কাছে শুনলুম, আমার গন্তব্যস্থানে পৌছোতে অন্ততঃ রাত ন'টা বাজবে। কিন্তু সকলেই বললে, 'সন্ধ্যের পর গিয়ে আগে আর পথ হাঁটবেন না, ঠাকুরমশায়। এই সব দেশে ফাঁসুড়ে ডাকাতের বড়ো ভয়, বিদেশী দেখলে মেরেধরে যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়। প্রায়ই বনের ধারে বড়ো-বড়ো মাঠের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকে ওরা। সাবধান, একটা দীঘি পড়বে মাঠের মধ্যে ক্রোশ-তিনেক দূরে, জায়গাটা ভালো নয়...'

বড়ো-বড়ো মাঠের ওপর দিয়ে রাস্তা। সন্ধ্যে প্রায় হয়-হয়, এমন সময় দূরে একটা তালগাছ-ঘেরা দীঘি দেখা গেলো বটে। আমার বুক ঢিপঢিপ করে উঠলো। দীঘির ও-পাশে সঞ্জয়পুর বলে একটা গ্রাম, সেখানেই রাত্রের জন্যে আশ্রয় নেওয়ার কথা বাজারে বলে দিয়েছিলো। কিন্তু সন্ধ্যে তো হয়ে গেলো, তালদীঘির এদিকেই—অন্ধকার হবার দেরী নেই, কোথায় বা সঞ্জয়পুর, কোথায় বা কি?

মনে ভারী ভয় হলো। কি করি এখন? সঙ্গে মাদুলি ও ওষুধ বিক্রীর দরুণ অনেক টাকা। পরক্ষণেই ভাবলুম, কিছু না পারি, দৌড়োতে তো পারবো? না-হয় ব্যাগটাই যাবে—প্রাণ তো বাঁচবে।

ভয়ে ভয়ে দীঘির কাছাকাছি তো এলুম।...খুব বড়ো সেকেলে দীঘি, খুব উঁচু পাড়, পাড়ের দু'ধারে বড়ো-বড়ো তালগাছের সারি, তার ধার দিয়েই রাস্তা। দীঘির পাড়ে কিন্তু লোকজনের সম্পর্ক নেই। যে ভয় করেছিলুম সে সবই ভুয়ো। মানুষ যে কেন এ-রকম মিথ্যে ভয় দেখায়!

প্রকাণ্ড দীঘিটার পাড় ঘুরে যেমনি তালবনের সারি ও দীঘির উঁচু পাড়কে

পেছনে ফেলেচি, সামনেই দেখি ফাঁকা মাঠের মধ্যে দূরে একটা গ্রাম লি-লি করছে—নিশ্চয়ই ওটা সেই সঞ্জয়পুর।...বাঁচা গেলো, বাবা! কি ভয়টাই দেখিয়েছিলো লোকে! দিব্যি ফাঁকা মাঠ, কাজেই লোকের বসতি, গাঁয়ের গরু-বাছুর চরছে মাঠে—কেন এ-সব জায়গায় বিপদ থাকবে?

আমি এই রকম সব ভাবছি, এমন সময় তালুপুকুরের ওদিকের পাড়ের আড়ালে যে পথটা, সেই পথ বেয়ে একজন বৃদ্ধকে আমার দিকে আসতে দেখলুম। বৃদ্ধ বেশ বলিষ্ঠ গড়নের, এই বয়সেও মাংসপেশী বেশ সবল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ছোটো একটা লাঠি।

বৃদ্ধ আমায় বললে, 'ঠাকুরমশায়, কোথায় যাবেন?'

—'যাবো মাখমপুর...'

—'মাখমপুর! সে যে এখনও তিন ক্রোশ পথ...কাদের বাড়ি যাবেন?'

—'শচীশ কবিরাজের বাড়ি।'

—'ঠাকুরমশাই কি কবিরাজমশায়ের গোমস্তা?'

—'গোমস্তা নই, তবে যাচ্ছি জমিজমার কাজে বটে।'

—'এ অঞ্চলে আর কাউকে চেনেন কী?...মশায়ের নিজের বাড়ী কোথায়?'

—'আমি তো এদিকে কখনও আসিনি, কাউকে চিনিও না। মাখমপুরেও নতুন যাচ্ছি...'

—'সেখানেও কেউ তাহলে আপনাকে চেনে না?'

—'নাঃ, কে আর চিনবে?'

আমার এই কথায় মনে হলো যেন বুড়ো কি একটু ভাবলে, তারপর আমায় বললে 'কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলি...রাত্রে আজ দয়া করে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিন। আমরা জাতে বারুই, জল-আচরণীয়, আপনার অসুবিধে হবে না। চণ্ডীমণ্ডপের পাশে বাইরের ঘর আছে, সেখানে থাকবেন, রান্নাবাড়া করে খাবেন... আসুন দয়া করে...'

সন্তুষ্ট হলুম। সত্যিই সেকালের লোকেরা অন্য ধরনের শিক্ষায় মানুষ। অতিথি-অভ্যাগতদের সেবা করেই এদের তৃপ্তি! বৃদ্ধ এই প্রস্তাব না করলে রাঢ়-অঞ্চলের অজানা মেঠো-পথে সুমুখ-আঁধার রাতে যেতেই তো হতো মাখমপুরে, তিন ক্রোশ হেঁটে।

গ্রামের পূর্বপ্রান্তে বড়ো মাঠের ধারে বৃদ্ধের বাড়ি। বৃদ্ধের নাম নফরচন্দ্র দাস। আমি চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে উঠতেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো।

কুকুরের এই ডাকটা আমার ভালো লাগলো না ; এর আমি কোনো কারণ বলতে পারবো না, কিন্তু এই কুকুরের চীৎকারে যেন একটা ছন্নছাড়া অমঙ্গল-জনক অর্থ আছে—মঙ্গল-সন্ধ্যায় কোনো গৃহস্থবাড়িতে আসিনি, যেন শ্মশান-ভূমিতে এসেচি···

বৃদ্ধের বাড়ি দেখে মনে হলো, বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাড়ির উঠোনে সারি সারি তিনটে বড়ো-বড়ো ধানের গোলা—গোলার সঙ্গে প্রকাণ্ড গোয়ালঘর, বলদ ও গাইয়ে প্রায় কুড়ি-বাইশটা। অন্তঃপুরের দিকে চারখানা বড়ো-বড়ো আট-চালার ঘর। বাইরের এই চণ্ডীমণ্ডপ ও তার পাশে আর একখানা কুঠুরি!

আমার কথাটা ভালো করে বুঝতে গেলে এই কুঠুরিটিকে চণ্ডীমণ্ডপ-সংলগ্ন একটা কামরাও বলা যায়, কারণ একটা সরু রোয়াকের দ্বারা চণ্ডীমণ্ডপের পেছন দিকের সঙ্গে সংলগ্ন ; অথচ দোর বন্ধ করে দিলে বাইরের বাড়ির সঙ্গে এর সম্পর্ক চুকে একা ভেতর-বাড়ির একখানা ঘরের সামিল হয়ে দাঁড়ায়।

আমায় বাসা দেওয়া হলো এই কুঠুরিতে। কুঠুরির একপাশে ছোটো একটা চালা। সেখানে আমার রান্নার আয়োজন করে দিয়েচে। হাত-মুখ ধুয়ে সুস্থ হয়ে আমি বিশ্রাম করচি।

গৃহস্বামী এসে বললে, 'ঠাকুরমশায়, রান্না চাপান, আর রাত করছেন কেন?'

আমি রান্নাচালায় বসে রান্না চড়িয়ে দিতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি, বাড়ির একটি বৌ ভেতর থেকে একগাছা ঝাঁটা হাতে এসে আমার রান্নাচালার সামনে দিয়ে ঢুকে ঝাঁট দিতে লাগলো।

কুঠুরির দরজা খোলা, আমি যেখানে বসে, সেখান থেকে কুঠুরিটার ভেতর দেখা যায়। আমি দু-একবার বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলুম বৌটি ঝাঁট দিতে দিতে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচে। দু-তিনবার বেশ ভালোভাবে লক্ষ্য করে মনে হলো, বৌটি ইচ্ছা করেই আমার দিকে অমন করে চাইচে।

আমি দস্তুরমতো অবাক হয়ে গেলুম। ব্যাপার কি? সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়ে, পল্লীর গৃহস্থবধূ—এমন ব্যবহার তো ভালো নয়! কি হাঙ্গামায় আবার পড়ে যাবো রে, বাবা! কর্তাকে কাছে বসিয়ে রাঁধতে রাঁধতে গল্প করবো নাকি!

এমন সময় বৌটি ঝাঁট শেষ করে চলে গেলো। কিন্তু বোধহয় মিনিট-পাঁচেক পরেই আবার এলো। দেখে মনে হলো, সে যেন খুব ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন,

উত্তেজিত। এবারও সে কুঠুরির মধ্যে ঢুকে এটা-ওটা সরাতে লাগলো এবং আমার দিকে চাইতে লাগলো, তারপর হঠাৎ রান্না-চালার দরজায় এসে চকিতদৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে কেউ নেই দেখে আমার দিকে আরও সরে এলো এবং নীচু-স্বরে বললে, 'ঠাকুরমশায়, আপনি এখনই এখান থেকে পালান, না হলে ভয়ানক বিপদে পড়বেন—এরা ফাঁসুড়ে ডাকাত, রাতে আপনাকে মেরে ফেলবে'—বলেই চট করে বাড়ির মধ্যে চলে গেলো।

শুনে তো আমি আর নেই! হাতের খুন্তি হাতেই রইলো, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো। বলে কি! দিব্যি গেরস্তবাড়ি, গোলাগালা, ঘরদোর—ডাকাত কি রকম?

কিন্তু পালাবোই বা কেমন করে? এখন বেশ রাত হয়েচে। সামনের চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধ বসে লোকজনের সঙ্গে কথা কইচে—ওখান দিয়ে যেতে গেলেই তো সন্দেহ করবে।

কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে গিয়েচি একেবারে—হাতে-পায়ে জোর নেই, কিছু ভাববারও শক্তি লোপ পেয়েচে। মিনিট-পাঁচেক এমনিভাবে কাটলো—এমন সময়ে দেখি সেই বৌটি আবার কি-একটা কাজে কুঠুরির মধ্যে ঢুকে খোলা দরজা দিয়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

মেয়েটি কথা বলবার আগেই আমি বললুম, 'তুমি যে হও, তুমি পরম দয়াময়ী—বলে দাও, কোন্ পথে কিভাবে পালাবো…'

বৌটি চাপা গলায় বললে, 'সেইজন্যেই এলুম। সব দেখে এলুম। পালাবার পথ নেই—ওরা ঘাঁটি আগলে রেখেচে…'

আমি বললুম, 'তবে উপায়!'

মেয়েটি বললে, 'একটা মাত্র উপায় আছে। তাও আমি ভেবে এসেচি। আমি এ-বাড়িতে আর ব্রহ্মহত্যা হতে দেবো না—অনেক সহ্য করেচি, আর করবো না…দাঁড়ান ঠাকুরমশায়, আর একবার বাড়ির মধ্যে থেকে আসি, নইলে সন্দেহ করবে।'

আরো মিনিট-পাঁচেক পরে বৌটি আবার এলো, চকিতদৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে বললে, 'শুনুন, উপায়—এই কথা ক'টা মনে রাখুন। যদি মনে রাখতে পারেন, তবে বাঁচাতে পারবো…আমার নাম বামা, আমি এ-বাড়ির মেজো-বৌ আমার বাপের বাড়ির গ্রামের নাম কুসুমপুর, জেলা বর্ধমান, থানা রায়না—আমার বাপের নাম হরিদাস মজুমদার, জ্যাঠামশায়ের নাম পাঁচকড়ি মজুমদার,

আমরা দুই বোন, আমার দিদির নাম কান্তমণি, বিয়ে হয়েচে সামন্তপুর-তেওটা, বর্ধমান জেলা। শ্বশুরের নাম দুর্লভ দাস—সবাই জাতে বারুই। আমার বাবা, জ্যাঠামশায় সব বেঁচে আছেন, কিন্তু মা নেই…'

আমার তখন বুদ্ধিলোপ পেতে বসেচে--যা বলে মেয়েটি তাই করে যাই। এতে কি হবে? বৌটি কিন্তু এক-একবার বাড়ির মধ্যে যায়, আবার দু'মিনিটের জন্যে ফিরে এসে আমায় তালিম দেয়, 'মনে আছে তো সব! জ্যাঠামশায়ের নাম কি?'

আমি বললুম, 'হরিদাস মজুমদার…'

—'না—না, পাঁচকড়ি মজুমদার, বাবার নাম হরিদাস মজুমদার…আমার দিদির নাম কি? শ্বশুরবাড়ি কোন্ গাঁয়ে?…

—'কান্তমণি। শ্বশুববাড়ি হলো—শ্বশুরবাড়ি…'

—'আপনি সব মাটি করবেন দেখচি! সামন্তপুর-তেওটা, বলুন…'

—'সামন্তপুর-তেওটা—শ্বশুরের নাম রামযদু—দুর্লভরাম দাস—'

অবশেষে মিনিট-দশ বারোর মধ্যে আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে এসেচে।

বৌটি বললে, 'রান্না-খাওয়া করে নিন ঠাকুরমশায়, কোনো ভয় করবেন না। আমার বাপের বাড়ির নাম-ধাম যখন জানা হয়ে গেছে, তখন আপনাকে বাঁচাতে পেরেছি। এখন শুনুন, খাওয়া-দাওয়ার পরেই শ্বশুরমশায়ের কাছে আমার বাপের বাড়ির পরিচয় দিয়ে বলবেন—আপনি তাদের গুরুবংশ, আমার নাম বলে জিজ্ঞেস করবেন—আমার বিয়ে হয়েচে কোথায়, জানো নাকি? গলা যেন না কাঁপে, কোনো রকম সন্দেহ যেন না হয়…আমি চললুম, আবার আসবো, আপনি শ্বশুরকে বলবার পরে; কিন্তু দেরী করবেন না বেশী, বিপদ কখন হয় বলা তো যায় না?…'

রান্না-খাওয়া শেষ না করলেও তো সন্দেহ করতে পারে। রান্না-খাওয়া করতেই হলো। রাত্রের অন্ধকার তখন বেশ ঘন হয়ে এসেচে, রাত আন্দাজ দশটার কম নয়, আহারাদির পর নিজের কুঠরিতে বসেচি, আর আমার মনে হচ্ছে, এ বাড়ির সবাই যেন খাঁড়ায়, রাম-দাতে শান দিচ্ছে, আমার গলা কাটবার জন্যে।

এই সময় গৃহস্বামী স্বয়ং আমার জন্যে পান নিয়ে এলো। বললে, 'কি ঠাকুরমশায়, আহারাদি হলো? এখন দিব্যি আরামে শুয়ে পড়ুন। মশারীটা টাঙিয়ে দিয়ে যাচ্ছি; রাত হয়েছে, আর দেরী করবেন না…'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, একটা কথা বলি···আমাদের এক মন্ত্রশিষ্য, বাড়ি কুসুমপুর, থানা রায়না, নাম পাঁচকড়ি—ইয়ে, হরিদাস মজুমদার, তার একটি মেয়ের নাম বামা—এ দিকেই কোথায় বিয়ে হয়েচে। তারাও জাতে তোমাদের বারুই কিনা—তাই হয়তো চিনলেও চিনতে পারো। মেয়েটির জ্যাঠা দুর্লভরাম—ইয়ে পাঁচকড়ি—আমায় বলে দিয়েছিলো মেয়েটির শ্বশুরবাড়ি খোঁজ করে একবার সেখানে যেতে···তা যখন এলুমই এ দেশে···'

আমার কথা শুনে বৃদ্ধ যেন কেমন হয়ে গেলো, আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে, 'কুসুমপুরের হরিদাস মজুমদার? বামা?···আপনি তাদের চিনলেন কি করে?'

বামার কথা স্মরণ করে গলা না-কাঁপিয়ে দৃঢ়স্বরে বললুম, 'আমি যে তাদের গুরুবংশ—আমার বাবার ওরা মন্ত্রশিষ্য কিনা?'

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বললে, 'বসুন, আমি আসচি···'

আমি একটা কুঠুরির মধ্যে বসে রইলুম, সন্দেহ ও ভয় তখনও যায় নি। আর এরা যে গুরুদেবকেই রেহাই দেবে তা কে বলেছে?

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ ফিরে এলো; পেছনে পেছনে সেই বধূটি, আর একজন ষণ্ডামার্কা গোছের যুবক এবং একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক—সম্ভবতঃ বৃদ্ধের স্ত্রী।

বৃদ্ধ বললে, 'এই যে বামা, ঠাকুরমশায়। আমারই মেজো ছেলের সঙ্গে··· এই আমার মেজো-ছেলে শম্ভু···গড় করো সব, গড় করো···মেজো বৌমা, দেখো তো, চিনতে পারো এঁকে?'

চমৎকার অভিনেত্রী বটে বামা! অদ্ভুত অভিনয় করে গেলো সে!

ঘোমটা খুলে হাসিমুখে সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে গলায় আঁচল দিয়ে। জীবনদাত্রী, দয়াময়ী বামা! আমার চোখে প্রায় জল এসে পড়লো।

তারপর সে রাত্রি তো কেটে গেলো। খাবার জল দেবার ছুতো করে এসে বামা আমায় আশ্বাস দিয়ে গেলো। বললে, 'বিপদ কেটে গেছে; আমার চোখে না পড়লে সর্বনাশ হতো, ভিটেতে ব্রহ্মহত্যে হতো। অনেক হয়েছে—এই কুঠুরিতে, এই বিছানায়, এই মেঝেতে অনেক লাশ পোঁতা···'

আমার মনের অবস্থা বলবার নয়। বললুম, 'পুলিশ কি গাঁয়ের লোক কিছু টের পায় না, কিছু বলে না?'

—'কে কি বলবে! এ ফাঁসুড়ে ডাকাতের গাঁ। সবাই এ-রকম। আগে

জানলে কি বাবা এখানে বিয়ে দিতেন? বিয়ের পর সব ধরা পড়ে গেলো আমার কাছে। এখন আমার একটি সন্তান হয়েছে—এ পাপ-ভিটেয় বাস করলে তার অকল্যাণ হবে। ওকে বারণ করি, কিন্তু ও কি করবে? মাথার ওপর শ্বশুরমশায় রয়েছেন—পুরানো ডাকাত, দাদা রয়েচে···আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন বাবাঠাকুর, আর কোনো ভয় নেই···'

সকাল হলো। বিদায় নেবার সময় বৃদ্ধ আমায় পাঁচ টাকা গুরুপ্রণামী দিলে। বামাকে আড়ালে ডেকে বললুম, 'তুমি আমার মা, আমার জীবনদাত্রী। আশীর্বাদ করি, চিরসুখী হও মা···'

বামার মতো বুদ্ধিমতী নারী জীবনে আর আমার চোখে পড়েনি। কতকাল হয়ে গেলো, এই বৃদ্ধ বয়সেও সেই দয়াময়ী পল্লীবধূটির স্মৃতিতে আমার চোখে জল এসে পড়ে, শ্রদ্ধায় মন পূর্ণ হয়ে ওঠে!

গঙ্গাধরের বিপদ

অনেকদিন আগের কথা। কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম চলে। সে সময় মশলা-পোস্তায় গঙ্গাধর কুণ্ডুর ছোটখাটো একখানা মশলার দোকান ছিল।

গঙ্গাধরের দেশ হুগলী জেলা, চাঁপাডাঙ্গার কাছে। অনেকদিনের দোকান, যে সময়ের কথা বলচি, গঙ্গাধরের বয়েস তখন পঞ্চাশের ওপর। কিন্তু শরীরটা তার ভাল যাচ্ছিল না। নানারকম অসুখে ভুগতো প্রায়ই। তার ওপর ব্যবসায়ে কিছু লোকসান দিয়ে লোকটা একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়েছিল। দোকান ঘরের ভাড়া দুমাসের বাকী, মহাজনের দেনা ঘাড়ে—দুপুরবেলা দোকানে বসে থেলো হুঁকো হাতে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিল। আজ আবার সন্ধ্যার সময় গোমস্তা আসবে ভাড়া নিতে বলে শাসিয়ে গিয়েচে। কি বলা যায় তাকে!

এক পুরাণো পরিচিত মহাজনের কথা তার মনে পড়ে গেল। তার নাম খোদাদাদ খাঁ, পেশোয়ারী মুসলমান, মেটেবুরুজে থাকে। আগে গঙ্গাধরের লেনদেন ছিল তার সঙ্গে। কয়েকবার টাকা নিয়েচে, শোধও করেচে—কিন্তু সুদের হার বড় বেশী বলে ইদানীং বছর কয়েক গঙ্গাধর সেদিকে যায় নি।

ভেবে চিন্তে সে মেটেবুরুজেই রওনা হোল। সুদ বেশী বলে আর উপায় কি? টাকা না আনলেই নয় আজ সন্ধ্যার মধ্যে।

মেটেবুরুজে গিয়ে খোদাদাদ খাঁয়ের নতুন বাসা খুঁজে বার করতে, টাকা নিতে, গল্পগুজব করতে দেরী হয়ে গেল। খিদিরপুরের কাটিগঙ্গা পার হয়ে এসে ট্রাম ধরবে, হন্ হন্ করে হেঁটে আসচে—এমন সময়ে একজন লোক তাকে ডেকে বল্লে—এ সাহেব, ইধার শুনিয়ে তো জরা—

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েচে। যেখান থেকে লোকটা তাকে ডাকলে সেখানে কতকগুলো গাছপালায় বেশ একটু অন্ধকার। স্থানটা নির্জন, তার ওপর আবার তার সঙ্গে রয়েছে টাকা। গঙ্গাধরের মনে একটু সন্দেহ যে না হোল এমন নয়। কিন্তু উপায় নেই, লোকটা এগিয়ে এল। ওই গাছগুলোর তলায় সে যেন তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

লোকটা খুব লম্বা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ঘাড়ের ওপর পড়েচে, মুখটা ভাল দেখা যাচ্চে না। পরণে ঢিলে ইজের ও আলখাল্লা। সে কাছে এসে স্বর নীচু করে হিন্দীতে ও ভাঙা বাংলায় মিলিয়ে বল্লে—বাবু, সস্তায় মাল কিন্‌বেন?

গঙ্গাধর আশ্চর্য হয়ে বল্লে—কি মাল?

লোকটা চারিদিকে চেয়ে বল্লে—এখানে হবে না বাবু, পুলিস ঘুরচে, আমার সঙ্গে আসুন।

ঝুপ্‌সি গাছের তলায় এক জায়গায় অন্ধকার খুব ঘন। সেখানে গিয়ে লোকটা বল্লে—জিনিসটা কোকেন। খুব সস্তায় পাবেন। ডিউটী-ছুট্ মাল—লুকিয়ে দেবো।

গঙ্গাধর চম্‌কে উঠ্‌ল।

সে কখনো ও ব্যবসা করে নি। ডিউটী-ছুট্ কোকেন—কি সর্বনেশে জিনিস! ভাল লোকের পাল্লায় পড়েচে! না—সে কিন্‌বে না।

লোকটা সম্ভবতঃ পাঞ্জাবী মুসলমান। বাংলা বল্‌তে পারে—তবে বেশ একটু বাঁকা। সে অনুনয়ের স্বরে বল্লে—বাবু, আপনি নিন্। আপনার ভাল হবে। সিকি কড়িতে দেবো—আমার মুস্কিল হয়েচে আমি মাল বিক্রীর লোক খুঁজে পাচ্চি নে। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি কত জায়গায়—আবার সব জায়গায় তো যেতে পারি নে, পুলিসের ভয় তো আছে—কেউ কথা কইচে না আমার সঙ্গে, সেই হয়েচে আরও মুস্কিল। হঠাৎ শহরে এত পুলিসের ভয় হোল যে কেন বাবু তা বুঝি নে—আগে যারা এ ব্যাবসা করতো, তাদের কাছে যাচ্চি। তারা আমার দিকে চেয়েও দেখ্‌চে না। আপনি গররাজি হবেন না বাবু—মাল দেখুন, পরে দামদস্তুর হবে।

লোকটার গলার সুরে একটা কি শক্তি ছিল, গঙ্গাধরের মন খানিকটা ভিজল। কোকেনের ব্যাবসাতে মানুষে রাতারাতি বড় মানুষ হয়েচে বটে। বিনা সাহসে, বিপদ এড়িয়ে চলে বেড়ালে কি লক্ষ্মীলাভ হয়? দেখাই যাক্ না।

হঠাৎ গঙ্গাধর চেয়ে দেখ্‌লে যে লোকটা নেই সেখানে। এই তো দাঁড়িয়ে ছিল, কোথায় গেল আবার? পাছে কেউ শোনে, এই ভয়ে বেশী জোরে ডাক্‌তেও সাহস পেল না! চাপা গলায় বাঙ্গালী হিন্দীতে ডাক্‌লে—কোথায় গিয়া ও খাঁ সাহেব? এদিকে ওদিক চাওয়ার পর সাম্‌নে চাইতেই দীর্ঘাকৃতি আলখাল্লাধারী খাঁ সাহেবকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখা গেল। গঙ্গাধর বল্লে—জল্‌দি বলো, রাত হো গিয়া। অনেক দূর যানে হোগা।

কি একটা যেন ঢাকবার জন্য লোকটি প্রাণপণে চেষ্টা করচে। বল্লে—আমার সঙ্গে এসো মাল দেখাবো।

দুজনে কাটিগঙ্গার ধারে ধারে অনেকদূর গেল। যে সময়ের কথা বল্‌চি, তখন ওদিকে অত লোকজন ছিল না। মাঝে মাঝে জোয়ার নেমে যাওয়াতে বড় বড় ভড় ও নৌকা ডাঙায় কাদার ওপর পড়ে আছে, দু একটা করাতের কারখানা, তাও দূরে দূরে—জলের ধারে নোনা চাঁদা কাঁটার বন, পেছনে অনেকদূরে খিদিরপুর বাজারের আলো দেখা যাচ্চে।

পথে যেতে যেতে খাঁ সাহেব একটা বড় অদ্ভুত প্রশ্ন করলে। গঙ্গাধরের দিকে চেয়ে বল্লে—আমায় দেখতে পাচ্চ তো?

—কেন পাবো না? এমন বয়েস এখনও হয় নি যে এই সন্দেবেলাতেই চোখে ঠাওর হবে না।

একবার গঙ্গাধর জিগ্যেস করলে—তোমার ডেরা কোথায় খাঁ সাহেব?

লোকটা চকিতে পিছন ফিরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—কেন, সে তোমার কি দরকার? পুলিসে ধরিয়ে দেবে ভেবে থাকো যদি, তবে ভাল হবে না জেনো। মাল দেবো, তুমি টাকা দেবে—মাল নিয়ে চলে যাবে—আমার বাসার খোঁজে তোমার কি কাজ?

লোকটার চোখের চাউনি কি অদ্ভুত! গঙ্গাধর অস্বস্তি বোধ করলে। মুখ ভালো দেখা যায় না—কিন্তু ওর দুই চোখে যেন ইস্পাতের ছুরি ঝল্‌সে উঠল। না, সঙ্গে তার টাকা রয়েচে, এ অবস্থায় একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাত-কুলশীল লোকের সঙ্গে একা এই সন্ধ্যাবেলাতে সে এতদূর এসে পড়েচে? লোভে মানুষের জ্ঞান থাকে না—তার ভেবে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু যখন

এসেইচে, তখন আর চারা নেই। বিশেষতঃ সে যে ভয় পেয়েচে এটা না দেখানই ভালো। দেখালে বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে বই কম্‌বে না! ছুরি বার করে বস্‌লে তখন আর উপায় থাকবে না।

অনেক দূরে গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা গুদাম ঘর। একটি গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে, গুদাম ঘরের দরজা থেকে একটু দূরে। তার ওপর গঙ্গাধরকে বসতে বলে লোকটা কোথায় চলে গেল। গঙ্গাধর বসে চারিধারে চেয়ে দেখলে গুদাম ঘরের আশে পাশে সর্বত্র আগাছার অনুচ্চ জঙ্গল, নিকটে কোথাও লোকজনের সাড়াশব্দ নেই।

অন্ধকার হোলেও মাঠের মধ্যে বলে অন্ধকার তত ঘন নয়—সেই পাতলা অন্ধকারে চেয়ে দেখে গঙ্গাধরের মনে হোল গুদাম ঘরটা পুরানো এবং যেন অনেককাল অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। বাঁশের বেড়া খসে পড়েচে, জায়গায় জায়গায় চালের খোলা উড়ে গিয়েচে, মাঝে মাঝে সাম্‌নের দোরটা উইধরা, ভেঙে পড়তে চাইচে যেন।......

গঙ্গাধরের কেমন একটা ভয় হোল। কেন সে এখানে এল এই সন্ধ্যায়? এরকম জায়গায় একা মানুষে আসে, বিশেষ করে এতগুলো টাকা সঙ্গে ক'রে? সে আসত না কখনই, সে কলকাতায় আজ নতুন নয়, তার ওপরে ঝুনো ব্যবসাদার, বাঙ্গাল দেশ থেকে নতুন আসে নি। কিন্তু ওই লোকটার কথার সুরে কি যাদু আছে, গঙ্গাধরকে যেন টেনে এনেচে, সাধ্য ছিল না যে সে ছাড়ায়। একথা এখন তার মনে হোল।...

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে খাঁ সাহেবের মূর্তি দেখা গেল। লোকটার যাওয়া-আসা এমন নিঃশব্দ ও এমন অদ্ভুত ধরনের যেন মনে হয় অন্ধকারে ওর চেহারা মিলিয়ে গিয়েছিল, আবার ফুটে বেরুল। কোথাও যে চলে গিয়েছিল, এমন মনে হয় না। পাকা ও ঝুনো খেলোয়াড় আর কি!

খাঁ সাহেব দোর খুলে ঘরে ঢুকল। গঙ্গাধরকেও যখন পেছনে পেছনে আসতে বল্‌ল তখন ভয়ে গঙ্গাধরের হাত পা ঝিম্ ঝিম্ করচে, বুক ঢিপ ঢিপ করচে। এই অন্ধকার গুদাম ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঠিক ও লোকটা ওর ওই লম্বা হাতে গলাটিপে ধরবে কিংবা ছুরি বুকে বসাবে—সেই ফন্দিতে এতদূর ভুলিয়ে এনেচে। লোকটা নিশ্চয়ই জান্‌ত যে তার কাছে টাকা আছে, সন্ধান রেখেছিল। কে জানে খোদাদাদ খাঁয়ের দলের লোক কিনা? গঙ্গাধরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলে। এবার সে ভাবলে দৌড়ে পালাবে?

কিন্তু সে বুড়ো মানুষ পাঞ্জাবী মুসলমানের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় তার পক্ষে পেরে ওঠা অসম্ভব।

কলের পুতুলের মত গঙ্গাধর গুদামের মধ্যে ঢুকল। আশ্চর্য! গুদামের ওদিকের দেওয়ালটা যে একেবারে ভাঙা! গুদামের সর্বত্র দেখা যাচ্চে সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে। এক জায়গায় দুটো খালি পিপে ছাড়া কোথাও কিছু নেই। মাকড়সার জাল সর্বত্র, অন্ধকারে দেখা যায় না বটে কিন্তু নাকে মুখে লাগে। একটা কি রকম ভ্যপ্‌সা গন্ধ গুদামের মধ্যে, মেজেটা স্যাঁৎসেঁতে, কতকাল এর মধ্যে যেন মানুষ ঢোকে নি।

এদিকে আবার খাঁ সাহেব কোথায় গেল। লোকটা থাকে থাকে যায় কোথায়?

অল্পক্ষণ...মিনিট দুই হবে...কেউ কোথাও নেই, শুধু গঙ্গাধর একলা... আবার সেই ভয়টা হোল। কেমন এক ধরনের ভয়...যেন বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্চে। এই বা কি রকম ভয়? আর গুদাম ঘরটার মধ্যে কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ার যেন একটা স্রোত বইচে মাঝে মাঝে।

মিনিট দুই পরেই খাঁ সাহেব—এই তো আধ অন্ধকারের মধ্যে সামনেই দাঁড়িয়ে।...

হঠাৎ আবার একটা অদ্ভুত কথা বল্লে খাঁ সাহেব। বল্লে—তুমি কালা না কি? এতক্ষণ কথা বল্‌চি, শুনতে পাচ্চ না? কথার উত্তর দিচ্চ না কেন? কোকেন যে জায়গায় আছে বল্লাম—তা দেখ্‌তে পেয়েচ? শাবলের চাড় দিয়ে তুলতে বল্লাম— পিপে দুটো। হাঁ করে সঙের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন?

বা রে! এত কথা কখন বলেচে লোকটা? পাগল নাকি? গঙ্গাধর কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েচে, মূঢ়ের মত দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—কখন তুমি দেখালে কোকেনের জায়গা—কই কোথায় শাবল? কথা বল্‌তে বল্‌তে গঙ্গাধর সম্মুখস্থ খাঁ সাহেবের মুখের দিকে চাইলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হোল তার বিভ্রান্ত, বিমূঢ় আতঙ্কাকুল দৃষ্টির সাম্‌নে খাঁ সাহেবের মুখ, গলা, বুক, হাত-পা সারা দেহটা যেন চুর চুর হয়ে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পড়েচে...সব যেন ভেঙে ভেঙে বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্চে...খাঁ সাহেব প্রাণপণে দাঁতমুখ খামুটি করে বিষম মনের জোরে তার দেহের চূর্ণায়মান অণুগুলো যথাস্থানে ধরে রাখবার জন্যে চেষ্টা করচে! কিন্তু পেরে উঠচে না...তার চোখের সে বিজিত, হতাশ দৃষ্টি গঙ্গাধরের হৃদয় স্পর্শ করলে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অত বড় দীর্ঘাকৃতি দেহের

আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না·· সব ভেঙে গেল, উড়ে গেল·· এক···দুই···তিন ···চার···

আর কোথায় খাঁ সাহেব? চারি পাশের অন্ধকারের মধ্যে সে মিলিয়ে গিয়েচে···একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের ঝাপ্‌টা এল কোথা থেকে, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাধর আর্তরবে চীৎকার করে গুদাম ঘরের স্যাঁতসেঁতে মেজের ওপর মূর্ছিত হয়ে প'ড়ে গেল।

একটা দিশী ভড় কাছে কোথায় বাঁধা ছিল, তার মাঝিরা এসে গঙ্গাধরকে অচেতন অবস্থায় তাদের ভড়ে নিয়ে যায়। তারাই তাকে দোকানে পৌঁছে দেয়। গঙ্গাধরের টাকা ঠিক ছিল, কাণাকড়িও খোয়া যায় নি। তবে শরীর শুধরে উঠতে সময় নিয়েছিল, অনেকদিন পর্যন্ত অন্ধকারে সে একা কিছুতেই থাকতে পারত না।

মাস দুই পরে মেটেবুরুজের খোদাদাদ খাঁর কাছে টাকা শোধ দিতে গিয়ে গঙ্গাধর, টাকা নিয়ে যাবার দিন কি ঘটেছিল সেটা বল্‌লে। খোদাদাদ গল্প শুনে গম্ভীর হ'য়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে—সাহজী, ও হোলো আমীর খাঁ। চোরাই কোকেনের খুব বড় ব্যবসাদার ছিল। আজ বছর পনের আগেকার কথা, রমজান মাসে বেশ কিছু মাল হাতে পায়। তক্তাঘাটের কাছে একখানা জাহাজ ভিড়েছিল, সেখান থেকে রাতারাতি সরিয়ে ফেলে, জাহাজের লোকের সঙ্গে সাড় ছিল। কোথায় সে মাল রাখ্‌ত কেউ জানে না। সেই মাসের মাঝামাঝি সে হঠাৎ খুন হয়। কেন বা কে খুন করলে জানা যায় নি, কেউ ধরাও পড়ে নি। তবে দলের লোকেই তাকে খুন করেছিল এটা বোঝা কঠিন নয়। এই পর্যন্ত আমীর খাঁর ঘটনা আমি জানি। আমার মনে হয়, আমীর খাঁ সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মাল বিক্রী করবার জন্যে, ওর লুকানো কোকেনের বাক্স হয়েছে দোজখের বোঝা। তা বাবু, সে গুদাম ঘরটা কোথায় তুমি দেখাতে পারবে?

গঙ্গাধর অন্ধকারে কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে সেখানে গিয়েছিল তা তার মনে নেই, মনে থাক্‌লেও সে যেত না।

পথে আস্‌তে আস্‌তে গঙ্গাধরের মনে পড়ল, পুরানো ভাঙা গুদাম ঘরটার অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে আমীর খাঁয়ের মুখের সেই হতাশ ও অমানুষিক চেষ্টা করেও হেরে যাবার দৃষ্টিটা। হতভাগ্য কি এতদিনেও বোঝে নি সে মারা গিয়েছে? কে উত্তর দেবে? ভগবান তার আত্মাকে শান্তি দিন।